প্রশ্নোত্তরে

তাফসীরুল বায়যাবী

রচনায়

কাযী নাসির উদ্দীন আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আল বায়যাবী (রহঃ)

সংকলক

মাওলানা রেজাউল হক মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ

সম্পাদনায়

মাওলানা হাফিজুর রহমান যশোরী

প্রকাশনায়

আল-আকসা লাইব্রেরী

৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক ঃ
নাজমুস্ সা'আদাত শিবলী
ফোন : ০১৮৯৪৬৬৯৭০

প্রকাশকাল ঃ
জুমাদাল উলা ১৪২৫
জুন – ২০০৫

মূল্য ঃ ৯০.০০ টাকা মাত্র।

বর্ণ বিন্যাস ঃ
জাকিয়া কম্পিউটার
৩৭/১ বাংলাবাজার
(খান প্লাজা, ৩য় তলা) ঢাকা

মুদ্রণ ঃ
আল আকাবা প্রেস
শ্রীশ দাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা

লেখকের কথা

আল কুরআন মানব জাতির কল্যাণ ও মুক্তির জন্য প্রেরিত। আল্লাহর পবিত্র কালাম, এর ভাষার ভাব-গাম্ভীর্য ও গতিস্বাচ্ছন্দ সুদূর প্রসারী। এর অর্থ–গৌরব, নিগুঢ় তাৎপর্য, অর্থ ও ভাব চূড়ান্তভাবে ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ করা মানবীয় শক্তির উর্ধ্বে। যে সকল মহা মনীষী মহাগ্রন্থ আল কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসামান্য খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন আল্লামা কাযী নাসির উদ্দীন বায়যাবী (রহঃ) তাদের অন্যতম প্রধান। তাফসীর বায়যাবী খ্যাত আনওয়ারুত তানযীল ওা আসরারুত তা'বীল" তাঁর অমর কীর্তি, অবিস্মরণীয় অবদান। সর্বজন সমাদৃত তাঁর এক অনবদ্য রচনা। মনীষীগণের মতে তাফসীরে কাশশাফের পরে তাফসীরে বায়যাবীই শ্রেষ্ঠতম তাফসীর গ্রন্থ। এতে রয়েছে শব্দ বিশ্লেষণ বাক্য গঠন প্রণালী, হাদীসের উদ্ধৃতি, সঠিক শব্দার্থ নিরূপণে আরবদের ব্যবহার রীতির উল্লেখ, আরবী প্রবাদ প্রবচন ও প্রাচীন কাব্য হতে উদাহরণ, আরবী বাগধারা ও অলংকার আয়াতের পটভূমির আলোচনা। যুগ যুগ ধরে তাফসীরে বায়যাবী প্রাচ্য প্রতীচ্যের সকল দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর শ্রেণীর পাঠ্যক্রমে অন্তভূক্ত রয়েছে। বাংলাদেশ ও উপমহাদেশের মাদরাসাসমূহে ফযীলত ও তাফসীর বিভাগের পাঠ্যভূক্ত। এটি কিছুটা কঠিন প্রকৃতির হওয়ার কারণে সর্বস্তরের ছাত্ররা জ্ঞান ভান্ডারের এ সমুদ্র থেকে মধু আহরণ করতে সক্ষম হয় না। তাই ছাত্রদের জন্য এটিকে সহজবোধ্য করার জন্যে বাংলা ভাষায় এর একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ লেখার কাজে হাত দিয়েছিলাম।

ধীমাভ গতিতে হলেও এগিয়ে ছিল বেশ কিছুদূর। ইতিমধ্যে আল-আকসা লাইব্রেরী স্বত্বাধিকারী আস্থাভাজন মাওলানা হাফিজুর রহমান সাহেবের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা হয়। দুর্বল মেধার ছাত্রদের পরীক্ষার বৈতরণী (?) পার হওয়ার জন্য প্রথমে একটি সহায়ক পুস্তিকা লেখার জন্যে তিনি অনুরোধ করেন। তার অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে এ সহায়ক গ্রন্থ রচিত হল। অচিরেই বাংলা ভাষায় একখানা বিস্তারিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ ছাত্রদের হাতে তুলে দেয়ার আশা রয়েছে। স্মর্তব্য যে, মনীষা অর্জন ও যোগ্যতা গড়ার জন্যে মতন বুঝে পড়ার প্রতি অনুতসাহিত হওয়া আদর্শ ছাত্র সমাজের কাছে কিছুতেই কাম্য নয়। তাফসীরে বায়যাবীর ক্ষেত্রে এমনটি না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

মুদ্রণক্রটি ছাড়াও কিছু কিছু ভুল ক্রটি মানুষ হিসেবে থেকে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। অতএব কোন ভুল-ক্রটি দৃষ্টি গোচর হলে সংশোধনের জন্যে আমাদের অবহিত করলে কৃতজ্ঞতার সাথে সংশোধনের প্রতিশ্রুতি রইল। আল্লাহ তা'আলা এটিকে তর সন্তুষ্টির উপায় হিসেবে কবুল করুন। আমীন

দোয়ার মুহ্তাম

রেজাউল হক মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ

সম্পাদকের কথা

বক্তা যে স্তরের হয় তার বক্তৃতাও হয় সে স্তরের এটি চিরন্তন সত্য। সৃষ্টির আদি-অন্তের গ্রন্থরাজির সেরা গ্রন্থ আল কুরআন যে কতোশত বৈচিত্রময় জ্ঞানের উৎস তার যথার্থ বিবরণ অদ্যাবধি কেউ দিতে পারেনি। আর ভবিষ্যতেও কেউ দিতে পারবে না। কারণ আল্লাহ যেরূপ অসীম কুরআনে লুকায়িত তার জ্ঞান ভাণ্ডারও অসীম। কাজেই সসীম মেধা ও জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা তা যথাযথরূপে আয়ত্বে আনা আদৌ সম্ভব নয়।

বলা বাহুল্য যে, আল কুরআনের সুক্ষ্মতিসূক্ষ্ম বিচিত্র বিষয়াদি নিয়ে এযাবত তা তাফসীর রচিত হয়েছে বিভিন্ন মনীষীবর্গের দৃষ্টিতে তাফসীরে বায়যাবী সে সবের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। তবে স্বল্প পরিসরে স্বল্প ভাষ্যে এটি অনন্যই বটে। কিতাবটি অপরাপর তাফসীর কিছুটা জটিল। এ কারণে এযাবত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পরিসরে এর প্রায় শতাধিক তাশরীহ ও তা'লীক তথা সহায়ক ও ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচিত হয়েছে বিভিন্ন ভাষায়। যুগ যুগ ধরে সর্বোচ্চ তাফসীরের পাঠ্যতালিকায় স্থান পেয়ে আসছে প্রাচ্য ও প্রাতিচ্যের ইসলামী বিদ্যাপীঠসমূহে।

তবে দুঃখের বিষয় হল শিক্ষার্থীদের জ্ঞান তৃষ্ণা নিবারণে সহায়ক বাংলা ভাষায় এমন কোন কিতাব এযাবৎ রচিত হয়নি। দীর্ঘদিন যাবৎ অধমের অন্তরে এ অভাব পূরণের বাসনা জাগ্রত ছিল। কিন্তু বিভিন্ন ব্যস্ততার দরুন এ কাজে হাত দেয়ার সুযোগ হচ্ছিল না। এরই মাঝে সাক্ষাৎ হয় সুদক্ষ আলিম নবীন লেখক জনাব মাওঃ রেজাউল করিম সাহেরেব সাথে। আলাপকালে তিনি এ কাজের ভিত রচনা করেছেন ইতিমধ্যেই বলে জানান। তৎক্ষণাৎই আমি তাকে যথা শিঘ্র সম্ভব তা সম্পন্ন করার এবং তার পূর্বে কমপক্ষে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার সহায়ক হিসেবে প্রশ্নোত্তর আকারে জরুরী বিষয়গুলো সংকলন করতে বলি। ফলশ্রুতিতে তিনি তা সুসম্পন্ন করতে প্রয়াস পান।

কিতাবটিতে আদ্যপান্ত দৃষ্টি বুলিয়েছি আমি। আলহামদুলিল্লাহ! লেখক নবীন হলেও এ জগতে তার যথেষ্ট প্রতিভা ও যোগ্যতার স্বাক্ষর বহন করবে এ আমার বিশ্বাস। সর্বাঙ্গিন সুন্দর করার চেষ্টা-পরিশ্রমের পর আজ তা শিক্ষার্থীদের সামনে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। ভুল ভ্রান্তি বিজড়িত মানুষের থেকে সম্পূর্ণ নির্ভুলতার দাবি করা আদৌ সম্ভব না। বরং ক্ষেত্র বিশেষ ভুল-ত্রুটি থাকাই স্বাভাবিক। তাই এ ব্যাপারে কেউ অবহিত করলে আগামী সংস্করণে ইনশাআল্লাহ তার যথাযথ কদর করা হবে।

হাফিজুর রহমান যশোরী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

س (١) : مَامَعْنَى التَّفْسِيْرِ وَالتَّاوِيْلِ لُغَةً وَاصْطِلاحًا ؟ ومَا الفرقُ بينهُمَا ؟ بَيِّنْ

উত্তর ঃ مَعْنَى التَّفْسِيْرِ لُغَةً (تفسير এর শাব্দিক অর্থ) ঃ

تَفْسِيْر শব্দটি بَابُ التَّفْعِيْلِ এর মাসদার। এর মাদ্দাহ্ সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে–

১. تفسير শব্দটি فَسْرٌ ক্রিয়ামূল থেকে নির্গত। যার অর্থ اَلْكَشْفُ وَالْاِيْضَاحُ অর্থাৎ অনাবৃত করা, উন্মুক্ত করা, উজ্জ্বল করা, আলোকিত করা ইত্যাদি। যেহেতু তাফসীর শাস্ত্রে আল কুরআনে বর্ণিত আহকাম তথা বিধি-বিধানগুলো বিস্তারিত বর্ণনা পূর্বক উম্মোচন ও স্পষ্ট করা হয়। তাই একে ইলমে তাফসীর করে নামকরণ করা হয়েছে।

২. تفسير শব্দটি سَفَرٌ ধাতুমূল থেকে مَقْلُوب রূপে এসেছে। ইমাম রাগিব ইস্পাহানী (রহঃ) (মৃতঃ ৫০২ হিঃ) বলেন, اَلْفَسْرُ وَالسَّفَرُ يَتَقَارَبُ مَعْنَاهُمَا كَتَقَارُبِ لَفْظَيْهِمَا অর্থাৎ فَسر ও سَفَر শব্দদ্বয় কাছাকাছি অর্থবোধক যেমন গঠনের দিক দিয়ে উভয়টি পরস্পর নৈকট্যশীল।

سَفَرٌ শব্দের অর্থ ঃ سفر এর অর্থ পরিভ্রমণ। ভ্রমণের মাধ্যমে যেরূপ বহুবিধ জ্ঞান অর্জন করা যায়। বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি-কালচার ও প্রাকৃতিক দৃশ্য পর্যটকের সামনে প্রস্ফুটিত হয়। তদ্রূপ তাফসীর শাস্ত্রের মাধ্যমে কুরআনে বর্ণিত অসংখ্য তত্ত্ব, তথ্য ও নিগূঢ় তাৎপর্যবহ জ্ঞান অর্জন হয়। তাই একে عِلْمُ التفسير বলা হয়। তবে আল্লামা আলূসী (রহঃ) রূহুল মা'আনীতে এ অভিমতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন– (খ : ১, পৃষ্ঠা-৪)

৩. কেউ কেউ বলেন– تفسير শব্দটি تَفْسِرَة শব্দ থেক নির্গত। আর تَفْسِرَة বলা হয় ঐ পেশাবকে যা দ্বারা চিকিৎসক রোগ নির্ণয় করে। যেহেতু তাফসীর শাস্ত্রের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্য নির্ণয় করা হয় তাই এ শাস্ত্রকে তাফসীর শাস্ত্র বলে।

مَعْنَى التَّفسيرِ اِصْطِلاحًا (تفسير এর পারিভাষিক অর্থ) :

শরীয়তের পরিভাষায় ইলমে তাফসীরের সংজ্ঞা দানে তাফসীরবেত্তা মনীষীগণ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন।

১. আল্লামা যারকাশী ও আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) বলেন–

هُوَعِلْمٌ يُعرَفُ بِهِ فَهْمُ كِتَابِ اللّٰهِ الْمُنَزَّلُ عَلَى نَبِيِّهِ وَبَيَانُ مَعَانِيْهِ وَاسْتِخْرَاجُ أَحْكَامِهِ وَحُكْمُهُ -

অর্থাৎ তাফসীর হল– এমন শাস্ত্র যা দ্বারা কুরআনের বুঝ অর্জিত হয় এবং কুরআনের অর্থের ব্যাখ্যা, তার আহকাম বা বিধি-বিধানগুলো আহরণ ও হিকমত তথা সুক্ষ্মজ্ঞানসমূহ উদঘাটন করা যায়। (আল বুরহান খন্ড : ১; পৃষ্ঠা - ১৩, উলূমুল কুরআন।)

২. শায়খ আবূ হাইয়ান বলেন- هُوَعِلْمٌ يُبْحَثُ فِيْهِ عَنْ كَيْفِيَّةِ النُّطْقِ بِالْفَاظِ الْقُرْاٰنِ وَمَدْلُوْلَاتِهَا وَاَحْكَامِهَا الْاِفْرَادِيَّةِ وَالتَّرْكِيْبِيَّةِ وَمَعَانِيْهَا الَّتِىْ تُحْمَلُ عَلَيْهَا حَالَةُ التَّرْكِيْبِ وَتَتِمَّاتٍ كَذَالِكَ -

অর্থাৎ ইলমে তাফসীর এমন একটি শাস্ত্র যার মধ্যে কুরআনের শব্দাবলীর উচ্চারণ পদ্ধতি, এর বিষয়বস্তু, শব্দ ও বাক্য বিন্যাসের রীতিনীতি ও সেসব অর্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, যা এ শব্দাবলীর দ্বারা বাক্য বিন্যাসের অবস্থায় উদ্দেশ্য করা হয়। তদুপরি কুরআনী আয়াতের নাসেখ-মানসূখ, শানে নুযূল এবং অস্পষ্ট ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে সেসব অর্থ উপলব্ধি করার জন্য তাফসীর শাস্ত্র পরিশিষ্টের কাজ দেয়। (রুহুল মা'আনী খন্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৪ তাফসীরে বায়যাবীর ভূমিকা)

مَعْنَى التَّاوِيْلِ لُغَةً **(তাবীলের শাব্দিক অর্থ) ঃ**

বলা বাহুল্য যে, اَلتَّاوِيْل শব্দটি بَابُ التَّفْعِيْل এর মাসদার। মাদ্দাহ হল اَوْل। আভিধানিক দৃষ্টিকোন থেকে শব্দটি নিন্মোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়।

اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْط গ্রন্থে শব্দটির তিনটি অর্থ করা হয়েছে–

১. اَلْاِرْجَاع বা ফিরিয়ে দেয়া। তাবীলের মাধ্যমে আয়াতের সম্ভাব্য অর্থের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়া হয়।

২. اَلتَّفْسِيْر বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা।

৩. اَلتَّعْبِيْر বা স্বপ্নের ব্যাখ্যা।

কারো কারো মতে اَلتَّاوِيْل শব্দটি اَلْاِيَالَةُ ধাতুমূল থেকে নির্গত। যার অর্থ السِّيَادَةُ ও القِيَادَةُ অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা। তাবীলের মাধ্যমে কুরআনের ব্যবস্থাপনা সঠিক রাখা হয়।

معنى التّاويل اِصطلاحًا **(তাবীলের পারিভাষিক অর্থ) ঃ**

আল্লামা মাতুরীদী (রহঃ) বলেন-

১. اَمَّا التَّاوِيْلُ فَهُوَ تَرْجِيْحُ اَحَدِ الْمُحْتَمَلَاتِ بِدُوْنِ الْقَطْعِ

অর্থাৎ একাধিক অর্থের সম্ভাবনাসূচক শব্দের যে কোন একটি অর্থকে অনিশ্চিতভাবে অগ্রাধিকার দেয়া।

আল্লামা আবূ নসর আল কুরাইশী (রহঃ) বলেন, اَلتَّاوِيلُ مَا اسْتَنْبَطَهُ الْعُلَمَاءُ الْعَامِلُوْنَ لِمَعَانِى الْخِطَابِ الْمَاهِرُوْنَ فِى اُلافِ الْعُلُومِ

অর্থাৎ আল্লাহর বাণী মোতাবেক আমলকারী হাজার শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ পন্ডিতের আহরিত বিষয়কে তাবীল বলে।

মুফতী সৈয়দ আমীমুল ইহ্সান (রহঃ) বলেন,

التاويلُ فِى الشّرعِ صَرْفُ اللَّفْظِ عنْ مَعناهُ الظّاهِرِ اِلٰى مَعْنىً يحْتَمِلُهُ

অর্থাৎ শব্দের বাহ্যার্থ পরিত্যাগ করে সম্ভাব্য অন্য কোন অর্থের প্রতি প্রত্যাবর্তন করা।

اَلْفَرقُ بَيْنَ التَّفْسِيرِ وَالتّاوِيلِ **(তাফসীর ও তাবীলের মধ্যে পার্থক্য)** ঃ আল্লামা আবূ উবাইদাসহ কয়েকজন বিশেষজ্ঞের অভিমত হল, দু'টি শব্দই অভিন্ন অর্থবোধক। তবে অন্যান্য পণ্ডিতগণ শব্দ দুটির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে কয়েকটি অভিমত তুলে ধরা হলো–

১. আল্লামা বাজালী বলেন, التفسيرُمَا يَتَعَلَّقُ بِالرِّوَايَةِ وَالتاويل مَا يَتَعَلَّقُ بِالدِّرَايَةِ অর্থাৎ রিওয়ায়াত নির্ভর ব্যাখ্যাকে তাফসীর বলে, আর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে কৃত ব্যাখ্যাকে তাবীল বলে।

২. ইমাম রাগিব ইস্পাহানী (রহঃ) বলেন, তাফসীর হল عام (ব্যাপ্তার্থবোধক) আর তাবীল হল خاص (বিশেষার্থবোধক) শুধুমাত্র ঐশ্বরিক গ্রন্থের ক্ষেত্রে তাবীল শব্দ ব্যবহৃত হয়। আর ঐশ্বরিক গ্রন্থ ও মানব রচিত কিতাবের ক্ষেত্রে তাফসীর শব্দ ব্যবহৃত হয়।

৩. ইমাম মাতুরীদী (রহঃ) বলেন, প্রত্যয়ের সাথে কৃতব্যাখ্যাকে তাফসীর আর সন্দেহযুক্তকৃত ব্যাখ্যাকে তাবীল বলা হয়।

৪. শব্দের বিষয়বস্তু বর্ণনা করার নাম হল তাফসীর, আর বিষয়বস্তু থেকে নির্গত শিক্ষা ও ফলাফল বর্ণনাকে তাবীল বলে।

৫. পৃথক পৃথক প্রত্যেকটি শব্দের ব্যাখ্যা হল তাফসীর, আর বাক্যের সমষ্টিগত মর্মব্যাখ্যার নাম হলো তাবীল।

৬. আল কুরআনের ব্যাপারে মহানবী (সঃ), সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী তাবে'-তাবেয়ীন তথা সালফে সালেহীনের প্রদত্ত ব্যাখ্যা হলো তাফসীর।

আর কুরআনের মনগড়া বিশ্লেষণ যা সালফে সালেহীনের ব্যাখ্যার পরিপন্থী তাকে তাবীল বলে।

س (٢) : لِمَا مَسَّتِ الْحَاجَةُ اِلَى التَّفْسِيْرِ وقَدْ قَالَ تَعَالَى وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ؟

উত্তরঃ اَلْاِحْتِيَاجُ اِلَى تَفْسِيْرِ الْقُرْاٰنِ (কুরআন তাফসীরের প্রয়োজনীয়তা) ঃ

একথা স্বতসিদ্ধ যে, যেকোন লেখক গ্রন্থ রচনা করেন এমনভাব নিয়ে যেন তা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই বোধগম্য সম্ভব হয়। তারপরও তিনটি কারণে গ্রন্থের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়।

১. রচয়িতার পরিপূর্ণ পাণ্ডিত্যের কারণে। কেননা পণ্ডিত ব্যক্তি রামু সংক্ষিপ্ত ভাষায় তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ শামিল করেন যা অপরের জন্য অনেক সময় বুঝা অসম্ভব হয়ে যায়। ফলে তা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়।

২. কখনো কোন বিষয়ের পূর্বশর্ত বা উপসংহার লেখকের নিজের কাছে সুস্পষ্ট হওয়ার কারণে অনুল্লেখ রাখেন। কিন্তু অনেক পাঠক তা জানেন না, ফলে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়।

৩. শব্দ মৌলিক, রূপক বা একাধিক অর্থযুক্ত হলে লেখকের উদ্দিষ্ট অর্থ নির্ণয়ের জন্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়। কখনো আবার লেখার মধ্যে মানবীয় ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি বিচ্যুতির কারণে কোন কথা বাদপড়ে বা অস্পষ্ট থাকে যার ফলে তা চিহ্নিত করার জন্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়। তবে এ কারণটি কুরআনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

বস্তুতঃ কুরআনের আয়াত দু'প্রকার– এক প্রকারের আয়াতে সাধারণ নসীহতের কথা এবং শিক্ষণীয় ঘটনা ও উপদেশমূলক বিষয়বস্তুর আলোচনা করা হয়েছে। যেমন– দুনিয়ার অস্থায়িত্ব, জান্নাত-জাহান্নামের অবস্থা, খোদাভীতি, পরলৌকিক চিন্তা এবং জীবনের অন্যান্য সাধারণ বিষয়াবলী। এ প্রকারের আয়াত নিঃসন্দেহে সহজ। আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ যে কেউ পড়ে বুঝতে পারে। এমনকি কুরআনের নির্ভরযোগ্য অনুবাদ পড়েও এ নসীহত হাসিল করা যায়। এ প্রকার আয়াত সম্পর্কেই আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন–وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ

অর্থাৎ আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি। তাই কুরআন এ কথাটিকে অস্পষ্ট না রেখে مـذكـر (নসীহত গ্রহণের জন্য) শব্দ যোগ করে দিয়ে প্রকৃত বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট করে দিয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকার আয়াতগুলো শরীয়তের হুকুম আহকাম, আইন কানুন, আকীদা বিশ্বাস ও ইলমী বিষয়বস্তু সম্বলিত। এগুলো থেকে আহকাম ও মাসআলা আহরণ করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। ইসলামী বিষয়বস্তুসমূহে গভীর জ্ঞান ও পরিপূর্ণ দক্ষতা অর্জন ছাড়া এ উদ্দেশ্য অর্জিত হয়য না।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আরবী ভাষার যৌবনকালে বিস্ময়কর সাহিত্য অলংকার ও ভাষাশৈলীতে অবতীর্ণ হয়েছে। ফলে কুরআন মজীদ সবার জন্য হৃদয়ঙ্গম করা

সুকঠিন ছিল বিধায় তাফসীরের প্রয়োজন দেখা দেয়। সাহাবায়ে কেরামেরও তাফসীরের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। তারা কুরআনের বাহ্যিক অর্থ ও আহকাম বুঝলেও সুক্ষ্ম তাৎপর্যের জন্য রাসূলের শরণাপন্ন হতেন। সাহাবায়ে কেরাম আরবী ভাষাজ্ঞান ও কুরআন অবতরণের পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্মক জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও কুরআন পূর্ণাঙ্গরূপে বুঝার জন্য তাফসীরের মুখাপেক্ষী ছিলেন। অতএব আমরা এসব কিছু সম্পর্কে অজ্ঞ হেতু তাফসীরের অধিক মুখাপেক্ষী।

س (٣) : كَمْ شَيْئًا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا الْمُفَسِّرُ وَمَاهِيَ؟ وَمَنْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفَسِّرَ الْقُرْآنَ؟

(মুফাসসিরের জন্য কোন কোন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া অবশ্যক, আর কার জন্য তাফসীর করা জায়িয?)

উত্তর ঃ কিংবদন্তী মুফাসসির আল্লামা মাহমূদ আলূসী (রহঃ) তাফসীরের জন্য সাতটি পূর্বশর্ত উল্লেখ করেছেন। নিম্নে তা প্রদত্ত হল ঃ

১. আরবী ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করা।

২. আরবী ভাষার ব্যাকরণ শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন করে শব্দ ও বাক্যের বিধি-বিধান জানা।

৩. ইলমে মা'আনী, ইলমে বায়ান ও ইলমে বদী' তথা আরবী অলংকার শাস্ত্রের সকল শাখা-প্রশাখার জ্ঞান লাভ করা।

৪. হাদীস শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করে অস্পষ্ট বিষয়কে চিহ্নিত করা, সংক্ষিপ্ত বিষয়কে ব্যাখ্যাকরা। শানে নুযুল ও নাছিখ-মানছুখ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা।

৫. উসূলে ফিকাহ অধ্যয়ন করে مطلق، ও عام، مفصل ও مجمل ও خاص ও مقيد، امر ও نهى সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

৬. ইলমে কালাম বা দর্শন শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করে আল্লাহ তাআলার স্বত্ত্বার জন্য কোন কোন শব্দ ব্যবহার করা জায়িয এবং কোনটি স্বত্ত্বার জন্য ওয়াজিব, আর কোনটি আল্লাহর পূত পবিত্র স্বত্ত্বার জন্য অসম্ভব তা জানার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী সম্পর্কে গবেষণা করা বাঞ্ছনীয়।

৭. ইলমুল কিরাআত ও তাজবীদ জানা।

আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) তাফসীরের জন্য আবশ্যক পনেরটি ইলম উল্লেখ করেছেন। সেগুরো নিম্নরূপ−

১. عِلْمُ اللُّغَةِ (শব্দমালা), ২. علم النحو (ব্যাকরণ শাস্ত্র), ৩. علم الصرف (শব্দ প্রকরণ), ৪. عِلْمُ الإِشْتِقَاقِ (নিষ্পনন শাস্ত্র), ৫. علم المَعَانِى (শব্দতত্ত্ব শাস্ত্র), ৬. عِلْمُ الْبَيَانِ (বাক্য প্রয়োগ-জ্ঞান), ৭. عِلْمُ الْبَدِيعِ

(অলংকার শাস্ত্র), ৮. علم القرات (ধ্বনি তত্ত্ব ও পাঠ পদ্ধতির জ্ঞান), ৯. اصولُ الدِّيْنِ (দ্বীনের মূলনীতি), ১০. اصولُ الْفِقْهِ (ফিকাহ্‌র মূলনীতি), ১১. اَسْبَابُ النُّزُوْلِ وَالْقَصَصِ (অবতরণের প্রেক্ষাপট ও ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণ।), ১২. علمُ الحَدِيْثِ, ১৪. علمُ الْفِقْهِ, ১৩. اَلنَّاسِخُ وَالْمَنْسُوْخُ (ফিকাহ্‌শাস্ত্র), (অস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা সম্বলিত হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা।), ১৫. علم المُوْهَبَة (আল্লাহ্ প্রদত্ত বিশেষ প্রতিভা) যা সৎকর্ম সম্পাদন তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বনের মাধ্যমে অর্জন হয়। (ইতকান পৃষ্ঠা : ৩৩১ ও ৩৩২)

যার এ সকল জ্ঞান অর্জিত হয়েছে বা যার মধ্যে উপরোল্লিখিত গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছে, তার জন্য কুরআনুল কারীমের তাফসীর করা জায়িয।

س (٤) : (لف) مَامَعْنَى التَّفْسِيْرِ بِالرَّاْئِ وَمَاذا حُكْمُهُ؟ مَاذا رَأيُكُم فِيْ مَنْ يُّجَوِّزُ التَّفْسِيْرَ بِالرَّاْيِ وَيَدَّعِي عَدَمَ ضَرُوْرَةِ الْاَخْذِ مِنَ الْاَسْلَافِ وَيَقُوْلُ فِيْهِم هُمْ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ؟

উত্তর ঃ تفسير بالرائ এর অর্থ ও বিধান ঃ

تَفْسِيْر بِالرَّاْي এর দু'টি পদ্ধতি রয়েছে।

১. আল কুরআনের তাফসীর সংক্রান্ত নীতিমালা, রিওয়ায়াত এবং সলফে সালেহীনের মতামত বহির্ভূত ব্যক্তিগণের আপন জ্ঞান, মতামত ও ধারণা মোতাবেক কুরআনের নির্দিষ্ট অর্থ গ্রহণ করা। এর সংজ্ঞায় হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা কাসেম নানুতুবী (রহঃ) বলেন, প্রবৃত্তির চাহিদা ও নিজের ইচ্ছাধীন কোন তাফসীর করা হলে তাকে تفسير بِالرَّاْي বলা হবে। এ পদ্ধতির তাফসীর সম্পূর্ণরূপে নাজায়েয ও হারাম। আল্লামা যারকাশী (রহঃ) বলেন, لَا يَجُوْزُ وَتفْسِيْرُ الْقُرْاٰنِ بِمُجَرَّدِ الرَّاْيِ وَالْاِجْتِهَادُ مِنْ غَيْرِ اَصْلٍ অর্থাৎ শরীয়তের নির্ধারিত নীতিমালাহীন ইজতিহাদ ও নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে কুরআনের তাফসীর করা জায়েয নেই। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) এ পদ্ধতির তাফসীরের পরিচিতি দিতে গিয়ে বলেন, تَفْسِيْر بِالرَّاْي এ পাঁচটি বস্তু বিবেচ্য রয়েছে,

১.৭টি শর্ত বা ১৫টি শাস্ত্রের উপর ব্যুৎপত্তি অর্জন, সেগুলো ছাড়াই তাফসীর করা।

২. যে সকল আয়াতে মুতাশাবিহাতের ব্যাখ্যা আল্লাহ তাআলাও তার রাসূল ব্যতিত কেউ জানেন না সেগুলোর সুনির্দিষ্ট তাফসীর করা।

৩. তাফসীরের ক্ষেত্রে কুরআনকে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতাদর্শের অধিনস্থ করা।

৪. অকাট্য প্রমাণ ছাড়াই এরূপ দাবী করা যে, এ আয়াত দ্বারা সুনির্ধারিতভাবে এটাকে বুঝানো হয়েছে।

৫. আপন মনগড়া তাফসীর করা।

تفسير بالرأى নাজায়িয বা হারাম হওয়ার স্বপক্ষে দলীল ও প্রমাণ হলো– আয়াতে কুরআনী

١. وَلَاتَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (اسراء ٣٦)

٢. وَلَاتَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ...... اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَالَا تَعْلَمُوْن (البقرة)

এ আয়াতগুলোতে না জেনে কিছু বলা নিষেধ করা হয়েছে এবং এটাকে শয়তানের প্রতারণা ও ধোকা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর تفسير بالرائ ও মূলত কুরআনের আয়াতে না জেনে কিছু বলা। অতএব তা সম্পূর্ণ হারাম।

হাদীসে নববী ঃ

(١) مَنْ فَسَّرَ الْقُرْاٰنَ بِرَائِهِ فَاصَابَ فَقَدْ اَخْطَأَ

(٢) مَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّءْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (بيهقى)

(٣) مَنْ تَكَلَّمَ فِى الْقُرْاٰنِ بِرَائِهِ فَاصَابَ فَقَدْ اَخْطَاَ (الترمذى)

(٤) مَن قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِرَائِهِ فَقَد كَفَرَ

تَفْسِيْر بِالرَّائ এর দ্বিতীয় পদ্ধতি হল তাফসীরের মৌলিক নীতিমালা ও ইসলামে সর্ববাদী সম্মত নিয়ম-নীতির পাবন্দী করে এমন মতামত ব্যক্ত করা যা কুরআন সুন্নাহর পরিপন্থী নয়। এরূপ তাফসীর নাজায়িয নয়। আল্লামা মাওয়ারদী (রহঃ) বলেন, কোন কোন অতিরঞ্জনপ্রিয় লোক مَنْ تَكَلَّمَ فِى الْقُرْاٰنِ بِرَائِهِ فَاصَابَ فقدْ اَخْطَاْ এ হাদীসের আলোকে বলেন যে, চিন্তা-গবেষণা ও রায়ের উপর ভিত্তি করে কুরআন সম্বন্ধে কোন কথা বলাই জায়িয নেই। এমনকি শরীয়তের মৌলনীতির সাথে সামঞ্জস্যশীল হলেও ইজতিহাদের মাধ্যমে কুরআন থেকে কিছু ইস্তিম্বাত (استنباط) করা যাবে না। এ ধারণা মোটেও ঠিক নয়। কেননা স্বয়ং কুরআন তার বিভিন্ন স্থানে গভীর চিন্তা-ভাবনা ও ইস্তিম্বাত-গবেষণা করাকে পছন্দনীয় বলেছে। সামগ্রিকভাবেই যদি চিন্তা-গবেষণার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়, তাহলে কুরআন-হাদীস হতে শরীয়তের আহকাম ও বিধি-বিধান আহরণ করার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং উক্ত হাদীস দ্বারা সর্বপ্রকার রায় বা মতামতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা উদ্দেশ্য নয়। (আল ইতকান খণ্ড : ৩; পৃষ্ঠা : ১৮০)

সালফে সালেহীন তথা রাসূল (সাঃ)-এর সাহাবা ও তাবেঈগণের উক্তি ও মতামত তাফসীরে কুরআনের উৎস হিসেবে পরিগণিত। তাদের ছাড়া অন্য কারো উক্তি ও অভিমত শরীয়তের মৌলনীতি ও সালফে সালেহীনের অভিমতের সাথে সাংঘর্ষিক হলে গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য হবে না। সাহাবা ও তাবেঈগণকে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) خير القرون ঘোষণা করে মনোনীত করেছেন। অতএব তাদের সাথে নিজেদের তুলনা করা গোমরাহী ছাড়া কিছুই নয়।

(ب) هُمْ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ" ....

উত্তর ঃ সাবাঈ চক্রের তথাকথিত বুদ্ধিজীবিরা নক্ষত্রতুল্য সাহাবায়ে কেরামেরও পুণ্যাত্মা পূর্বসূরীদের প্রতি ধৃষ্টতাপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করতে গিয়ে বলে, هُمْ رجال وَنَحْنُ رجال (বুদ্ধি ও মেধায় সাহাবা ও পূর্বসূরীগণ মানুষ ছিলেন আমরাও মানুষ)। উপ-মহাদেশীয় তথাকথিত ইসলামী পণ্ডিত সে কথাটাকে একাডেমিক ভাষা দিয়েছে যে, صحابهٔ كرام معيارِحَقّ نهيں هے

"সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি নয়" সুতরাং কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যা ও মর্ম অনুধাবনের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম ও পূর্বসূরীদের মাধ্যমরূপে গ্রহণ করা নিষ্প্রয়োজন বরং উদার ও মুক্তবুদ্ধির আলোচনা, কুরআন-সুন্নাহর প্রত্যক্ষ অধ্যয়নই কেবল দ্বীনের নির্ভেজাল জ্ঞান সংগ্রহের প্রকৃষ্ট উপায়।

বলা বাহুল্য যে, এই সর্বনাশা ভ্রান্ত-চিন্তাই কুরআন-সুন্নাহর মনগড়া ব্যাখ্যা ও বিকৃত উপস্থাপনার ক্ষেত্রে এমন বাধভাঙ্গা সয়লাব নিয়ে আসবে যে, ইসলামকে তখন তার সঠিক আকৃতিতে বহাল রাখাই অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাদের উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা তারা পরোক্ষভাবে নিজেদেরকে সাহাবীদের সমতুল্য দাবী করছে। অথচ কুরআনুল কারীমের একাধিক আয়াতের সাহাবাদের পরিশুদ্ধতার সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে। যেমন– ১. رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ .২ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ .৩ أُولٰئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

রাসূল (সা.) সাহাবাদের ও তৎপরবর্তী তাবেয়ী ও তাবে তাবেঈন সম্পর্কে পূর্ণ পুণ্যাত্মার ঘোষণা দিয়েছেন–

خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ

ওহী অবতরণের প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে এবং স্বয়ং নবী কারীম (সাঃ) এর পবিত্র যবান থেকে কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শুনার কারণে তাদের থেকে কুরআনের ব্যাখ্যা ও মর্ম অপর কারো অধিক জানার কথা নয়। আর তাবেঈন ও তাবে তাবেঈন পর্যায়ক্রমে সাহাবাদের ইলমের ধারক বাহক হওয়ায় তাফসীর শাস্ত্রে তাদের অভিমত উৎস হিসেবে পরিগণিত। অতএব তাদের অভিমতকে ডিঙ্গিয়ে এমন তাফসীরকে কিছুতেই জায়েয বলে মেনে নেয়া যায় না। যার কোন সাম স্যতা সাহাবাদের মতের সাথে নেই।

س (٥) : كَمْ طَبَقَةٌ لِلْمُفَسِّرِينَ وَمَا هِيَ؟ وَالْبَيْضَاوِيُّ مِنْ أَيِّ طَبَقَةٍ؟

উত্তর ঃ মুফাস্‌সিরগণের স্তর বিন্যাস ঃ

মুফাস্‌সিরগণের স্তরবিন্যাস দু'ভাবে করা যায়,

১. যুগ ও কালের দিক দিয়ে, ২. মুফাসসিরগণের প্রতিভা ও যোগ্যতার বিচারে।

যুগ বা কালের দিক দিয়ে মুফাস্‌সিরগণকে মোট ১১ স্তরে ভাগ করা যায়।

প্রথম স্তর ঃ সাহাবা ও তাবেঈদের স্তর। সাহাবাদের মধ্য হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রহঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) তাফসীর শাস্ত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। আর তাবেঈদের মধ্য হযরত মুজাহিদ (রহঃ), হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহঃ), হযরত ইকরিমা (রহঃ) বিশেষ ব্যুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন।

দ্বিতীয় স্তর ঃ হরযত দাউদ ইবনে কাওসার (রহঃ) (মৃতঃ ১০৫ হিঃ) হযরত মুররাহ হামদানী (রহঃ) (মৃতঃ ৭৫/৭) হিজরী ৬। হাসান বসরী (রহঃ) (মৃতঃ ১১০ হিজরী) হযরত কাতাদা (মৃতঃ ১১৭ হিঃ) ২য় স্তরের উল্লেখযোগ্য মুফাসসির ছিলেন।

তৃতীয় স্তর ঃ হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ (রহঃ) (মৃতঃ ১৯৮ হিঃ), হযরত ওয়াকী ইবনুল জাররাহ (রহঃ) (মৃঃ ১৯৭ হিঃ), শোবা ইবনুল হাজ্জাজ (রহঃ) (মৃত ঃ ১৬০ হিঃ) প্রমুখ এ স্তরের খ্যাতনামা তাফসীরবেত্তা ছিলেন।

চতুর্থ স্তর ঃ আবূ জাফর ইবনে জারীর তাবারী (রঃ) (মৃতঃ ৩১০ হিঃ) আবুল কাসিম ইবরাহীম নো'মাতী (রহঃ) (মৃতঃ ৩০৩ হিজরী) আব্দুর রহমান ইবনে আবূ হাতিম (রহঃ) (মৃতঃ ৩০৫ হিঃ) প্রমুখ এ স্তরের বিশেষজ্ঞ মুফাসসির ছিলেন।

পঞ্চম স্তর ঃ আবূ আব্দুর রহমান, মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন সলমী (রহঃ) (মৃতঃ ৪১২ হিঃ), আবূ ইসহাক আহমদ সান্নাবী (রহঃ) (মৃতঃ ৪২৭ হিঃ) প্রমুখ এ স্তরের বিখ্যাত মুফাসসির ছিলেন।

ষষ্ঠ স্তর ঃ ইমাম রাগিব আস্পাহানী (রহঃ) (মৃতঃ ৫০৩ হিজরী), ইমাম গাযালী (রহঃ) (মৃতঃ ৫২৫ হিঃ) ইমাম মাহমূদ বাগাবী (রহঃ) (মৃতঃ ৫০৬ হিঃ) আল্লামা জারুল্লাহ যমখশরী (রহঃ) (মৃত ৫৩৮ হিঃ) প্রমুখ এ স্তরের প্রখ্যাত তাফসীরজ্ঞ ছিলেন।

সপ্তম স্তর ঃ ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহঃ) (মৃঃ ৬০৬ হিঃ), কাযী নাসিরুদ্দীন বায়যাবী (রহঃ) (মৃতঃ ৬৮৫ হিঃ) ইমাম মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী (রহঃ) (মৃতঃ ৬৩৮ হিঃ) প্রমুখ এ স্তরের কিংবদন্তী মুফাসসির ছিলেন।

অষ্টম স্তর ঃ ইমাম নাসাফী (রহঃ) (মৃতঃ ৭১০ হিঃ), আল্লামা ইবনে কাসীর (মৃতঃ ৭৭৪ হিজরী), আল্লামা তাফতাযানী (রহঃ) (মৃতঃ ৭৯২ হিঃ) আল্লামা বদরুদ্দীন যারকাশী (রহঃ) (মৃতঃ ৭৯৪ হিঃ) প্রমুখ এ স্তরের বিখ্যাত মুফাসসির ছিলেন।

নবম স্তর ঃ আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (রহঃ) (মৃত ৮৬৪ হিঃ), আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) (মৃতঃ ৯১১ হিঃ), আবূ তাহির ফিরোযাবাদী (রহঃ) (মৃতঃ ৮১৭ হিঃ) প্রমুখ এ স্তরের খ্যাতনামা তাফসীরকারক ছিলেন।

দশম স্তর ঃ কাযী শাওকানী (রহঃ) (মৃতঃ ১২৫৫ হিঃ), কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (রহঃ) (মৃত ১২২৫ হিঃ), শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী (রহঃ) (মৃতঃ ১১৯৭ হিঃ), আল্লামা মাহমূদ আলূসী (রহঃ) (মৃত ১৩০৪ হিঃ) এ স্তরের প্রখ্যাত মুফাসসির ছিলেন।

একাদশ স্তর ঃ শাইখুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহঃ) (মৃঃ ১৩৯৯) আল্লামা রশীদ রেজা মিসরী (রহঃ) (মৃত ১৩৫৪ হিঃ) মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ), মাওলানা আব্দুল মাজিদ দরিয়াবাদী (রহঃ), মুফতী শফী (রহঃ), মাওলানা আহমদ আলী লাহরী (রহঃ) এ স্তরের খ্যাতমান তাফসীরবেত্তা ছিলেন।

ধরন-প্রকৃতি বিচচরে তাফসীরের স্তর ঃ তাফসীরের মাধ্যমের যে সকল মহা মনীষীগণ কুরআনুল কারীমের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন তাদের রচনার ধরণ ও প্রতিভার আলোকে তাদের তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়।

প্রথম স্তর ঃ যারা সরাসরি কুরআনের ব্যাখ্যা করেন না আবার কোন মুজতাহিদ ইমামের প্রণীত উসূলে ইজতিহাদের অনুসরণ করেন না বরং আপন যুগ চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববর্তী মুফাসসিরগণের উক্তি ও অভিমত সংকলন করেন। আরবী ভাষায় সংকলীত সফওয়াতুল ইরফান, সফওয়াতুত তাফাসীর এবং উর্দূ ভাষায় আল্লামা শিববীর আহমদ উসমানী (রহঃ) সংকলীত হাশিয়া এ স্তরের মধ্যে পরিগণিত।

দ্বিতীয় স্তর ঃ যে সকল মুফাসসির কোন এক ইমামের প্রণীত নীতিমালার আলোকে কুরআনুল কারীমের তাফসীর করেন। শরীয়াতের আহকাম ও বিধি-বিধান এবং তত্ত্ব ও তথ্য উদঘাটন করেন। আরবী ভাষায় আল্লামা মাহমূদ আলুসী (রহঃ) কর্তৃক প্রণীত রুহুল মাআনী" এবং উর্দূ ভাষায় মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) রচিত বায়ানুল কুরআন এ স্তরের তাফসীর গ্রন্থ।

তৃতীয় স্তর ঃ সে সকল মুফাসসির যারা প্রথমে নিজেরা কতিপয় উসূল নির্ধারণ করেন অতপর এর অধীনে কুরআনের তাফসীর করেন। এ স্তরে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন মুজতাহেদীন ফুকাহা ও অনুসৃত চার ইমামকে পরিগণিত করা হয়।

যুগ বা কালের দিক দিয়ে ইমাম বায়যাবী (রহঃ) সপ্তম স্তরের মুফাসসির ছিলেন। আর প্রতিভার বিচারে তিনি তৃতীয় স্তরের মুফাসসির ছিলেন। (রদ্দে মাওদূদীয়ত ১৪ ও ২৫ পৃষ্ঠা; আত তাশরীহুল হাভীর ভূমিকা)

س (٦) : بِأَيِّ إِسْمٍ سُمِّى الْبَيْضَاوِىُّ مُؤَلَّفَهُ فِى التَّفْسِيْرِ؟ أُذْكُرْ نُبْذًا مِّنْ خَصَائِصِهِ وَمَزَايَاهُ؟

উত্তর ঃ আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) রচিত তাফসীর গ্রন্থের নাম ঃ তাফসীরে বায়যাবী নামে খ্যাত আল্লামা কাযী নাসিরুদ্দীন বায়যাবী (রহঃ) এর তাফসীর গ্রন্থের নাম أَنْوَارُ التَّنْزِيلِ وَأَسْرَارُ التَّاوِيلِ (আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুল তাবীল)

بَيَانُ خَصَائِصِ الْبَيْضَاوِيِّ وَمَزَايَاهُ **(তাফসীরে বায়যাবীর বৈশিষ্ট্য) ঃ** আল্লামা নাসিরুদ্দীন বায়যাবী (রহঃ) রচিত তাফসীরে বায়যাবী-এর বৈশিষ্ট্য ও মান-মর্যাদার বিবেচনায় অনেক তাফসীর গ্রন্থের উর্ধ্বে। মনীষীগণের মতে, তাফসীরে কাশ্‌শাফের পরে তাফসীরে বায়যাবী হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম তাফসীর গ্রন্থ। নিম্নে তাফসীরে বায়যাবীর কতিপয় বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো–

১. তাফসীরে বায়যাবী সাহিত্যিকরসে দর্শন শাস্ত্রানুরূপে সুবিন্যস্ত।

২. তাফসীরে বায়যাবী উচ্চাঙ্গের তুলনামূলক সর্বজন দুর্বোধ্য ও কঠিন প্রকৃতির যা সাধারণ লোকদের জন্য সহজসাধ্য নয়।

৩. আল্লামা বায়যাবী তার গ্রন্থে বিতর্কিত আলোচনার উত্তর এমনভাবে প্রদান করেছেন, যাতে কোন প্রকার প্রাসঙ্গিক প্রশ্নেরও অবকাশ থাকেনি।

৪. তাফসীরে বায়যাবীতে বিকৃত তথ্যের কোন সমাবেশ ঘটেনি।

৫. বাক্য বিন্যাসের ক্ষেত্রে আধুনিক পদ্ধতির প্রয়োগ এবং দার্শনিক তত্ত্ব উদঘাটনে তাফসীরে বায়যাবী একটি অদ্বিতীয় গ্রন্থ।

৬. তাফসীরে বায়যাবী বালাগাত, আকাঈদ, দর্শন, হেকমতের এক অনন্য সমাহার, জ্ঞান ভাণ্ডারের সাগর।

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ نُبْذًا مِّنْ حَيَاةِ الْمُؤَلِّفِ

জন্ম ও বংশ ঃ নাম আব্দুল্লাহ। উপনাম আবুল খায়ের ও আবূ সাঈদ। উপাধী নাসিরুদ্দীন। পিতার নাম উমর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী। তিনি পারস্য দেশের সিরাজ প্রদেশের "বায়যা" নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এ গ্রামের দিকে সম্পর্কিত করেই তাকে বায়যাবী বলা হয়। তিনি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) এর মর্যাদা ঃ আল্লামা তাজউদ্দীন তাঁর রচিত "তাবাকাতে কুবরা" নামক গ্রন্থে লিখেছেন– আল্লামা বায়যাবী আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে অটল, অনড়, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত, পরহেযগার এক বিরল ব্যক্তি ছিলেন। কর্ম জীবনের শুরুতেই তিনি সিরাজ নগরীর প্রধান বিচারপতির পদ অলংকৃত করেন। এ পদ লাভের পিছনে একটি চমকপ্রদ ঘটনা বর্ণিত আছে। কথিত আছে– একদা সিরাজ অধিপতি তাঁর দরবারী আলেমদের সামনে কুরআনে কারীমের একটি বিশেষ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। উপস্থিত সুধীবর্গের কেউই তার সপ্রমাণ যুক্তিগ্রাহ্য সমাধান দিতে পারেননি। আল্লামা নাসিরউদ্দীন একজন আগন্তুক হিসেবে

ঐ মজলিসের সর্বশেষ প্রান্তে উপবিষ্ট ছিলেন। সকলের মন্তব্য গ্রহণের পর সিরাজ আধিপতি তরুণ আগন্তুকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং তার কাছে আলোচ্য বিষয়টির সমাধান জানতে চান। জিজ্ঞাসিত হয়ে আল্লামা নাসিরউদ্দীন তড়াক করে উঠে বিভিন্ন প্রমাণাদি উপস্থাপন করে জ্ঞানগর্ভ ভাষায় আলোচ্য বিষয়াদির সর্বজন গ্রাহ্য সমাধান প্রদান করেন। এতে সিরাজ অধিপতির অতিব প্রীত হন এবং তাকে বিচারপতির আসনে অভিষিক্ত করেন। এ থেকে তিনি কাযী বায়যাবী নামে খ্যাত হন।

কিছুকাল পরে কোন কারণে এ পদ থেকে অব্যাহিত গ্রহণ করে তিনি তবরীয নামক শহরে গমন করতঃ সেখানকার একটি ইলমী মজলিসে প্রবেশের সুযোগ লাভ করেন। তিনি উক্ত মজলিসে সকলের পেছনে এভাবে চুপচাপ বসে পড়লেন যে, কেউ তাঁর আগমন এতটুকুও টের পায়নি। মজলিস চলাকালে শিক্ষক মহোদয় ছাত্রদেরকে সম্বোধন করে তাদের সামনে একটি প্রশ্ন রাখেন, এবং সাথে সাথে এ ঘোষণাও দেন যে, যদি কেউ এ প্রশ্নের জবাব দিতে না পারে তাহলে সে যেন প্রশ্নটি পুনরুল্লেখ করে। তার কথা শেষ হতে না হতেই কাযী সাহেব দাঁড়িয়ে জবাব দিতে আরম্ভ করেন। এতে শিক্ষক মহোদয় অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হন এবং বলতে লাগেন, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার কথা শুনবো না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার কৃত প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি না করবে। একথা শুনে কাযী সাহেব কোনরূপ চিন্তাভাবনা ছাড়াই প্রথমে শিক্ষকের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করেন এবং পরে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় তার সন্তোষজনক জবাব প্রদান করেন। সাথে সাথে প্রসঙ্গক্রমে তিনি উক্ত প্রশ্নোত্তরকে কেন্দ্র করে নিজে স্বকীয় একটি প্রশ্ন তৈরী করে শিক্ষক মহোদয়ের নিকট জবাব জানতে চান। শিক্ষক মহোদয় তাৎক্ষণিকভাবে এ প্রশ্নের জবাব দিতে অপারগ হয়ে যান। ঐ সময় তার পাশে একজন রাজকীয় মন্ত্রী বসাছিলেন।

তিনি অত্যন্ত গভীরভাবে তাদের প্রশ্নোত্তর দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। যখন মন্ত্রী সাহেব বুঝতে পারলেন যে, শিক্ষক মহোদয় এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন না। তখন তিনি আল্লামা বায়যাবীকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কে? কোত্থেকে এসেছেন? কাযী সাহেব বললেন, আমি সিরাজ নগরীর কাযী ছিলাম। আমাকে তথা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। মন্ত্রী তাকে ঐ পদে পুনরায় বহাল করে অত্যন্ত সম্মান ও ইজ্জতের সাথে বিদায় দিলেন।

রচনাবলী ঃ কাযী বায়যাবী (রহঃ) এর অমর কীর্তি হচ্ছে তাফসীরে বায়যাবী। এ মহামূল্যবান তাফসীর গ্রন্থসহ তিনি আরো অনেক সর্বজন সমাদৃত কিতাব রচনা করেছেন। সেগুলো হল (১) শরহে শরহে মাসাবীহ (২) মিনহাজ (৩) শরহে মাতালে (৪) লুব্বুল আলবাব ফি ইলমিল ইবাব (৫) নিযামুত তাওয়ারীখ (৬) তাফসীর আনওয়ারুত তানডীর ওয়া আসরারুত তাবীল প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত গ্রন্থটিই তাফসীরে বায়যাবী নামে খ্যাত।

ইন্তিকাল ঃ কাযী বায়যাবী (রঃ) এর মৃত্যু সন সম্পর্কে দু ধরণের বর্ণনা রয়েছে। একটি হচ্ছে ৭৯১ হিজরী এবং অপরটি হচ্ছে ৭৯৫ হিজরী, তবে প্রথম বর্ণনাটিই অধিক বিশুদ্ধ বলে অনেকে মনে করেন। তাঁর জন্ম সন সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

س (٦) : وَاَقْحَمَ مَنْ تَصَدّٰى لِمُعَارَضَتِهٖ مِنْ فُصَحَاءِ عَدْنَانَ وبُلَغَاءِ قَحْطَانَ حَتّٰى حَسِبُوْا اَنَّهُمْ سُحِّرُوْا تَسْحِيْرًا

الف : تَرْجِمِ العِبارةَ واضحةً

ب : مِصْدَاقُ فُصحاءِ عَدْنان وبُلَغاءِ قَحْطان مَنْ هُمْ؟

ج : مَا مَعْنَى السِّحْرِ لغةً واصطلاحًا وماحكمُ تعليمِهٖ وتَعَلُّمِهٖ

د : اُكْتُبْ وُجوهَ الْفَرْقِ بَيْنَ السِّحْرِ وَالْمُعْجِزَةِ -

ه : مَامعنى الْمُعَارَضَةِ وسببُ وُقوعِهَا ؟

উত্তর ঃ الف : প্রশ্নে উল্লেখিত ইবারতের বিশুদ্ধ অনুবাদ

এবং (আরবী সাহিত্য ও সভ্যতায় নব অন্তর্ভূক্ত) আদনান গোত্রীয় চারুবাক ভাষাবিদ ও (আদিবাসী আরবীয়) কাহতান গোত্রীয় বাগ্মি ভাষাবিজ্ঞানী যারা এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে মনোনিবেশ করেছিল। তাদেরকে তিনি নিশ্চুপ (ব্যর্থ) করে দিয়েছেন, ফলে তারা ধারণা করেছিল যে, জটিল যাদুমন্ত্রে তাদেরকে যাদুগ্রস্থ করা হয়েছে।

ب : আলোচ্য ইবারতে فُصحاءِ عَدْنان বলে আরবীয় সাহিত্য ও সভ্যতায় নব অন্তর্ভুক্ত অধিবাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে এবং بلغاءِقَحْطان বলে আদিবাসী আরবীয় অধিবাসীদের বুঝানো হয়েছে। কেননা عَدْنان হলো মাআদের পূর্ব পুরুষ যারা হযরত ইসমাইল (আঃ) এর বংশধর। আর قَحْطان হলো ইয়ামানের আদিপুরুষ। অতএব আরবের অধিবাসীরা দুশ্রেণীতে বিভক্ত যথাঃ ১. اَلْعَرَبُ الْعَرْبَاءِ আদিবাসী আরব। তারা হল বনী কাহতান। ২. اَلْمُسْتَعْرِبَةُ অনাদিবাসী আরবীয়। আর তারা হলো বনী আদ'নান যারা হযরত ইসমাঈল (আঃ)এর বংশধর।

ج : مَعْنَى السِّحْرِ لُغَةً (سحر এর শাব্দিক অর্থ) ঃ سِحْرٌ শব্দটি باب فتح এর মাসদার। এর শাব্দিক অর্থ হল كُلُّ مَا لَطُفَ وَ دَقَّ অর্থাৎ এমন প্রতিক্রিয়া যা সূক্ষ্ম ও অজান্তে প্রতিফলিত হয়। যাদুর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া যেহেতু সূক্ষ্ম ও অজান্তে হয়ে থাকে তাই যাদুকে سِحر বলা হয়।

مَعْنَى السِّحْرِ اصطلاحًا (سِحْر এর পারিভাষিক অর্থ) ঃ

سحر এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় ইমাম বায়যাবী (রহঃ) বলেন- مَايُسْتَعَانُ فِى تَحْصِيْلِهٖ بِالتَّقَرُّبِ اِلَى الشَّيْطَانِ مِمَّا لَايَسْتَقِلُّ بِهٖ اَلْاِنْسَانُ অর্থাৎ যাদু এমন বিষয়কে বলা হয়, যাতে মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত বস্তু অর্জন করার জন্য শয়তানের সাহায্য নেয়া হয়।

حكمُ تعليمِ السِّحْرِ وتعلُّمِه (**যাদু শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়ার বিধান**) ঃ যদি যাদুর মধ্যে এমন বিষয় পরিলক্ষিত হয় যা ঈমান ও ঈমানের শর্তাবলীর বিরোধী, তাহলে তা শিক্ষা করা বা শিক্ষা দেয়া সম্পূর্ণরূপে হারাম। পক্ষান্তরে যদি যাদুতে ঈমান বিরোধী কোন উপকরণ না থাকে, এমন যাদু যদি কারো উপকারার্থে শিক্ষা করা হয় তাহলে অনেকের মতে হারাম হবে না।

د : بيانُ الْفرْقِ بيْنَ السِّحْرِ وَالْمعْجِزَةِ (যাদু ও মু'জিযার মধ্যে পার্থক্য) ঃ

১. যাদু হল শয়তান, জ্বিন ও দুনিয়াবী বশীকরণ উপকরণের সাহায্যে এবং সুনির্দিষ্ট কিছু কাজের অনুশীলনের ফলে প্রকাশিত হয়। পক্ষান্তরে মু'জিযা হলো নবীর মাধ্যমে প্রকাশিত এরূপ একটি অলৌকিক বিষয় যা চ্যালেঞ্জরূপে পেশ করা সত্ত্বেও তার ন্যায় বিষয় প্রকাশ করতে অন্যরা অক্ষম হয়।

২. যাদুর মধ্যে চ্যালেঞ্জ থাকে না কিন্তু মু'জিযার মধ্যে চেলেঞ্জ থাকে।

৩. যাদু যাদের থেকে প্রকাশ পায় তারা স্বভাবগতভাবে ধিকৃত ও অভিশপ্ত। পক্ষান্তরে মু'জিযা যাদের থেকে প্রকাশ পায় অর্থাৎ নবীগণ উন্নত নৈতিকতা সম্পন্ন।

ه : معنى الْمُعَارَضَةِ وسببُ وُقوعِها : مُعَارَضَة এর অর্থ ও তা সংঘটিত হওয়ার কারণ।

مُعَارَضَة এর অর্থ হল চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা, প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বানে সাড়া দেয়া, চ্যালেঞ্জকারীর অনুরূপ কর্ম প্রদর্শন করা ইত্যাদি। আরবের তৎকালীন কবি সাহিত্যিকরা সাহিত্যের সকল শাখায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ দক্ষতা অর্জন করে ছিল। ঐশী গ্রন্থ আল কুরআন আল্লাহর প্রেরীত গ্রন্থ নয়, বরং মুহাম্মদ (সাঃ) এর স্বরচিত কাব্য গ্রন্থ। আরবের কাফির মুশরিকরা তাদের এ দাবীর যথার্থতা প্রমাণের জন্য তারা কুরআনের ক্ষুদ্রতম সূরার অনুরূপ জ্ঞানগর্ভ, অলংকার সমৃদ্ধ, আল্লাহ কতৃক সৌন্দর্যমণ্ডিত একটি সূরা রচনা করার তীব্র চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু কুরআন অবতরণের পর থেকে আজ অব্দি কবি সাহিত্যিক ভাষাবিজ্ঞানীরা সমন্বিত চেষ্টা করেও অনুরূপ ক্ষুদ্রতম একটি সূরা তৈরী করতে পারেনি।

س (٧) : فَكَشَفَ قِنَاعَ الْاِنْغِلَاقِ عَنْ اٰيَاتٍ مُحْكَمٰتٍ هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ وَاُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ هُنَّ رُمُوزُ الْخِطَابِ تَاوِيْلاً وتفسيرًا وَاَبْرَزَ غَوَامِضَ الْحَقَائِقِ ولَطَائِفَ الدَّقَائِقِ لِيَتَجَلّٰى لهُمْ خَفَايَا الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ وخَبَايَا الْقُدْسِ وَالْجَبَرُوْتِ ولِيَتَفَكَّرُوْا فِيْهِ تَفْكِيرًا

الف : ترجِمِ الْعِبارَةَ فَصِيْحَةً ـ

ب : اَلْفَاءُ فِيْ "فَكَشَفَ" لِاَيِّ مَعْنيً وكَيْفَ كَشَفَ قِنَاعَ الْاِنْغِلَاقِ مَعَ اَنَّ مَعْنى الْمُحْكَمَاتِ غَيْرُ مَسْتُوْرٍ

ج : مَا الْفَرقُ بَيْنَ الْمُحْكَمِ وَالْمُتَشَابِه ومَاوَجْهُ تَسْمِيَتِهِمَا بِاُمِّ الْكِتَابِ ورُمُوْزِ الْخِطَابِ

د : بَيِّنِ الْمُنَاسَبَةَ اِضَافَةِ الْغَوَامِضِ اِلٰى الْحُقَائِقِ وَاللَّطَائِفِ اِلٰى الدَّقَائِقِ ـ

উত্তর ঃ "الف" প্রশ্নোল্লেখিত ইবারতের তরজমা ঃ

অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাফসীর (বাহ্যিক ব্যাখ্যা) ও তাবীল (বাহ্যার্থের আড়ালে নিগূঢ় ব্যাখ্যা) এর মাধ্যমে মুহকাম (দ্ব্যর্থহীন) আয়াত থেকে বদ্ধত্বের যবনিকা উম্মোচিত করেছেন; যা (মুহকাম আয়াত) কিতাবের মূল বুনিয়াদ। অন্যগুলো মুতাশাবিহ (রূপক) আয়াত, যা আল্লাহর সম্ভাষণের গুঢ় রহস্য এবং তিনি অন্তরালের মূলতত্ত্ব ও নিগূঢ় সূক্ষ্মরস বিকাশ করেছেন। যাতে রাজাধিরাজ আল্লাহর জাহেরী ও বাতেনী আধিপত্য ও তার ত্যাজদীপ্ত মহিমান্বিত গুণাবলী ও স্নীগ্ধ সৌন্দর্যময় শোভা মানুষের কাছে আলোকময়ও উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। যার ফলে তারা (মানুষ) এ বিষয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করতে পারে।

★ "ب" "فَكَشَفَ" এর মধ্যে فاء হরফটি فاءِ تفصيليه। মুহকাম আয়াতের অর্থ সুস্পষ্ট ও অনাবৃত, যাতে অস্পষ্টতার কোন সম্ভাবনা নেই, তা সত্ত্বেও এখানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা মুহকাম আয়াতের যবনিকা উম্মোচিত করেছেন, অথচ মুহকাম আয়াতের উপর কোন প্রকার যবনিকা নেই। এ প্রশ্নের উত্তর হল, মুহকাম আয়াতের থেকে যে অস্পষ্টতার সম্ভাবনাকে দূরীভূত করা হয়েছে তাহলো এমন অস্পষ্টতার সম্ভাবনা যা যুক্তিনির্ভর অর্থাৎ যুক্তিনির্ভর বা যুক্তিযুক্ত কোন অস্পষ্টতার সম্ভাবনা মুহকাম আয়াতে নেই। অথবা মুহকাম আয়াত থেকে যবনিকা উম্মোচিত করা দ্বারা উদ্দেশ্য হল اِنْزالُهَا مَكشوفَةً مُبَيَّنَةً অর্থাৎ মুহকাম আয়াতকে সুস্পষ্ট ও উম্মোচিত করে অবতীর্ণ করা হয়েছে।

اَلْمُرَادُ بِالْاِحْتِمَالِ الْمَنْفِيِّ عَنِ الْمُحْكَمَاتِ هُوَ الْاِحْتِمَالُ النَّاشِى عَنِ الدَّلِيْلِ اَوِ الْمُرَادُ بِالْكَشْفِ الْمُتَعَلِّقُ بِالْمُحْكَمَات اِنْزَالُهَا مَكْشُوفَةً مُبَيَّنَةً (شيخ زاده)

"الفرقُ بَيْنَ الْمُحْكَمَاتِ والْمُتَشَابِه"ج (মুহকাম ও মুতাশাবিহ-এর মধ্যকার পার্থক্য)।

الفرقُ اللُّغوِىُّ (**শাব্দিক পার্থক্য**) ঃ

مُحْكَمَات শব্দটি بَابُ الْاِفْعَال থেকে اسم مفعول جمع مؤنث এর সীগাহ। اِحْكَامٌ ক্রিয়ামূল থেকে নিষ্পন্ন। এর শাব্দিক অর্থ– সুদৃঢ় ও মজবুত করা।

مُتَشَابِه শব্দটি بَابُ التَّفَاعُل থেকে اسم فاعِل جمع مونث এর সীগাহ।

اَلتَّشَابُه ক্রিয়ামূল থেকে উৎকলিত। এর অর্থ হলো, সন্দেহযুক্ত, অস্পষ্ট ইত্যাদি।

الفرقُ الْاِصْطِلاحى (**পারিভাষিক পার্থক্য**) ঃ

পরিভাষায় মুহকাম আয়াত বলা হয় যা সন্দেহ ও সম্ভাবনা যুক্ত। অর্থাৎ যেসব আয়াতের অর্থ অত্যন্ত প্রাঞ্জল, যার অর্থ অনুধাবন করতে কোন অসুবিধা হয় না তাকে মুহকাম আয়াত বলে।

পক্ষান্তরে যেসব আয়াত অনেক অর্থের সম্ভাবনা রাখে এবং যার অর্থ উদ্‌ঘাটন করা যায় না বরং তার মর্মার্থ বুঝতে হলে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল হতে হয় তাকে মুতাশাবিহ আয়াত বলে।

وجهُ تَسْمِيَةِ الْمُحْكَمِ بِاُمِّ الْكِتَابِ (**মুহকাম আয়াতকে** اُمُّ الْكِتَابِ **নামকরণের কারণ**) ঃ পবিত্র কুরআনে মুহকাম আয়াতগুলোকে উম্মুল কিতাব তথা কুরআনের মূল বলা হয়েছে। এর কারণ হলো, এগুলোর উপর শরীয়ত নির্ভরশীল। মুতাশাবিহ আয়াত গুলোকে এগুলোর উপর প্রয়োগ করতে হয় এবং এগুলো نسخ তথা রহিতকরণ ও তাবদীলের সম্ভাবনা রাখে না। তাই এ সকল আয়াতকে মুহকাম নামকরণ করা হয়েছে।

وَجهُ تَسْمِيَةِ الْمُتَشَابِه بِرُمُوْزِ الْخِطَابِ (**মুতাশাবিহ আয়াতকে** رُموزالخطاب **বলার কারণ**) ঃ আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) তার কিতাবের ভূমিকায় মুতাশাবিহ আয়াতকে رُموز الْخِطَاب তথা সম্ভাষণের গুঢ় রহস্য আখ্যায়িত করেছেন। কারণ মুতাশাবিহ আয়াতের রহস্য অনুদ্‌ঘাটিত। এটা মূলতঃ مُبَالَغَة ও وُصِف স্বরূপ বলা হয়েছে। যেমনিভাবে رَجُلٌ عَدْلٌ হিসেবে বলা হয়। الْمُتَشَابِهَاتِ بِاَنَّهُنَّ رُمُوْزُ الْخِطَابِ عَلٰى طريقِ رَجُلٌ عَدْلٌ (শাইখযাদা)

د : بَيانُ مُنَاسَبَةِ إضافَةِ الْغَوَامِضِ الى الْحَقائِقِ واللَّطَائِفِ الى الدَّقَائِقِ

موصوف কে صفت এর মধ্যে مُنَاسَبَت হল, غَوَامِضُ الْحَقَائِق দিকে اضافت করা হয়েছে। আর لَطَائِفِ الدَّقَائِق এর মধ্যে موصوف কে صفت এর দিকে اضافت করা হয়েছে। মূল ইবারত হল, اَلْحَقَائِقُ الْغَامِضَة وَاللَّطَائِفُ الدَّقِيْقَة

غَوَامِض শব্দটি غَامِضَة এর বহুবচন। অর্থ অস্পষ্ট বিষয়। حَقَائِق শব্দটি حَقِيقَة এর বহুবচন। যে মৌলিক উপাদান দ্বারা কোন বস্তু আপন রূপ লাভ করে তাকে حقيقت বলে। لَطَائِف শব্দটি لَطِيفَةٌ শব্দের বহুবচন। এমন তত্ত্বপূর্ণ বক্তব্য যা অনুধাবন করতে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও সূক্ষ্ম গবেষণার প্রয়োজন হয় তাকে لَطِيفَة বলে। دَقَائِق শব্দটি دَقِيقَةٌ এর বহুবচন। دَقِيقَة এমন সূক্ষ্ম বিষয়কে বলে যার মর্ম উদ্‌ঘাটন সবার পক্ষে সম্ভব নয়। حَقِيقَت থেকে دَقِيقَة এর সূক্ষ্মতা অতি অধিক। কেননা حقائق দ্বারা উদ্দেশ্য দৃশ্য জগতের চাক্ষুস বস্তু নিচয়। আর لَطَائِف দ্বারা অদৃশ্য জগতের বস্তু সকল। حَقَائِق এর সম্পর্ক مَوْجُوْدَاتِ أَعْيَانِ خَارِجِيَّه এর সাথে পক্ষান্তরে لَطَائِف এর সম্পর্ক হল حَقَائِق ذِهْنِيَّة এর সাথে। অতএব غَوَامِض (যা সাধারণ অস্পষ্টতা বুঝায়) কে حَقَائِق এর দিকে اضافت এবং لَطَائِف (যা অদৃশ্য জগতের সূক্ষ্ম বস্তু বুঝায়)কে دَقَائِق এর দিকে اضافت করা যথার্থ হয়েছে।

س (٨) : فَمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ فَهُوَ فِى الدَّارَيْنِ حَمِيْدٌ وَّ سَعِيْدٌ وَمَنْ لَّمْ يَرْفَعْ اِلَيْهِ رَأْسَهُ وَاَطْفَأَ نِبْرَاسَهُ يَعِشْ ذَمِيْمًا وَسَيَصْلٰى سَعِيْرًا

الف : ترجم الْعِبَارَة فَصِيْحَةً

ب : اَلْفَاءُ فِي "فَمَنْ" لِاَيِّ مَعْنًى هٰهُنَا و مَا الْمُرَادُ بِاِطْفَاءِ النِّبْرَاسِ؟

ج : اَوْضِحْ قولَه فَهُوَ فِى الدَّارَيْنِ حَمِيْدٌ وَّ سَعِيْدٌ

د : كَمْ اِسْمًا لِسُوْرَةِ الْفَاتِحَةِ اُكْتُبْ مَعَ بَيانِ وَجْهِ تَسْمِيَتِهَا؟

উত্তর ঃ "الف" ইবারতের তরজমা :

সুতরাং যার দীপ্তমান অন্তর রয়েছে অথবা অন্তকরণ উপস্থিতির সাথে যে স্বীয় কর্ণকে নিবিষ্ট করেছে সে ইহলোকে প্রশংসিত ও পরলোকে সৌভাগ্যবান হবে। আর যে এদিকে মাথা তুলে তাকায়নি (অর্থাৎ কুরআন থেকে বিমুখ হয়েছে) এবং ফিতরী নূর (আল্লাহ্ প্রদত্ত ভাল-মন্দ, নিষ্ট-অনিষ্ট, কল্যাণ-অকল্যাণ উপলব্ধির

জ্ঞানের আলো) নির্বাপিত করেছে। সে ইহকালে লাঞ্ছিত-অপমানিত হয়ে কালাতিপাত করবে। আর পরকালে অবশ্যই জাহান্নামে নিক্ষেপিত হবে।

"ب" : فَمَنْ كَانَ এর মধ্যে الفاء টি فَصِيحَةٌ فَاء অর্থাৎ ভাষাগত সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য আনা হয়েছে।

اِطْفَاء এর শাব্দিক অর্থ নিভিয়ে দেয়া, নির্বাপন করা। আর نِبْرَاس অর্থ বাতি। এখানে نِبْرَاس দ্বারা হেদায়েত কবুল করার স্বভাবগত যোগ্যতা উদ্দেশ্য। আর তা নির্বাপন করার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, কুফরী, পাপাচার ও সত্য বিমূখতার মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করার যোগ্যতা খতম করে দেয়া (আত্‌তাশরীহুল হাভী)

"ج" تَوْضِيحُ قوله فَهُوَ فِى الدَّارَيْنِ حَمِيْدٌ وَّسَعِيْدٌ (সে ইহ পরকালে প্রশংসিত ও সৌভাগ্যবান হবে) ব্যাখ্যা।

এখানে حميد অর্থ محمود যেমন قتيل অর্থ مقتول – অর্থ প্রসংশিত। উক্ত ইবারতের ব্যাখ্যা হল সত্য ধর্ম ইসলামের প্রতি দাওয়াতের কাজ কুরআন অবতরণ করার মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে এবং মানব জাতির প্রতি আল্লাহর দলীল-প্রমাণ অকাট্য হয়েছে। অতএব যার আলোকময় অন্তকরণ রয়েছে সে যদি কুরআনের মর্ম ও তাৎপর্যের উপর গবেষণা করে এবং এর নিগূঢ় রহস্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এবং হৃদয়মন জাড় করে যদি এর প্রতি মনোযোগী হয়, তাহলে সে পার্থিব জীবনে প্রশংসিত হবে এবং পরিত্রিক জীবনে জান্নাত লাভের মাধ্যমে সৌভাগ্যবান হবে।

"د" اَسْمَاءُ سُوْرَةِ الْفَاتِحَةِ **(সূরা ফাতিহার নাম সমূহ)**

যে বস্তুর মান-মর্যাদা ও দাম বেশী তার নামও বেশী। সূরা ফাতিহা যেহেতু সর্বাধিক দামী তাই তার নামও অধিক। আল্লামা কাযী নাসিরুদ্দীন বায়যাবী (রহঃ) সূরা ফাতিহার ১৪টি নাম উল্লেখ করেছেন। নিম্নে সূরা ফাতিহার নামগুলো নামকরণের কারণসহ বর্ণনা করা হল।

১. সূরাতু ফাতিহাতিল কিতাব।

নামকরণের কারণ ঃ ইসলামী পরিভাষাগুলোর পেছনে অবশ্যই কোন রহস্য ও স্বার্থকতা থাকে। তেমনিভাবে সুরা ফাতিহা নামকরণের ও একাধিক স্বার্থকতা রয়েছে।

১. مُصْحَفِ عُثْمَانِىْ তে বর্ণনার ধারাবাহিকতায় এ সূরাটিকে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে। ২. এটি সর্বপ্রথম অবতীর্ণ সূরা ৩. লাওহে মাহ্‌ফুযে এ সূরাটিকে সর্ব প্রথম লেখা হয়েছে। আল্লামা বায়যাবী (রহ) বলেন–

সূরা ফাতিহাকে ফাতিহাতুল কিতাব নামকরণের কারণ হল- এ সূরাটি مُصْحَف এর সূচনালগ্নে ও আরম্ভস্থলে হওয়ার কারণে তাকে ফাতিহাতুল কিতাব বলা হয়েছে।

২. أُمُّ الْقران (**উম্মুম কুরআন**) ঃ এ সূরাটি সূচনাস্থলে হওয়ার কারণে এটা ফাউন্ডেশন বা ভিত্তিমূলের মত হয়েছে বিধায় একে উম্মুল কুরআন নাম রাখা হয়েছে। এ সূরাকে উম্মুল কুরআন বলার আরেকটি বিশেষ কারণ হল, কুরআন অবতরণের মৌলিক উদ্দেশ্য হল, ১. مَبْدأ (সালাত, যাকাত, সওম ইত্যাদি জাগতিক বিষয়, ২. مَعَاد (কবর, হাশর, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি পরলৌকিক বিষয়) ৩. اَلْحكام عمليه (আমলী বিধি বিধান) ৪. احكام اعتقاديه (বিশ্বাসগত বিধি-বিধান) বর্ণনা করা। আর সূরা ফাতিহার মধ্যে এ বিষয়গুলোর সার-সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং যেমনিভাবে জননী তার সন্তানদেরকে ধারণ করে রাখে তেমনিভাবে এটি পুরা কুরআনের সর্ব বিষয়কে নিজের মধ্যে শরণ করার কারণে কুরআন জননীতুল্য হয়েছে বলে তাকে ام القران বলা হয়েছে।

২. অথবা উম্মুল কুরআন নামকরণের আরেকটি কারণ হল, এ সূরাটি কুরআনের সারমর্ম ও সারবত্তা সংক্ষিপ্ত পরিসরে স্বীয় অভ্যন্তরে সংযোজন করেছে। অর্থাৎ আকীদাগত জ্ঞান ও জীবন যাপন পদ্ধতির বিধান যার মূল লক্ষ্য হল, সঠিক ও নির্ভুল পথে অগ্রসর হওয়া ও ভাগ্যবানদের উচ্চ মর্তবা ও দুর্ভাগ্যদের আবাসস্থল সম্পর্কে অবহিত করা, অতপর কথায় সমগ্র কুরআনে প্রধানত ঈমান ও নেক আমলের আলোচনাই কেন্দ্রীভূত। আর এ দু'টির মূলনীতি এ সূরায় সংক্ষিপ্তাকারে আলোচিত হয়েছে।

৩. اَساسُ الْقران (আসাসুল কুরআন) اَسَاس অর্থ ভিত্তিক। এটি কুরআনের ফাউন্ডেশন বা ভিত্তি মূল হওয়ার কারণে একে اَسَاس (উৎসমূল) ও বলা হয়। অর্থাৎ হল ১. এ সূরাটি কুরআনে আলোচিত সর্ব প্রকার বিষয়বস্তু এবং সর্বশ্রেণীর কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়কে সংক্ষিপ্তাকারে স্বীয় অভ্যন্তরে শামিল করেছে। যেমন আল্লাহ পাকের সানা-স্তুতি, তার বিধি নিষেধ পালনের আহবান, তার অঙ্গীকার (শুভ সংবাদ) ও সতর্কবাণীর আলোচনা।

৪. سُورَةُ الْكَنْزِ (সূরাতুল কান্‌য)। ৫ سُورَةُ الْوَافِيَة (সূরাতুল ওয়াফিয়া) ৬. سُورَةُ الْكَافِيَة (সূরাতুল কাফিয়া)। পূর্ণ কুরআনের বিষয় বস্তুর সার সংক্ষেপ সূরা ফাতিহায় থাকার কারণে এ সব নামে নামকরণ করা হয়েছে।

৭. سُورَةُ الْحَمْد (সূরাতুল হাম্‌দ)। ৮. سُورَةُ الشُّكْرِ (সূরাতুশ শুক্‌র) এ সূরায় আল্লাহর সানা-স্তুতি ও কৃতজ্ঞতা বর্ণনা হয়েছে বিধায় একে উক্ত নামে নামকরণ করা হয়েছে।

৯. سُورَةُ الدُّعَاء (সূরাতুদ দু'আ) এ সূরায় اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ থেকে দু'আ রয়েছে বিধায় এ নাম রাখা হয়েছে।

১০. سورة تَعْلِيْمِ الْمَسْئَلة (সূরাতু তা'লীমিল মাসআলা) নামকরণের কারণ হল এ সূরায়, দুআ ও আবেদনের পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

১১. سورة الصَّلَاة (সূরাতুস সালাত) এ সূরা সালাতে পাঠ করা ওয়াজিব অথবা জরুরী হওয়ার কারণে।

১২, سورة الشَّافِيَة (সূরাতুশ শাফিয়া) ১৩. سورة الشِّفَاء (সূরাতুশ শিফা) কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, هِيَ شِفَاءٌ لِكُلِّ دَاءٍ সূরা ফাতিহা সকল রোগের মহৌষধ।

১৪. سورة سَبْعِ الْمَثَانِي (সূরাতু সাবইল মাসানী) কারণ উক্ত সূরার আয়াত সংখ্যা সাতটি এবং নামাযে এটিকে বার বার পাঠ করা হয়। سَبْع অর্থ সাত। আর مثاني অর্থ বারবারকৃত।

س (٩) : وَبَعْدُ فَإِنَّ أَعْظَمَ الْعُلومِ مِقْداراً و أَرْفَعَهَا شَرَفاً ومَناراً علمُ التّفسيرِ الّذِىْ هُوَ رَئِيسُ الْعُلومِ الدِّيْنِيَّةِ ورأسُها و مَبْنٰى قَواعِدِ الشّرعِ و اساسِها لَايَلِيْقُ لِتَعَاطِيْه والتَصَدّي لِلتكلُّمِ فِيْه اِلّا مَنْ بَرَعَ فِي الْعُلومِ الدِّينِيّة كلِّها اُصولِها وفُروعِها وَفَاقَ فِى الصَّنَاعاتِ الْعَرَبِيَّةِ والْفُنون الْاَدَبِيّةِ بِاَنْواعِها

الف: تَرْجِمِ الْعِبارَةَ بَعْدَ تَزْيِيْنِها بِالْحَرَكاتِ وَالسَّكنات

ب: الفاء في قوله " فَإِنَّ أَعْظَمَ " لِأَيِّ مَعْنَى ؟

ج: ما مرادُ قولِه " مَبْنٰى قواعِدِ الشّرعِ واساسِها ؟

د: كم مَرَّةً نَزَلَتْ سورَةُ الْفاتِحَة و مَتٰى نَزَلَتْ وايْنَ نزلتْ وما التّحقيقُ فِى كَوْنِ الْبَسْمَلَةِ مِنَ الْفَاتِحَةِ؟:

উত্তর ঃ "الف" ইবারতের তরজমা :

যাহোক (হাম্‌দ ও সালাতের পর) নিশ্চয় আভিজাত্যের বিবেচনায় সর্বাধিক মহান এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার দিক দিয়ে সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন শাস্ত্র, হল তাফসীর শাস্ত্র। যা দ্বীনী ইলমের প্রধান উৎস ও ভিত্তিমূল এবং শরয়ী নীতিমালার উৎসমূল। এটা অর্জন করার এবং এতদ সম্পর্কে আলোচনা করার উপযুক্ত শুধু সেই ব্যক্তি যে দ্বীনী ইলমের মূলনীতি ও তার শাখা-প্রশাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছে, এবং আরবী ভাষা ও শিল্প-সাহিত্যের সকল শাখায় কুশলতা, নৈপণ্যতা তথা পাণ্ডিত্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে।

ب ঃ فَإِنَّ أَعْظَمُ মধ্যে فاء হরফ সম্পর্কে ৩টি অভিমত রয়েছে।

১. কারো মতে أَمَّا - تَوَهُّمُ -এর ভিত্তিতে এসেছে। অর্থাৎ প্রায় স্থানে যেহেতু بعد এর সাথে اما এর উল্লেখ থাকে তাই এখানে اما এর উল্লেখ না থাকলেও اما আছে বলে ধরে নেয়া হয়েছে।

২. কারো মতে, এখানে اما উহ্য আছে, সে ভিত্তিতে এখানে فاء আনা হয়েছে। কিন্তু এটা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা যেখানে فاء এরপর استفهام، نهى، ام থাকে সেখানে اما উহ্য থাকে। অথচ এখানে তা হয়নি। অতএব সঠিক অভিমত হলো এই যে, এখানে ظرف কে شرط এর স্থলাভিষিক্ত গণ্য করে فاء ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ بعد শব্দটি ظرف হওয়া সত্ত্বেও তাকে شرط এর স্থলাভিষিক্ত গণ্য করে ان اعظم কে তার جزاء ধরে নেয়া হয়েছে। অতপর বিধি অনুযায়ী جزاء এর শুরুতে فاء আনা হয়েছে। অতএব فان اعظم এর فاء টি فائے جزائية।

ج : مُبْنِى قَوَاعِدِ الشَّرْعِ وَاسَاسِهَا **দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ**

اَلْمُرَادُ بِمُبْنِى قَوَاعِدِ الشرعِ مُبْنِى مَسَائِلِ الْكُلِّيَّةِ الَّتِى تَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا الْاَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ -

অর্থাৎ قَوَاعِدِ الشَّرْعِ (শরয়ী বিধানের ভিত্তিমূল) দ্বারা উদ্দেশ্য হল مَسَائِل كُلِّيَّة এর ভিত্তিমূল। যে مسائل كلية তথা মৌলিক বিধি-বিধান থেকে শরীয়তের আহকামের শাখা-প্রশাখা উৎকলিত হয়। আর اساس দ্বারা উদ্দেশ্য হল সেসব দলীল যার উপর উল্লেখিত মৌলিক বিধি-বিধানের ভিত্তি।

"د" **সূরায়ে ফাতিহার অবতরণ ঃ** জমহুর মুফাস্‌সিরগণের মতে, এ সূরাটি মক্কী-সূরা। কেননা وَلَقَدْ اٰتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ এ আয়াতখানি সর্ব সম্মতিক্রমে মক্কী আয়াত। এতে سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ দ্বারা "সূরা ফাতিহা" বুঝানো হয়েছে। অতএব এ আয়াতে মক্কাতেই سَبْعٌ مِنَ الْمَثَانِىْ বা সূরা ফাতিহা প্রদত্ত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম মুজাহিদের মতে, সূরা ফাতিহা মাদানী সূরা।

কারো কারো মতে, সূরা ফাতিহা মক্কায় সালাত ফরয হওয়ার সময় একবার নাযিল হয় এবং মদীনায় কেবলা পরিবর্তের সময় আরেকবার নাযিল হয়। এ মতানুসারে সূরা ফাতিহা দু'বার অবতীর্ণ হয়েছে।

اَلتَّحْقِيْقُ فِىْ كَوْنِ الْبَسْمَلَةِ مِنَ الْفَاتِحَةِ

بسم الله الرحمن الرحيم সূরাতুল ফাতিহা কুরআনের অংশ কিনা এ বিষয়ে মুফাস্‌সিরগণের মতানৈক্য রয়েছে।তবে سورة النَّمْل এ যে بسم الله

الرحمن الرحيم আছে তা সকল আলিমের সর্ব সম্মতিক্রমে কুরআনের অংশ। আয়াতটি হল.

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرحمن الرحيم

তবে সূরা ফাতিহাসহ অন্যান্য সূরার প্রারম্ভে যে بسم الله الرحمن الرحيم পাঠ করা হয় তা কুরআনের সকল সূরার অংশ কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ঠ মতানৈক্য বিদ্যমান।

১. ইমাম শাফি'ঈ, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক, মক্কাও কুফার কারী ও তথাকার ফকীহগণের মতে, 'বিসমিল্লাহ' সূরা ফাতিহাসহ সকল সূরার অংশ।

বিসমিল্লাহ সূরায়ে ফাতিহার অংশ হওয়ার দলীল ঃ ক. কুরআনের বাণী وَلَقَدْ اٰتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِى وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ এ আয়াতে مثانى বলতে সূরা ফাতিহা উদ্দেশ্য। আর ফাতিহাকে সাত আয়াত বিশিষ্ট বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ بسم اللّٰه الرَّحْمٰن الرحيم কে বাদ দিলে সূরা ফাতিহা সাত আয়াত বিশিষ্ট হয় না।

খ. হাদীস عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ سَبْعُ اٰيَاتٍ اُوْلٰهُنَّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

গ. قَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم الْفَاتِحَةَ وَعَدَّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرحيم الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ العالمينَ اٰيَةً

উভয় হাদীসের ভাষ্যমতে بسم الله الرحمن الرحيم সূরা ফাতিহার অংশ।

ঘ. আকলী দলীল ঃ সালফে সালেহীন পবিত্র কুরআনকে সকল প্রকার অবাঞ্চিত ও অপ্রয়োজনীয় তথা কুরআন বহির্ভূত সকল বিষয় থেকে মুক্ত করতে খুব কঠোর ও সতর্ক ছিলেন। অতএব بسم الله الخ কুরআনের অংশ না হলে তারা তা কুরআনে রাখতেন না। যেমন امين কে রাখা হয় নি।

২. ইমাম মালিক, ইমাম আওযা'ঈ, পবিত্র মদীনা ও বসরা নগরীর কারী ও ফকীহগণের মতে بسم الله الرحمن الرحيم কোন সূরারই অংশ নয়।

বিসমিল্লাহ কোন সূরার অংশ না হওয়ার দলীল ঃ

* عن انسٍ قال صَلَّيْتُ خلفَ رسولِ اللّٰهِ عليه وسلم وَاَبِىْ بكرٍ و عمرَ و عُثمانَ فَكانُوا يُفْتَتِحونَ الصَّلاةَ بِالْحمدُ لِلّٰه رب العالمينَ

* عن عائشةَ قالتْ كانَ رسولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَفْتَتِحُ الصَّلاةَ بِالتَّكْبِيْرِوالقِرَاةَ بِاَلْحمدُ للّه رب العالمينَ ـ

৩. ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) থেকে এ ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে কিছু বর্ণিত নেই। তবে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে শায়বানী (রহঃ) কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, ما بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ كلامُ اللّه অর্থাৎ কুরআনের উভয় পার্শ্বের মলাটের অভ্যন্তরে যা কিছু রয়েছে তা সবই আল্লাহর কালাম। তার এ বক্তব্যের পর তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল فَلَمْ يُسِرُّ بِهَا فِى الصَّلاةِ তাহলে এটাকে সালাতের মধ্যে আস্তে পাঠ করা হয় কেন? উত্তরে তিনি বলেন, لِكَوْنِ نُزولِها لِلْفَصْلِ وَالتَّبَرُّكِ ولايلزَمُ مِنْهُ اَنْ يَثْبُتَ لَهَا سائِرُ اَحْكامِ الْقُرْانِ এর দ্বারা বুঝা যায়, ইমাম আবূ হানীফার মতে এটা সূরার অংশ নয়। কেননা সাহেবাইন তথা আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মদ (রঃ) যে কথা নিজেদের মত বলে ব্যক্ত করেন না তা মূলত: আবূ হানীফা (রহঃ) এরই মত।

অতএব مُتَاخِّرِيْنِ اَحْناف অর্থাৎ পরবর্তী যুগের হানাফীগণ এ সম্পর্কে তাদের মত এভাবে ব্যক্ত করেন যে, بسم الله সূরা ফাতিহা ও অন্যান্য সূরার আয়াত নয়, তবে সামগ্রিকভাবে এটি কুরআনের একটি পূর্ণাঙ্গ আয়াত, যা দু'সূরার মাঝে ব্যবধান সৃষ্টির জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।

مُتاخّرين اَحْناف এর দলীল ঃ

عن ابى هريرةَ قال قال اللّٰه تعالى قَسَّمْتُ الصَّلاةَ (الفاتحة) بَيْنِى وَبَيْنَ عَبْدِىْ نِصْفَيْنِ ولِعَبْدِىْ مَا سَأل فَاِذَا قالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ربّ العا لمين ....

এতে বুঝা যায় بسم الله সূরা ফাতিহার অংশ নয়। অথচ مصحف عثمانى তে সকল সূরার শুরুতে بسم الله লিপিবদ্ধ রয়েছে যা প্রমাণ করে যে, তা কুরআনের পূর্ণ আয়াত। আর بسم الله দু'সূরার মাঝে ব্যবধান সৃষ্টির জন্য স্বতন্ত্র আয়াত হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রমাণ হল, হাদীস :

١. قال انسٌ اَنَّ رسولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم كانَ لَايَعْرِفُ فَصْلَ السُّورةِ حتّٰى نزلَ بسم الله الرحمن الرحيم

٢. وعن جماعةٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ قالُوا كُنَّا لاَ نَعْرِفُ اِنْقِضاءَ السُّوْرَةِ حتّٰى نَزَلَ بِسم اللّٰه الرّحمٰن الرّحيم

الجوابُ عن أدلةِ المُخالفين (বিরুদ্ধবাদীদের প্রত্যুত্তর) ঃ

১. بسم الله কে বাদ দিলেও সাত আয়াত হয়। তখন صراط الذين أنعمت عليهم ষষ্ঠ আয়াত, আর غير المغضوب عليهم ولا الضالين কে সপ্তম আয়াত গণ্য করতে হবে।

২. উম্মে সালামা (রাঃ) এর বর্ণনার উত্তর হলো, বস্তুত রাসূলুল্লাহ (সা) بسم الله কে تبركًا তথা বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে পাঠ করেছেন।

৩. আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত দুই হাদীস পরস্পর বিরোধী। অতএব তা দলীল হওয়ার উপযুক্ত নয়।

অতএব القول الراجح তথা অগ্রগণ্য মত হল, আবূ হানীফা (রহঃ) এর অভিমত। কেননা তা মধ্যবর্তী ও ভারসাম্যপূর্ণ অভিমত।

س (١٠) : بسم الله الرحمن الرحيم

الف : اذكر الأقوال في متعلق "ب" مع ترجيح الراجح

ب : لم أختير الرحمن والرحيم من اسماء الله تعالي وما حسن الترتيب بين الأسماء الثلاثة ؟

ج : ما الفرق بين الرحمن والرحيم كمًّا و كيفًا؟اكتب البحث اللغوى للكلمتين ـ

د : اكتب اشتقاق كلمة "الاسم" بيانًا شافيًا ـ

ه : اوضح قوله "وتقديم المجرور ههنا أوقع كما في قوله تعالى بسم الله مجريها" وقوله اياك نعبد -

و : اكتب أقوال العلماء في كون لفظ "الله" مشتقًّا و علمًا بالأدلة الواضحة

ز : اذكر اشتقاق لفظ الله مع بيان المناسبة بين المشتق والمشتق منه على ترتيب القاضي البيضاوى

ح : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من القران أم لا؟ أجب بالتيقظ التام ـ

উত্তর ঃ "الف" حروف الجار এর متعلق কে বিলোপ করা আরবী ভাষার একটি বহুল প্রচলিত বিষয়। بسم الله এর ب হরফটির متعلق مقدر এর ব্যাপারে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে– ১. فعل خاص উহ্য মানা হবে। ২. فعل عام উহ্য মানা হবে। ৩. اسم উহ্য মানা হবে।

★ কুফাবাসী নাহবীদের মতে, এখনে أَبْدَأُ শব্দটি فعل عام উহ্য মানাই শ্রেয়। কেননা ১. ظرف مُسْتَقِرٌ অধিকাংশ সময় افعالِ عَامَّه হয়ে থাকে। ২. এতে রাসূলের বানী كُلُّ امرٍ ذِىْ بَالٍ لَمْ يُبْدَأُ এর সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়ে যাবে।

★ কারো কারো মতে اِبتدائى ইসমকে উহ্য মানাই শ্রেয়। কেননা তাতে উক্ত হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যশীল হওয়ার সাথে সাথে دوام এর অর্থ পাওয়া যায়।

★ ইমাম কাযী বায়যাবী (রাঃ) মতে بسم الله এর মধ্যে اقرأ ـ فعل خاص উহ্য মানাই শ্রেয়। তিনি এ ব্যাপারে একটি قاعده كليه ব্যক্ত করেছেন। আর তা হল, কোন ব্যক্তি কোন কাজ بسم الله বলে আরম্ভ করবে, তখন সে কাজের উপযোগী একটি فعل উহ্য থেকে ب এর সাথে متعلق হবে। তিনি বলেন, وَلِذَالِكَ يُضْمِرُ كُلُّ فَاعِلٍ مَا يَجْعَلُ التَّسْمِيَةَ مَبْدَأً لَهُ এমনিভাবে প্রত্যেক কর্তা بسم اللّٰه বলে যে কাজ শুরু করবে, সে কাজের নির্দেশক একটি فعل কে উহ্য মানবে। যেমন যদি খায় তাহলে بِسْمِ اللّٰهِ اٰكُلُ – যদি গোসল করে তাহলে بسم اللّٰهِ اَغْتَسِلُ ইত্যাদি। আর এটাই অর্থাৎ فعل خاص উহ্য মানাই উত্তম। কেননা বাস্তবে এমন কোন فعل নেই যা أَبْدَأُ কে বুঝায়। আবার ابتداى উহ্য মানলে উক্ত অসুবিধার সাথে সাথে অধিক উহ্য মানতে হয়। এক ابتدائى যা তারকীবে মুবতাদা হবে। আর حاصل বা حصل ফে'ল উহ্য মানতে হবে যার সাথে بسم الله ـ متعلق হয়ে ابتدائى মুবতাদার খবর হবে।

"ب" : وجهُ اِختيارِ الرحمٰنِ الرَّحِيْمِ (رحمن ও رحيم নামদ্বয় নির্ধারণের কারণ) ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم এর মধ্যে আল্লাহর নিরানব্বই নামের মধ্য থেকে শুধু মাত্র الرحيم ও الرحمن নির্বাচন করার কারণ হল, যাতে সাধক ব্যক্তি জানতে পারে যে, এ নাম সমূহের সত্ত্বার কাছে এজন্য সাহায্য প্রার্থনা করা হচ্ছে যে, তিনি প্রকৃত উপাস্য এবং ক্ষুদ্র-বৃহৎ পার্থিব-পারিত্রিক সকল প্রকার নেয়ামতের তিনিই দাতা। এটা জানার পর সে সবিনয়ে তার স্মরণে অন্তরকে লিপ্ত করবে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দিকে মনোযোগী হবে না। আর এর কারণ হল, بسم الله এর باء এর অর্থ استعانت বা সাহায্য কামনা করা। আর এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে الله، الرحمن ও الرحيم তিনটি নামকে। الله শব্দের মর্মার্থ যিনি সকল পূর্ণাঙ্গ গুণাবলীর অধিকারী অবিনশ্বর সত্ত্বা আর الرحمن ও الرحيم এর মর্মার্থ ক্ষুদ্র-বৃহৎ পার্থিব-পারিত্রিক নেয়ামত প্রদানকারী। আর স্বতসিদ্ধ নিয়ম হলো

যখন কোন حكم কে কোন صفت এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। তখন বুঝা যায় যে, ঐ صفت এর مَاْخَذِ اِشْتِقَاق বা উৎসটা ঐ حكم এর জন্য عِلّت বা করণ সুতরাং যখন استعانت কে الله ـ الرحمن ও الرحيم এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তখন বুঝা গেল যে, আল্লাহ্র কাছে সাহায্য কামনা করার কারণ হলো তাঁর বাস্তব উপাস্য হওয়া এবং ক্ষুদ্র-বৃহৎ পার্থিব-পারলৌকিক সকল প্রকার নিয়ামতের মালিক হওয়া। অতএব সাধক যখন এটা উপলব্ধি করতে পারবে তখন সে কায়মনবাক্যে আল্লাহ্র ধ্যান ও স্মরণে মশগুল হবে।

حُسْنُ التَّرْتِيْبِ بَيْنَ الْاَسْمَاءِ الثَّلَاثَةِ وَوَجْهُ تَقْدِيْمِ الرَّحْمٰنِ عَلٰى الرَّحِيْمِ مَعَ اَنَّ الْقِيَاسَ اَلتَّرَقِّىْ مِنَ الْاَدْنٰى اِلَى الْاَعْلٰى

(আল্লাহর নাম ত্রয়ের মধ্যে ক্রম বিন্নাস) ঃ اَللّٰه ـ اَلرَّحْمٰن ও الرَّحِيْم এর মধ্য لَفظُ اَللّٰه আল্লাহ্র اسمِ عَلَمْ আর عَلَمْ এর উপরই মূলতঃ صفت আরোপিত হয়। তাই لفظ الله কে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর الرحمٰن ও الرحيم এর মধ্যে الرحمٰن শব্দটিকে الرحيم শব্দের পূর্বে مقدم করা হয়েছে। অথচ الرحمٰن শব্দটি الرحيم শব্দের তুলনায় অধিক অর্থবোধক। এর কারণ সম্পর্কে আল্লামা বায়যারী (রহঃ) বলেন,

১. رحمٰن শব্দটি বড় বড় সকল নেয়ামতকে অন্তর্ভুক্ত করে, আর رحيم ছোট ও সূক্ষ্ম নেয়ামতগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। তাই رحمٰن বলার পর رحيم বলা হয়েছে; যাতে ছোট বড় সকল নেয়ামত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

২. অথবা رحمٰن শব্দটি আল্লাহ্র জন্য خاص – আর رحيم শব্দটি عام তথা আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। অতএব مَاهُوَ مُخْتَصٌّ بِالله اَحَبُّ اَنْ يَتَقَدَّمَ যা আল্লাহ্র সাথে خاص তা مقدم হওয়াই শ্রেয়। তাই رحمٰن শব্দকে مقدم করা হয়েছে।

৩. অথবা رحمٰن শব্দটি عام যার অর্থ رحمٰنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ এবং رحمٰن للمؤمنين والكافرين আর رحيم শুধুমাত্র مؤمنين এর জন্য خاص তাই বালাগাতের নিয়ম অনুযায়ী عام কে আগে আনা হয়েছে, এর পরে خاص উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. অথবা رحمٰن হল رحمٰن الدنيا والاٰخرة আর رحيم হল رحيم الاخرة আর অস্তিত্ত লাভের দিক থেকে دنيا হল اخرة এর পূর্বে। তাই رحمٰن কে আগে আনা হয়েছে।

اَلْفَرْقُ بَيْنَ الرَّحْمٰنِ والرَّحِيْمِ كَمًّا وكَيْفًا "ج"

الرحمٰن ও الرَّحِيم শব্দদ্বয় اَلرَّحْمَةُ হতে উৎকলিত হলেও উভয়ের মাঝে কিছু পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে।

الفرقُ اللّغوى (শাব্দিক পার্থক্য) ঃ

رحمٰن ও رحيم শব্দ দু'টি যথাক্রমে فُعْلان ও فَعِيل এর ওযনে اسم فاعل مُبَالَغَة এর সীগা। উভয়ের মাসদারগত অর্থ হলো হৃদয়ের কোমলতার আধিক্য।

رحمٰن এর মধ্যে رحيم এর তুলনায় অধিক মোবালাগা বিদ্যমান। কেননা প্রসিদ্ধ নিয়ম হল, كثرةُ الْمَبانِى تدُلُّ على كَثْرةِ الْمَعَانِىْ। আল্লামা কাযী বায়যাবী (রহঃ) এ অর্থের আধিক্য দু'ভাবে প্রমাণ করেছেন–

১. পরিমাণ ও সংখ্যার দিক দিয়ে। ২. গুণ ও অধিক মর্যাদার দিক দিয়ে।

كَمًّا তথা পরিমাণ বা সংখ্যার দিক থেকে। যেমন বলা হয়, رحمٰن الدُّنيا و رحيم الاخرة কেননা দুনিয়ায় আল্লাহর অনুগ্রহরাজী কাফির ও মুমিন নির্বিশেষে সকলের জন্য ব্যাপ্ত। আর আখেরাতে আল্লাহর নেয়ামত শুধুমাত্র মুমিনদের জন্য। অতএব দুনিয়ায় আল্লাহর নেয়ামত সংখ্যায় বেশী। তাই رحمٰن الدنيا বলা হয়। পক্ষান্তরে আখেরাতের নেয়ামত শুধু মুমিনদের অতএব আখেরাতে আল্লাহর নেয়ামত সংখ্যায় কম তাই رحيم الاخرة বলা হয়।

আর كَيْفًا তথা গুণ বা মর্যাদায় আধিক্যের বিবেচনা করে বলা হয় رحمٰن الدُّنيا وَالاخرة ورحيمُ الدُّنيا কেননা আখেরাতের সকল নেয়ামত গুণগতভাবে মহান ও বড়। আর দুনিয়ার নেয়ামত কিছু বেশী মর্যাদাবান অপর কিছু স্বল্প মর্যাদার। رحمن অর্থ সুবৃহত নেয়ামতদানকারী এ অর্থে বলা হয় رحمٰن الدُّنيا او الا خرة। আর رحيم অর্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুগ্রহকারী। তাই বলা হয় رحيم الدُّنيا فقط।

৩. তাছাড়া رحمٰن শব্দটি আল্লাহর জন্য খাস। পক্ষান্তরে رحيم শব্দ বান্দার জন্যও ব্যবহার হয়।

اَلْبَحْثُ اللُّغَوِىُّ لِلرَّحْمٰنِ وَالرَّحِيْمِ "د"

কিংবদন্তী মুফাস্সির আল্লামা নাসিরুদ্দীন বায়যাবী (রহঃ) رحمن ও رحيم এর শব্দগত বিশ্লেষণের মধ্যে তিনটি জিনিস আলোচনা করেছেন।

১. رحمٰن ও رحيم শব্দ দু'টি কোন প্রকারের ইসম. ২. শব্দ দু'টির অর্থ। ৩. অর্থের উপর আরোপিত প্রশ্নের জবাব।

প্রথম আলোচনা رحمن ও رحيم শব্দ দু'টি رحم শব্দ থেকে নির্গত اسم। مُبالغة فاعل এর সীগাহ। غضب থেকে যেমন غَضْبَان রূপান্তরিত হয় তেমনিভাবে رحم থেকে رحمن রূপান্তরিত হয়েছে এবং عِلْمٌ থেকে যেমন عليم রূপান্তরিত হয় তদ্রূপ رحم থেকে رحيم রূপান্তরিত হয়েছে।

مَعْنَى اللُّغَوِيّ : اَلرَّحْمَة শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, হৃদয়ের কোমলতা যা দয়া ও অনুগ্রহ কামনা করে। এ শব্দমূল থেকে মহিলাদের গর্ভাশয়কে رحم বলা হয়। কেননা গর্ভাশয়ের সন্তানের জন্য তা অতিশয় কোমল ও স্নেহশীল হয়। رحمن ও رحيم এর আভিধানিক অর্থের উপর ভিত্তি করে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তাহলো এই যে, الرَّحْمَة অর্থ অন্তরের কোমলতা। আর অন্তরের কোমলতা হল كَيْفِيَّت نَفْسَانِى এর পরিচায়ক। যা অন্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়। আর আল্লাহ পাক অন্যের প্রভাবমুক্ত। কেননা প্রভাবান্বিত হওয়া নশ্বরতার আলামত। অথচ আল্লাহ অবিনশ্বর স্বত্তা। অতএব, আল্লাহর জন্য الرَّحمة গুণে গুণান্বিত হওয়া কিভাবে কল্পনা করা যায়?

এর উত্তরে আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) বলেন, আল্লাহর যে সকল গুণাবলী রয়েছে তার দু'টি পর্যায় রয়েছে- ১. প্রাথমিক পর্যায় ২. চূড়ান্ত পর্যায়। আল্লাহর জন্য শেষোক্ত অর্থই প্রযোজ্য। যেমন الرَّحْمَة এর দুটো পর্যায় রয়েছে।

১ম পর্যায়ে যার স্বরূপ হল, رِقَّتُ الْقَلْب, অন্তরের কোমলতা, হৃদয়ের দয়াদ্রতা, আর ২য় পর্যায়ের স্বরূপ হল, الاحسان তথা অনুগ্রহ করা, নেয়ামত দান করা। এখানে শেষোক্ত অর্থটাই উদ্দেশ্য। অতএব কোন প্রশ্নের অবকাশ নেই।

"د": "الاِسْم" بَيَانُ اِشْتِقَاقِ كَلِمَةِ –

الاسم এর শব্দমূল কি? এ ব্যাপারে কুফী ও বসরী নাহুবিদদের মতানৈক্য রয়েছে। বসরী নাহুবিদদের অভিমত হল, الاسم এর শব্দমূল سُمُوٌّ। যার শেষাক্ষর واؤ কে বিলুপ্ত করে প্রথম অক্ষরকে সাকিন করা হয়েছে। অতপর প্রথম হরফকে সাকিন পড়া অসম্ভব বিধায় শুরুতে همزة وصل যুক্ত করা হয়েছে।

اسم শব্দের বহুবচন اَسْمَاء وَ اَسَامِى হওয়া এবং اسم এর تصغير রূপ سُمَىٌّ হওয়া اسم থেকে سَمَّيْتُ এর ওযনে ফে'ল রূপান্তর হওয়া এবং اسم এর আরেকটি আভিধানিক রূপ هُدًى এর ওযনে سُمًى হওয়া ইত্যাদি শেষে حرف

علت হওয়াকে নির্দেশ করে। যা اسم শব্দটি ناقص হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে। এবং বসরী গণের অভিমতকে সমর্থন করে।

কূফীগগণের অভিমত হল, اسم শব্দটি وسم থেকে নির্গত। যার শুরু থেকে واو বিলুপ্ত করে তার পরিবর্তে همزة আনা হয়েছে। তাদের দাবীর স্বপক্ষে যুক্তি হলো এতে تعليل কম হয়। পক্ষান্তরে سمو থেকে مشتق মানলে تعليل বেশী হয়। আর حذف কম হওয়াটাই উত্তম। তারা বসরী গণের মত খন্ডনের জন্য বক্তব্য পেশ করেন যে, اسم এর বহুবচন أَسْمَاء ـ أَسَامِيْ ইত্যাদিতে মূলতঃ وَسِيْمٌ ـ أَوَاسِمُ ـ أَوْسَام হয়েছে। এগুলোর আসল রূপ হলো, قَلْبِ مَكَانِيْ ইত্যাদি। অতপর واو কে قلب তথা স্থান পরিবর্তন করে শেষে সংযুক্ত করা হয়েছে।

মন্তব্য ঃ কূফীগণের এ যুক্তি সঠিক নয়। কেননা কোন اسم এর সকল রূপান্তরে قلب হওয়া নীতি বহির্ভূত। আরবী ভাষায় এটা সুপ্রচলিত নয়। কুফী গণের যুক্তির উত্তরে বলা হয় যে, কোন শব্দের শুরু থেকে حرف علت বিলুপ্ত করে তার পরিবর্তে همزهٔ وصل যোগ করা আরবী নিয়মের পরিপন্থী। বরং শব্দের শুরু থেকে حرف علت বিলুপ্ত করে কখনো همزهٔ قطعی সংযুক্ত করার নযীর রয়েছে। যেমন وِشَاحٌ থেকে إِشَاحٌ – পক্ষান্তরে اسم শব্দটি এর বিপরীত কেননা তার শুরুর همزه টি همزهٔ وصل। অতএব اسم শব্দকে وَسْم থেকে مشتق মানা যায় না।

"٥" تَوْضِيْحُ قَوْلِهِ وتقديمُ الْمَعْمُوْلِ هٰهُنَا أَوْقَعُ كَمَا فِيْ قَوْلِهِ تعالى بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِيْهَا و قولِهِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ

আল্লামা কাযী বায়যাবী (রহঃ) এর উক্তি "এখানে (بسم الله এর মধ্যে) مَعْمُوْل তথা الله بسم কে مقدم (পূর্বোল্লেখ) করাই বাস্তব সম্মত। যেমন بسم اللّٰهِ مَجْرِيْهَا এবং إِيَّاكَ نعبُدُ এর মাঝে হয়েছে"। এর ব্যাখ্যা হল معمول তথা متعلق به সাধারণতঃ عامل তথা متعلقএর পরে থাকে। কিন্তু কখনো কখনো কোন ফায়িদা ও হিকমতের দিকে লক্ষ্য করে معمول কে مقدم করা হয়। এখানেও চারটি কারণে معمول বা متعلق به কে مقدمকরা হয়েছে। আর তা হলো,

১. এখানে عامل তথা فعل متعلق ও معمول তথা مُتَعَلَّقٌ به এর মধ্যে متعلق به অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পূর্বোল্লেখ করাই কাম্য।

২. معمول বা متعلق به কে مقدم তথা পূর্বোল্লেখ করলে تخصيص ও حصر বুঝায়। কেননা বালাগাতের নীতি হল, اَلتَّقْدِيْمُ مَاحَقُّه التَّاخِيْرُ يُفِيْدُ الْحَصْرَ وَ التَّخْصِيْصَ।

৩. এখনে معمول কে পূর্বোল্লেখ করলে আল্লাহর বড়ত্বকে বহি:প্রকাশ করে।

৪. متعلق به কে পূর্বোল্লেখ করাটা অস্তিত্বের দিক দিয়ে অধিক সামঞ্জস্যশীল। কেননা আল্লাহর নাম সকল বস্তুর আগে অস্তিত্ব লাভ করেছে। তাই এখানে আল্লাহর নামকে পূর্বোল্লেখ করা হয়েছে। যেমন بسم الله مجريها এর মধ্যে بسم الله কে مجرى এর পূর্বে আনা হয়েছে। এবং اِيَّاكَ نَعْبُدُ এর মধ্যে اياك কে نعبد ফে'লের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

ز : اَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ فِيْ لَفْظِ اَللّٰه اَهُوَ مُشْتَقٌّ اَوْعَلَمٌ (لله শব্দটি اسم متتق নাকি علم) ঃ

اَللّٰه শব্দের তাহ্‌কীক সম্পর্কে আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) চারটি অভিমত উল্লেখ করেছেন। ১. اَللّٰه শব্দটি اسم مُشْتَقٌّ ২. اَللّٰه শব্দটি ذاتِ بَارِى এর علم ৩. اَللّٰه শব্দটি মূলত صفت مشتق ছিল পরবর্তীতে ذاتِ بارى تعالى এর اسم হিসেবে প্রাধান্য পাওয়ার কারণে علم এর মত হয়ে গিয়েছে, ৪. اَللّٰه শব্দটি মূলত: সুরইয়ানী ভাষার শব্দ। আসলে ছিল لَاهًا অর্থ معبود বা উপাস্য। শেষের الف কে বিলুপ্ত করে শুরুতে الف যুক্ত করায় اَللّٰه হয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ৩য় অভিমতটি স্বতন্ত্র কোন অভিমত নয় বরং ১ম অভিমতকে দ্বিতীয় অভিমতের উপর প্রাধান্য দানের উদ্দেশ্যেই আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) اَلْاَظْهَرُ اَنَّهُ وَصْفٌ فِيْ اَصْلِهِ এ ইবারতটি উল্লেখ করেছেন।

৩ নাহুবিদ যুজাজ, সিবওয়াহ প্রমুখের মতে, اَللّٰه শব্দটি ذاتِ بارى تعالى এর علم – তাদের এ দাবীর স্বপক্ষে তিনটি দলীল রয়েছে।

১. اَللّٰه শব্দটি সর্বদা موصوف হয়ে থাকে, কখনো صفت হয় না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এটা علم ، صفت নয়। কেননা যদি صفت হত তাহলে অন্য علم এর صفت হত।

২. ذاتِ بارى تعالى এর জন্য এমন একটা اسم প্রয়োজন যার উপর তার সকল صفات প্রয়োগ হবে। اَللّٰه শব্দকে صفت বলা হলে আল্লাহর অন্যান্য صفات প্রয়োগ করার উপযুক্ত কোন اسم موصوف পাওয়া যাবে না। এ কারণেই اَللّٰه শব্দটি اسم হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

৩. اَللّٰه শব্দকে صفت মেনে নেয়া হলে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ দ্বারা তাওহীদ প্রতিষ্ঠিত হবে না। কেননা صفت অংশীদারীত্বকে نفى করে না। যেমনভাবে لَآ اِلٰهَ اِلَّا الرَّحْمٰنُ তাওহীদের ফায়দাদায়ক নয়। আর যেহেতু لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه অবশ্যই তাওহীদের ফায়দাদায়ক। অতএব বলতে হবে যে, اَللّٰه শব্দটি অবশ্যই اسم সিফত নয়। اَللّٰه শব্দটি مشتق হলে তার مشتق فيه কি?

যারা বলেন, اَللّٰه শব্দটি اسم مشتق তারা اَللّٰه শব্দের مشتق منه নিয়ে মতানৈক্য করেছেন। আল্লামা কাযী বায়যাবী (রহঃ) এ সম্পর্কিত ৬টি অভিমত উল্লেখ করেছেন।

১. اَللّٰه শব্দটি اَلَهَ বাবে فتح থেকে। ক্রিয়ামূল اِلٰهَةٌ ও اُلُوْهَةٌ। অর্থ ইবাদত করা। اِلٰهٌ অর্থ مَأْلُوْهٌ বা مَعْبُوْد অর্থ উপাস্য। যেহেতু আল্লাহ সৃষ্টিকুলের প্রকৃত উপাস্য তাই তাকে اله নামকরণ করা হয়েছে।

২. অথবা শব্দটি اَلِهَ বাবে سمع থেকে مشتق। অর্থ تحير বা পেরেশান হওয়া। যেহেতু আল্লাহ তা'আলার পরিচয় লাভে বুদ্ধি-বিবেক পেরেশান হয়ে যায়; এ কারণে اَللّٰه শব্দকে اَلِهَ অর্থ পেরেশান হওয়া থেকে উৎকলন করা হয়েছে।

৩. اَللّٰه শব্দটি اَلَهْتُ اِلٰى فُلَانٍ থেকে উদ্ভূত'। অর্থ سَكَنْتُ বা আমি স্বস্তি লাভ করেছি। যেহেতু আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে তার ধ্যান-সাধনার মাধ্যমে অন্তর স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে তাই اَللّٰه শব্দটি اَلَهْتُ اِلٰى فُلَانٍ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে।

৪. অথবা اَللّٰه শব্দটি اَلِهَ থেকে নির্গত। যার অর্থ আপতিত বিপদ-মুসিবতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আশ্রয় নেয়া। এর থেকে اَلِهَهُ غَيْرُهُ অর্থ তাকে অপর কেউ আশ্রয় দিয়েছে। যেহেতু اَللّٰه এমন এক স্বত্তার নাম যার কাছে সর্বদা আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়, তাই তাকে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

৫. অথবা শব্দটি اَلِهَ الْفَصِيْلُ থেকে নির্গত। যার অর্থ, উটের বাচ্চা তার মাতার আসক্ত হয়েছে। উটের বাচ্চা যেমন ভয়-ভীতিতে উষ্ট্রীর দিকে ফিরে যায় বান্দা তেমনি বিপদে-আপদে আল্লাহ্র ধর্ণা ধরে।

৬. وَلَهَ বাবে ضَرَبَ থেকে নির্গত। অর্থ – ব্যাকুল হওয়া। যেহেতু আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হতে গেলে মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি অস্থির হয়ে যায়। তাই এ

নামে নামকরণ করা হয়েছে। এমতাবস্থায় اَللّٰه শব্দটি وِلَاهٌ থেকে নেয়া হয়েছে। واو এর নিচে كسره কঠিন বিধায় واو কে الف দ্বারা পরিবর্তন করায় اِلٰهٌ হয়েছে।

★ কারো কারো মতে اَللّٰه শব্দের আসল اله ছিল না বরং لاه যা لَاهَ يَلِيْهُ - لَاهَا ও لَيْهًا এর মাসদার। অর্থ গোপন হওয়া, মর্যাদাবান হওয়া। উভয় অর্থের দিক থেকেই শব্দটির নামকরণ সার্থক। কেননা আল্লাহ তা'আলা দৃষ্টি থেকে গোপন, এবং সব বস্তুর থেকে শ্রেষ্ঠ। অসমীচীন বস্তু থেকে পবিত্র। উক্ত মতকে সমর্থন করে আল্লামা বায়যাবী (রহ) এ মতের সপক্ষে ৩টি দলীল উপস্থাপন করেছেন।

১. আল্লাহ তা'আলা স্বত্তাগতভাবে মানুষের কল্পনার অতীত, সুতরাং সে কোন শব্দের مدلول হতে পারে না। কেননা মানুষের মনোভাব বা কল্পনার বিষয়ের উপর শব্দ دلالت করে থাকে।

২. اَللّٰه শব্দটি যদি শুধুমাত্র ذاتِ بارى تعالى কেই বুঝায় তাহলে আল্লাহর বাণী هُوَاللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ এর অর্থ সঠিক হবে না। কেননা তখন আসমান সমূহ আল্লাহর অবস্থানস্থল সাব্যস্থ হয় অথচ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অভিমত হল আল্লাহ স্থান ও মহল থেকে পূত-পবিত্র। তিনি কোন স্থান ও মহলের মুহতাজ নন।

৩. اِشْتِقاق এর জন্য মূলনীতি হলো দু'টি শব্দ এরূপ হওয়া যে, উভয়ের অর্থ ও শব্দমূলের মধ্যে সামঞ্জস্য বিদ্যমান থাকবে। আর এ মূলনীতি اَللّٰه শব্দ ও তার مشتق منه এর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং শব্দটি صفت مشتق। তবে যেহেতু এটাকে শুধুমাত্র আল্লাহর সত্তা বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয় তাই এটা আল্লাহর সত্তার জন্য علم এর মত হয়ে গিয়েছে।

اَلْجوابُ عَنِ الْمُخَالِفِيْن (বিরোধীদের যুক্তি খণ্ডন) :

যারা اَللّٰه শব্দকে علم বলেন, তাদের তিনটি যুক্তি খন্ডন করে আল্লামা বায়যাবী (রা.) বলেছেন, اَللّٰه শব্দটি মূলত صفتِ مُشتق কিন্তু আল্লাহর জন্য এর ব্যবহার অধিক হওয়ার কারণে এটা আল্লাহর সত্তার জন্য علم এর মত হয়ে

গিয়েছে। যার ফলে ১. صفت এর موصوف হওয়া ২. অন্য কোন موصوف এর صفت না হওয়া ৩. তার মধ্য অংশীদারীত্বের সম্ভাবনা তিরহিত হওয়ার দিক দিয়ে এটা علم এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে গিয়েছে।

★ اَعُوْذُ بِا للّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم কুরআনের অংশ নয়।

তবে সূরায় নাহলে আল্লাহ তা'আলা কুরআন তেলাওয়াতের পূর্বে اعوذ بِاللّٰهِ مِن الشَّيطان الرَّجيم পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। উক্ত আয়াতের মধ্যেস্থ اعوذ بِاللّٰهِ من الشيطان الرَّجيم কুরআনের অংশ। আয়াতটি হলো فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِن الشَّيطانِ الرَّجيم

س (١١) : الحمدُللّٰه رب العَالمين

الف : اكتب معنىَ الْحَمْدِ وَالْمَدْحِ وَالشُّكْرِ واَوْضِح النِّسْبَةَ بَيْن الَحمدِ وَ الشُّكرِ

ب : ما معنىَ النَّقِيْضِ و ما نَقِيْضُ الْحَمَدِ وَ الشُّكْرُ؟

ج : اوضِح قولَه وقِيْلَ اَللاَّمُ فِيْه لِلاِسْتِغراقِ اِذِ الْحمدُ فى الْحقِيْقةِ كُلُّه لَه -

د : قوله وَفيْهِ اِشْعارٌ بِاَنَّهٗ تَعَالىٰ حَىٌّ قَادِرٌ مُرِيْدٌ عُالِمٌ ـ اُذكر كيفيَّةَ الْاِشْعارِ ثمَّ بيِّن وجهَ كَوْنه تعالى مُتَّصِفًا بِهٰذِهِ الصِّفَاتِ

ه : كَمْ معنىٌ ذكرَ الْقاضىُ فى كتابِه لِ "اَلْعَالَمْ" وما وَجْهُ تسميتِه بِه ولِمَ ذكرَ بلفظِ الْجمْعِ؟

উত্তর ঃ الف : معنى الحمد والمدح والشكر (**হাম্‌দ, মাদাহ ও শুকরের পরিচয়) ঃ**

বাহ্যিক দৃষ্টিতে حمد، مدح ও شكر শব্দগুলো কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হলেও শব্দগুলোর মাঝে সূক্ষ্ম কিছু পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। নিম্নে এগুলোর পরিচয় তুলে ধরা হলো।

اَلْفَرْقُ اللُّغَوِى (শাব্দিক পার্থক্য) ঃ اَلْحَمْدُ শব্দটি বাবে سمع এর মাসদার। অর্থ اَلْمَدْحُ وَالثَّنَاءُ بِالْجَمِيْلِ বা উত্তম কাজ ও বিষয়ের প্রশংসা।

আর الشكر শব্দটি বাবে نصر এর মাসদার। অর্থ : عِرْفَانُ النِّعْمَةِ وَالثَّنَاءُ بِهَا অর্থাৎ কারো অনুগ্রহের পরিবর্তে তার প্রশংসা করা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

আর اَلْمَدْحُ শব্দটি বাবে فتح এর মাসদার। অর্থ اَلثَّنَاءُ বা প্রশংসা।

اَلْفَرْقُ الْاِصْطِلَاحِىُّ (পারিভাষিক পার্থক্য) ঃ

اَلْحَمْدُ هُوَ الثَّنَاءُ عَلَى الْجَمِيْلِ الْاِخْتِيَارِىِّ مِنْ جِهَةِ التَّعْظِيْمِ مِنْ نِعْمَةٍ وَغَيْرِهَا

অর্থাৎ অনুগ্রহপ্রাপ্ত হওয়া বা না হওয়া উভয় অবস্থায় কারো ঐচ্ছিক উত্তম কাজ বা বিষয়ের প্রশংসা কীর্তন করাকে حمد বলে।

الشُّكْرُ هو عِبَارَةٌ عن مَعْرُوفٍ يُقَابِلُ النِّعْمَةَ سَوَاءٌ كَانَ بِاللِّسَانِ اَوْ بِالْجَوَارِحِ اَوْ بِالْقَلْبِ অর্থাৎ অনুগ্রহের বিনিময়ে অন্তর, মুখ এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে যে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শিত হয় তাকে شكر বলে।

اَلْمَدْحُ هُوَ الثَّنَاءُ عَلَى اَحَدٍ بِمَا لَهُ مِنَ الصِّفَاتِ

অর্থাৎ কোন ব্যক্তির মধ্যে অবস্থিত গুণাবলীর প্রশংসা করাকে مدح বলে।

اَلنِّسْبَةُ بَيْنَ الْحَمْدِ وَالشُّكْرِ :-

حمد ও شكر এর পরিচয়ের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি যে, حمد শব্দটি অনুগ্রহ প্রাপ্তি ও না প্রাপ্তি উভয়ের জন্য عام বা ব্যাপক।

পক্ষান্তরে شكر শব্দটি শুধুমাত্র অনুগ্রহের সাথে خاص (বিশেষিত)। অপর দিকে حمد কেবলমাত্র ভাষার মাধ্যমে আদায় করার জন্যে خاص (সীমিত)।

পক্ষান্তরে شكر অন্তর, ভাষা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আদায় করার ব্যাপারে عام (ব্যাপক)।

অতএব متعلق এর দিক দিয়ে حمد শব্দটি عام আর مورد এর দিক দিয়ে خاص। তদ্রূপ مورد এর দিক দিয়ে شكر শব্দটি عام। আবার متعلق এর দিক দিয়ে সেটি خاص - তাই উভয়ের মধ্য عموم خصوص مطلق এর نسبت রয়েছে।

"ب" مَعْنَى النَّقِيْض (نَقِيْض এর অর্থ) ঃ

نَقِيض এর শাব্দিক অর্থ تَقَابُل বা ضِدُّ অর্থাৎ বিপরীত, প্রতিপক্ষ ইত্যাদি। পরিভাষায় দুটি قَضِيَّه যদি এমন হয় যে, তার একটি সত্য হলে অপরটি অবশ্যই মিথ্যা হয় বা একটি مُوْجِبَه (হাঁ বাচক) হলে অপরটি অবশ্যই سَالِبَه (না বাচক) হয় তাহলে এমন দুটি قَضِيَّه এর একটিকে অপরটির نَقِيْض বলে।

حمد এর نَقِيْض তথা বিপরীতে হল ذم – কেননা حمد অর্থ গুণ চর্চা করা। আর ذم অর্থ দোষ চর্চা করা। شكر এর نقيض হল كُفْرَان – কেননা شُكر অর্থ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। আর كفران অর্থ অকৃতজ্ঞ হওয়া।

ج: تَوْضِيحُ قَوْلِه وَقِيلَ اللَّامُ فِيهِ لِلْاسْتِغْرَاقِ اَنَّ الْحَمْدَ فِى الْحَقِيْقَةِ كُلَّهُ لَهُ ـ

ج ঃ ইবারতের ব্যাখ্যা ঃ

উপরোল্লেখিত ইবারত আল্লামা বায়যাবী (রা) এর الحمد শব্দের الف ও لام সম্পর্কিত আলোচনার একাংশ। এখানে তিনি الحمد শব্দের الف ও لام সম্পর্কে একটি অভিমত তুলে ধরেছেন। আর তাহলো কারো কারো মতে الحمد এর الف ও لام- استغراق এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। الف ও لام চার প্রকার। তারই এক প্রকার হল استغراقى

الف ولام استغراقى ঐ الف ولام কে বলে, যে الف ولام কোন কিছুর সকল افراد (একক) বুঝানোর অর্থে ব্যবহৃত হয়। অতএব الحمد এর মধ্যকার الف ولام কে যদি استغراقى বলি তাহলে অর্থ হবে যাবতীয় প্রশংসার আল্লাহ্র জন্য।

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে, حمد বলা হয় ঐচ্ছিক ভাল কাজ বা বিষয়ের প্রশংসা করাকে। আর তা আল্লাহ ছাড়া কোন বান্দার মধ্যেও পাওয়া যেতে পারে। তাহলে حمد শুধু আল্লাহ্র জন্য خاص হবে কেন?

এর উত্তর হলো সরাসরি হোক বা কারো মাধ্যমে হোক আল্লাহ তা'আলাই সকল خير তথা কল্যাণকর কাজ বা বিষয়ের একমাত্র দাতা। যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন وَمَا بِكُمْ مِنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ তোমাদের কাছে যত প্রকার নেয়ামত রয়েছে সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে।

د : كَيْفِيَّةُ الْاِشْعَارِ بِاَنَّهُ تَعَالٰي حَيٌّ قَادِرٌ مُرِيْدٌ عَالِمٌ :ـ د

د ঃ আল্লাহ حَيّ، قَادِر، مُرِيد ও عَالِم হওয়ার স্বরূপ ঃ

الحمد لله থেকে আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) দর্শন শাস্ত্রের একটি মাসআলা প্রমাণ করেছেন। মাসআলাটি হলো, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র স্বত্তা حى (জীবন্ত)

قادر (শক্তিশালী), مريد (ইচ্ছুক), عالم (জ্ঞানশীল)। الحمد لله অর্থাৎ যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য এ কথা থেকে আল্লাহর حي، قادر، مريد ও عالم এ গুণাবলী কিভাবে প্রমাণ হলো তার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল।

এ আয়াতাংশে যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য একথা ঘোষিত হয়েছে। আর حمد বলা হয় مُحاسِن إِخْتِيارِيّة বা ঐচ্ছিক সৌন্দর্যের জন্য কারো প্রশংসা করা। افعالِ إِخْتِيارِيَّة (ঐচ্ছিক কার্যাবলী) এমন স্বত্তার থেকেই প্রকাশ পেতে পারে যার তা সম্পাদন করার শক্তি রয়েছে। এরদ্বারা আল্লাহ্র قادر হওয়া প্রমাণিত হয়। আর اختيارية বলা হয় ইচ্ছাকৃত ভাবে কোন কিছু করা। এরদ্বারা আল্লাহর مريد (ইচ্ছুক) হওয়া প্রমাণিত হয়। ارادہ বা ইচ্ছা হল مسبوق بالعلم বা ইলমের পরে যা হয়ে থাকে। এর দ্বারা আল্লাহর عالم হওয়া প্রমাণিত হয়। আর علم হল حى বা জীবন্ত স্বত্তার গুণ। অতএব এর দ্বারা তার حى জীবন্ত হওয়া প্রমাণিত হয়।

উপরোল্লেখিত আলোচনার মাধ্যমে الحمد لله দ্বারা আল্লাহর مريد، حى، قادر ও عالم গুণাবলী প্রমাণিত হয় এবং কেন তিনি এ গুণাবলীতে গুণান্বিত হবেন তার কারণ জানতে পারলাম।

عَالَمٌ এর অর্থ ও ব্যাখ্যা ঃ

اسم آلہ। اسم آلہ এর সীগাহ। عالم শব্দটি قَالَبٌ ও خَاتَمٌ এর ওযনে যেমন ভাবে مِفْعَل ও مِفعال এর ওযনে আসে তেমনিভাবে فَاعَلٌ এর ওযনেও ব্যবহৃত হয়। তাহলে عالم অর্থ مايُعْلَمُ بِهِ الشَّيئُ যার মাধ্যমে কোন কিছু জানা যায়, জ্ঞাত হওয়া যায়। পরিভাষায় যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার পরিচয় সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় তাকেই عَالَمٌ বলে। এ অর্থ অনুযায়ী আল্লাহর স্বত্তা ব্যতীত যাবতীয় বস্তু عَالَمٌ এর অন্তর্ভুক্ত হবে। চাই তা جَواهِر হোক বা اَعْرَاضٌ হোক।

আর বিশ্বজাহানকে এজন্যে عالم বলা হয় যে, বিশ্ব জগতের মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় লাভ করা যায়।

২. عالم শব্দটি বিশেষভাবে ذَوِى الْعَقْل (جنس) অর্থাৎ ফিরিশতা, জ্বিন ও মানবজাতি বুঝানোর জন্যে গঠিত। তবে অপরাপর সৃষ্টিজীবকে تابع হিসেবে শামিল করে। কেননা যে স্বত্তা ذَوِى الْعُقُول তথা আশরাফুল মাখলুকাতের

প্রতিপালক তার জন্যে এর চেয়ে নিম্নমানের সৃষ্টিজীবের প্রতিপালক হওয়া অতি সহজ।

৩. عالم শব্দটি মূলতঃ جُمِيْع مَاسِوى اللّٰه আল্লাহর স্বত্তা ব্যতীত যাবতীয় বস্তুর জন্য গঠন করা হয়েছে। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে কেবলমাত্র انسان বা মানব জাতিই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ মানব সভ্যতাকে জগতসমূহের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। কেননা মানব জাতি সকল অস্তিত্বশীল বস্তুর সার নির্যাস।

★ وَجْهُ ذِكْرِ الْعَالَمَ بِلفظِ الْجَمْعِ -

عالم শব্দটি বহুবচন ব্যবহারের কারণ ঃ

عالم শব্দটি সকল জাতীয় বস্তুকে বুঝায়। তার সাথে الف ও لام যুক্ত করার কারণে عالم শব্দটি সকল جنس এর افراد কেও অন্তর্ভুক্ত করেছে। অতএব عالم কে বহুবচন আনা হল কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর হলো, عالم শব্দকে একবচন উল্লেখ করলে যদিও উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায়। তথাপি উদ্দেশ্যের পরিপন্থী অর্থেরও অবকাশ থাকে। কেননা عالم শব্দটিকে এক جنس এর জন্য ব্যবহার করাও শুদ্ধ আছে। যেমন বলা হয় عالم ملك ইত্যাদি। বস্তুত এখানে জগতসমূহের প্রতিটি বস্তুর মধ্যে আল্লাহর ربوبيت তথা প্রতিপালকত্ব প্রমাণ করা উদ্দেশ্য। এ কারণে عالم কে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

س (١٢) : "الف" كَلِمَةُ رَبِّ مَصْدَرٌ اَمْ صِفَتٌ ومَا اِيْضَاحَ قولِه ثمّ وُصِفَ بِهِ لِلْمُبَالَغَةِ كَالصَّوْمِ وَالْعَدْلِ

"ب" اوضِحْ قولَ الْمُفَسِّرِ الْعَلَّامِ وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلٰى اَنَّ الْمُمْكِنَاتِ كَمَا هِيَ مُفْتَقِرَةٌ اِلَى الْمُحْدِثِ حَالَ حُدُوْثِها فَهِيَ مُفْتَقِرَةٌ اِلى الْمُبْقِيْ حَالَ بَقَائِهَا

উত্তর ঃ الف ঃ আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) বলেন, رب শব্দটি মাসদার تربيت এর অর্থে। تَرْبِيّت অর্থ تَبْلِيْغُ الشَّيْئِ اِلٰى كَمَالِه شَيْئًا فَشَيْئًا কোন বস্তুকে ক্রমান্বয়ে পরিপূর্ণতায় পৌছানো। رَبٌّ শব্দটি মাসদার হওয়া সত্ত্বেও মুবালাগা হিসেবে আল্লাহর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন رَجُلٌ عَدْلٌ وصَوْمٌ বলা হয়। এখানে عدل ও صوم মাসদার কিন্তু রোযাদার ও ইনসাফগার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে;

আর কারো কারো মতে, رَبّ শব্দটি صفت مشبه এর ছীগা। যেমন অভিধানে আছে رَبَّهُ يَرُبُّهُ فَهُوَ رَبٌّ যেমন نَمَّ يَنِمُّ فَهُوَنَمٌّ এর অর্থ পালনকর্তা, মালিক, প্রতিপালক ও প্রভু।

মনিবকে رب বলা হয় যেহেতু তার মালিকানাভুক্ত সবকিছুকে সে সংরক্ষণ ও প্রতিপালন করেন।

এ শব্দটি ইযাফতের শর্তে غَيرُ اللّه এর জন্য প্রয়োগ হয়। যেমন اِرْجِعْ اِلى رَبّكَ ، رَبُّ الْمَال ইত্যাদি।

★ اِيضاحُ قولِه ثُمَّ وَصِفَ بِه لِلْمُبالَغَةِ كَالصَّوْمِ وَالعَدْلِ

উল্লেখিত ইবারতের সারমর্ম হল, رَبّ শব্দটিকে যদি মাসদার ধরা হয় তাহলে অর্থ হল পালন করা। এটা কারো وصف হতে পারে না। তাই আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) বলেছেন, رَبّ শব্দটি মাসদার হওয়া সত্ত্বেও মুবালাগার ভিত্তিতে আল্লাহর وصف হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন বলা হয় زَيْدٌ صَوْمٌ وَعَدل এখানে صوم ও عدل মাসদার। কিন্তু মুবালাগা বুঝানোর জন্য তাকে যায়েদের وصف হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ যায়েদ বেশী রোযাদার ও খুবই ন্যায়পরায়ন।

ب : تَوضيحُ قَولِ الْمُفَسِّرِ الْعَلَّامِ وفيه دليلٌ على انَّ الْمُمْكِنات كَمَا هِي مُفْتَقِرَةٌ الى الْمُحدِث حال حُدوثِها فَهى مُفتَقِرةٌ الى الْمُبقِى حال بَقائِها

ب ঃ **উল্লিখিত ইবারতের ব্যাখ্যা ঃ**

উপরোল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা হল আল্লাহ তা'আলা যেহেতু জগতসমূহের পালনকর্তা। সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জগতের সৃষ্টিকুল সৃষ্টিলগ্নে যেমন তার সৃষ্টি করার প্রতি মুখাপেক্ষী তদ্রূপ এ সৃষ্টিকুল স্বীয় স্থায়িত্ব লাভের জন্য আল্লাহর প্রতিপালনের প্রতি মুখাপেক্ষী। কেননা আল্লাহ তা'আলা যেহেতু নিজেকে জগতসমূহের প্রতিপালক আখ্যায়িত করেছেন এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জগতসমূহ ও সৃষ্টিকুল আল্লাহর প্রতিপালনে স্থায়িত্ব লাভ করেছে। যদি তিনি প্রতিপালন না করতেন তাহলে কোন বস্তুই স্থায়িত্ব লাভ করত না।

س (١٣) : مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ـ

الف: كَمْ قِرَائَةٌ فِيْ هٰذِهِ الْآيَةِ ومَا هِى ومَا الْمُخْتَارُ فِيهَا ولِمَا ؟ اُكْتُبْ مع بُيانِ مُعَانِى الايةِ بِحَسْبِ الْقِراتِ الْمُخْتَلِفَة

ب: ما معنى الدِّيْنِ ومَا المرادُ بهِ هٰهنا ؟ اكتبْ مُوضِحَةً

ج: اَوْضِحْ قولَهُ اَضَافَ اِسْمَ الْفاعِلِ الى الظَّرفِ اِجْرائًا لَهُ مَجْرى الْمَفْعُولِ به عَلى الْاِتِّسَاعِ كقولِهم اَيَا سَارِقَ اللَّيْلَةِ اَهْلَ الدَّارِ

د: "وَلَمْ يُبْقَ سِوَاى الْعُدْوَانِ دِنَاهُم كَمَا دَانُوا "لِمَنِ الْبَيْتِ الْمذكور وما معناه وعَلَا مَااسْتُشْهِدَ بِهِ الْمُفَسِّرُ الْعلاّم؟

উত্তর ঃ الف:ك مَـالِكِ يَـوْمِ الـدِّيـنِ **এর কিরাত সমূহ ঃ** কাযী নাসিরুদ্দীন বায়যাবী (রহঃ) مـالِكِ يـوْمِ الـديـن আয়াতের ৯টি কিরাত উল্লেখ করেছেন যার দু'টি প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত। অপরাপর কিরআতগুলো প্রচলিত নয়। নিম্নে নয়টি কিরাতের বর্ণনা দেয়া হল,

১. কিরাআতের ইমামগণের মধ্যে আসিম, কাসাঈ ও ইয়াকূব (রহঃ) এর মতে, مـالِك يـوم الـديـن অর্থাৎ مِلْكٌ মাসদার থেকে اسـم فـاعـل এর সীগা এবং مـالِكِ এর শেষাক্ষর ك বর্ণে যের দিয়ে পাঠ্য এটাই সুপ্রসিদ্ধ মত। কোরআনের আয়াত يَوْمَ لاتَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَّالاَمْرُ يَومَئِذٍ لِلّٰه এ মতকে সমর্থন করে। কারণ উক্ত আয়াতের মধ্যে تَـمْلِكُ শব্দটি مِلْكٌ মাসদার থেকে নিষ্পন্ন এবং এতে কিয়ামত দিবসের মালিক আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর مَالِكِ يَـوْمِ الدِّيـن এর মধ্যেও কিয়ামত দিবসের মালিকানা আল্লাহর--এ কথাই বলা হয়েছে। مـالـك يـوم الـديـن অর্থ বিচার দিনের মালিক।

২. অপর সকল কারীদের কিরাআত হল, مَـلِكِ يـوم الـديـن। হারামাইন শরীফাইনের অধিবাসীদের এটাই অভিমত। আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) এর নিকট গ্রহণযোগ্য মতও এটাই। এমতাবস্থায় مَـلِك يَـوم الـدِّيـن অর্থ বিচার দিবসের রাজত্বের অধিকারী।

৩. مَـلْكِ يَـوْمِ الـدِّيْن - এটা مـلـك এর কোমলরূপ। কেননা যে ইসম مـضـمـوم الـعـيـن বা مـكـسـورالـعـيـن এর ওযনে হয় তার عـيـن كـلـمـه কে سـاكـن করার নীতি প্রচলিত রয়েছে।

৪. مَلَكَ يَوْمَ الدِّيْنِ – অর্থাৎ مَلَكَ কে فعل ماضى এর থেকে পড়া। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এ মত পোষণ করতেন।

৫. مَالِكًا يَوْمَ الدِّيْنِ অর্থাৎ مالك ـ اسم فاعل সীগাকে مدح এর ভিত্তিতে অথবা حال এর ভিত্তিতে نصب দিয়ে পড়া।

وَالتَّقْدِيْرُ اَمْدَحُ مَالِكًا يَوْمَ الدِّيْنِ اَوحَال مِنْ لَفْظِ اللّٰهِ اَىْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَالَ كَوْنِهِ مَالِكًا يَوْمُ الدِّيْنِ.

৬. مَالِكٌ يَوْمِ الدِّيْنِ অর্থাৎ مَالِك মাসদার থেকে اسم فاعل এর সীগা رفع مَعَ اَلتَّنْوِيْن পাঠ্য।

৭. مَالِكُ يَوْمِ الدِّيْنِ অর্থাৎ مِلْك মাসদার থেকে اسم فاعل এর সীগা رفع مع الاضافت পাঠ্য। আর উভয় কিরাআতে رفع হয়েছে উহ্য মুবতাদা هو এর خبر হওয়ার কারণে।

৮. مَلِكُ يَوْمِ الدِّيْنِ ـ مُلْكٌ মাসদার থেকে উদগত– مَلِكٌ সীগাকে رفع مع الاضافة পাঠ্য। এখানে مُلْك উহ্য মুব্‌তাদা هو এর خبر হিসেবে رفع হয়েছে?

৯. مَلِكَ يَوْمِ الدِّيْنِ অর্থাৎ مُلْكٌ মাসদার থেকে নিষ্পন্ন مَلِكٌ সীগাহ نصب مع الاضافة পাঠ্য। এমতাবস্থায় مَلِكٌ শব্দটি الحمد لله এর الله শব্দের থেকে حال হওয়ার কারণে نصب হয়েছে।

পছন্দনীয় কিরাআত : উপরোল্লেখিত নয় কিরাআতের মধ্যে দ্বিতীয় কিরাআতকে ইমাম বায়যাবী (র.) পছন্দনীয় কিরআত আখ্যায়িত করেছেন এবং এর স্বপক্ষে তিনি তিনটি দলীল উপস্থাপন করেছেন।

১. এটা اَهْلُ الْحَرَمَيْن কিরাআত। আর হারামাইনের অধিবাসী একদিকে যেমন সর্বাধিক বিশুদ্ধভাষী অপরদিকে কিরাআত সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী।

২. আল্লাহর বাণী لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ উক্ত কিরাআতকে সমর্থন করে। কেননা এ আয়াতে غَيْرُ الله থেকে বিচার দিবসের রাজত্ব নাকচ করে একমাত্র আল্লাহর জন্য প্রমাণ করা হয়েছে। আর কুরআনের এক আয়াত অপর আয়াতের জন্য تفسير হয়ে থাকে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, مَلِكِ يومِ الدِّين এর মধ্যে مُلْك থেকেই مشتق হয়েছে। কেননা এ আয়াতে বিচার দিবসের রাজত্ব আল্লাহর এ কথাই বলা হয়েছে।

৩. مَالِك এর তুলনায় مَلِكٌ এর মধ্যে تعظيم তথা আল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধা বেশী রয়েছে। কেননা مَالِك বলা হয়, নিজের মালিকানাভুক্ত বস্তুতে স্বেচ্ছাধীন

হস্তক্ষেপকারীকে। আর مَلِكٌ বলা হয় অধীনস্থদের আদেশ-নিষেধের মাধ্যমে পরিচালনাকারীকে। মোট কথা مَالِكٌ শুধুমাত্র মালিকানাভুক্ত বস্তুর মধ্যে হস্তক্ষেপ করাকে, আর مَلِكٌ মালিকানাভুক্ত ও মালিকানা বহির্ভূত বস্তুর উপর আধিপত্য ও রাজত্বের মাধ্যমে হস্তক্ষেপ করাকে বুঝায়। অতএব مالك এর তুলনায় ملك এ মধ্যে تعظيم অধিক রয়েছে। এ তিন দলীলের ভিত্তিতে আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) مَلِكِ يوم الدين এর কিরআতকে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বলেছেন।

معنى الدين : ب دِيْن শব্দটি دَانَ يَدِيْنُ এর ওযনে বাবে ضرب থেকে উদ্ভূত।

আল্লামা কাযী বায়যাবী (রহঃ) دين শব্দের তিনটি অর্থ বর্ণনা করেছেন

১. دِيْن অর্থ جزاء বা প্রতিদান।

২. دين অর্থ شريعت বা জীবন ব্যবস্থা।

৩. دين অর্থ الطاعة বন্দেগী ও আনুগত্য।

শেষোক্ত দুটি অর্থ নেয়া হলে এখানে একটি مضاف উহ্য মানতে হবে। অর্থাৎ مالكُ جَزاء يوم الدين। কিন্তু প্রথম অর্থ গ্রহণ করলে مضاف উহ্য মানতে গণ্য করার প্রয়োজন হয় না। আর যে অবস্থায় مضاف উহ্য মানা হয় না সেটা উত্তম বিধায় এখানে প্রথমোক্ত অর্থই অধিক উপযোগী। আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) শেষোক্ত দুই অর্থ বর্ণনাকালে قيل (মাজহুল) উল্লেখ করে এর অগ্রহণযোগ্যতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। دين শব্দটি جزاء এর অর্থ ব্যবহার হওয়ার স্বপক্ষে রিজ্ঞ মুফাস্‌সির দুটি নযীর পেশ করেছেন।

১. প্রবাদ বাক্য (مثل سار) كَمَا تَدِيْنُ تُدَانُ অর্থাৎ যেমন কর্ম তেমন ফল (جزاء)।

২. دِيْوَانُ الْحَمَاسَة এর একটি পংক্তি وَلَمْ يَبْقَ سِوَى الْعُدْوَانِ دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُوْا অর্থ : এবং সীমানলংঘন ছাড়া যখন অন্য কিছু নেই, অতএব তারা আমাদের সাথে যেরূপ আচরণ করেছে আমরাও তাদেরকে সেরূপ প্রতিদান দিয়েছি। دين থেকে নির্গত دِنَّا ও دَانُوْا শব্দদ্বয় جزا الخ অর্থাৎ প্রতিদান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

تَوْضِيحُ قوله إضافةُ اِسْمِ الفاعِلِ الى الظَّرْفِ الخ : ج

(উল্লিখিত ইবারতের ব্যাখ্যা) ঃ

উপরোল্লেখিত ইবারতের মাধ্যমে আল্লামা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন, প্রশ্নটি হল এই যে, مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْن আয়াতটি الله শব্দের صفت

হয়েছে। আর موصوف ও صفت এর মাঝে معرفه বা نكره এর দিক দিয়ে تطابق থাকা আবশ্যক। কিন্তু এখানে তার ব্যত্যয় ঘটেছে। তার কারণ হল, اضافت صفت এর সীগা যখন তার معمول তথা فاعل বা مفعول এর দিকে হয় তখন তা اضافت لفظى হয়। আর এটা স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম যে, اضافت لفظى দ্বারা معرفه এর উপকারিতা হাসিল হয় না। অতএব الله موصوف ও তার صفت তথা مالك يوم الدين এর মধ্যে تطابق হয়নি? বিজ্ঞ মুফাসসির উপরোল্লেখিত ইবারতে এ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন।

ব্যাখ্যা হলো, مالك يوم الدين এর মধ্যে বাহ্যিক দৃষ্টিতে اسم فاعل - مالك এর اضافت তার مفعول এর দিকে হয়েছে বলে অনুমিত হলেও মূলতঃ يوم শব্দটি مالك এর مفعول به নয় বরং يوم শব্দটি হল ظرف - কিন্তু يوم শব্দটি ظرف مستقر হওয়ার কারণে তার মধ্যে فى উহ্য মানা ছাড়াই তাতে رفع - نصب ও جر দেয়ার অবকাশ রয়েছে। বিধায় এখানে يوم শব্দটিকে مفعول به এর مقام قائم করে তাতে نصب দেয়া হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত আরববাসীদের ব্যবহারে রয়েছে। যেমন يَا سَارِقَةَ اللَّيْلَةِ اَهْلَ الدَّارِ এখানে اللَّيْلَةَ মূলত ظرف; তথাপি তাকে مَالًا- مفعول به এর স্থলাভিষিক্ত করে نصب দেয়া হয়েছে। আসল ইবারত ছিল يَاسَارِقًا مَالًا فِى اللَّيْلَةِ اَهْلَ الدار। আর আয়াতের অর্থ হল مَالِكِ الْاُمُوْرِ فِىْ يَوْمِ الدِّيْنِ আয়াতের মধ্য يوم কে مفعول به الْاُمُوْرُ এর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। অতএব يوم শব্দটি প্রকৃতভাবে مفعول به না হওয়ার কারণে اضافت لفظى হয়নি। বরং اضافت معنوى হয়েছে। আর اضافت معنوى দ্বারা যেহেতু معرفه এর উপকারিতা হাসিল হয় সুতরাং موصوف এর সাথে تطابق রয়েছে।

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এখানে يوم শব্দটি বাস্তবে ظرف হলেও তাকে مفعول به এর স্থলাভিষিক্ত করার কারণে اضافت معنوى হয়েছে। অতএব পূর্বের প্রশ্ন আপন অবস্থায় থেকে গেল, এর উত্তর হল يوم শব্দটি مفعول به মেনে নিলেও এখানে اضافت معنوى হয়নি। এর কারণ হল اسم فاعل তখনই اضافت لفظى হবে, যখন এটা حال (বর্তমান কাল) ও استقبال (ভবিষ্যত কাল) এর অর্থ প্রদান করবে। যেমন مَالِكُ السَّاعَةِ اَوْغَدًا কিন্তু যখন اسم فاعل দ্বারা زمانه ماضيه (অতীতকাল) বা استمرارى এর অর্থ নেয়া হবে তখন তা اضافت حقيقيه হবে এবং معرفة এর ফায়দা দিবে। এখানেও مالك يوم

الدين। অতীতকাল ও সর্বাক্ষণিক উভয়ের অর্থ দিয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে وَنَادٰى اَصْحَابُ الْجَنَّةِ এ আয়াতের মধ্যে نادى শব্দটি فعل ماضى এর صيغة হলেও তা এখনো সংঘটিত হয়নি।

د : وَلَمْ يَبْقَ سِوَى الْعُدْوَانِ دِنَّا هُمْ كَمَا دَانُوا

উপরোক্ত পংক্তিটি ديوان الحماسة থেকে নেয়া হয়েছে। بيت এর অর্থ হল, "অত্যাচার ব্যতিত কিছুই অবশিষ্ট নেই, আমরা তাদের প্রতিদান দিয়েছি যেমন তারা আচরণ করেছে"। আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) دين অর্থ جزاء বা প্রতিদান এর প্রমাণ স্বরূপ এ পংক্তিটি উল্লেখ করেছেন। এতে دنا শব্দটি جزينا এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

س (١٤) : اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

الف : اذكرْ مُنَاسَبَةَ الْاٰيةِ بِمَا قَبْلَهَا

ب : كَمْ قِرَأَةً فِىْ لَفْظِ اِيَّاكَ

ج : لفظُ اِيَّاكَ المجموعُ منه ضميرٌ اَوْ اِيَّا ام كَ فقط ومَا الْاختلافُ فيه؟ حَرِّرْ مفصَّلًا -

د : مامعنى الْعِبَادةِ وَالْاِسْتِعَانَةِ؟

ه : كم قِسمًا لِلاستعانة واَىُّ قسمٍ يَتَوَقَّفُ عليهِ صِحَّةُ التَّكْلِيْفِ ومَا المرادُ بِالْاِسْتعانةِ هٰهنا ؟

ز : ماوجهُ العُدولِ مِنَ الْغَيْبَةِ اِلَى الخِطابِ وما فائدةُ تقديمِ الضَّميرِ فى اِيَّاكَ؟

ح : اذكر وجهَ فُضَّلَ قولِهِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا عَلٰى قولِهِ اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ ...

উত্তর ঃ الف: مُنَاسَبَةُ الاية بِمَا قبلها (পূর্বের সাথে উক্ত আয়াতের অন্তমিল) ঃ

মানবজীবন তিনটি অবস্থায় অতিবাহিত হয়। ইতিপূর্বের তিন আয়াতের প্রথম দুই দু'আয়াত তথা الحمدُ للّٰه ربِّ العَالمِيْن এবং الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم এ দু'টি আয়াতে মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, অতীতে সে কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলার মুখাপেক্ষী ছিল। বর্তমানেও সে একমাত্র তাঁরই মুখাপেক্ষী। অস্তিত্বহীন

এক অবস্থা থেকে তিনি তাকে অস্তিত্বদান করেছেন, তাকে সকল সৃষ্টির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর আকার-আকৃতি এবং বিবেক-বুদ্ধি দান করেছেন। বর্তমানে তার লালন-পালন ও ভরণ-পোষণের নিয়মিত সুব্যবস্থাও তিনিই করছেন। অতপর مالك يوم الدين এর মধ্যে তাকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতেও সে আল্লাহ তা'আলার মুখাপেক্ষী। প্রতিদান দিবসে একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো সাহায্য পাওয়া যাবে না। এ তিনটি আয়াতের দ্বারা যখন একথা প্রমাণিত হলো, যে মানুষ তার জীবনের তিনটি স্তরেই একান্তভাবে আল্লাহর মুখাপেক্ষী। তাই সাধারণ যুক্তির চাহিদা এই যে, ইবাদতও তারই করতে হবে। কেননা ইবাদত যেহেতু অশেষ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সাথে নিজের অফুরন্ত কাকুতি মিনতি নিবেদন করার নাম। সুতরাং তা পাওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন অন্য কোন সত্তা নেই। মোট কথা, এই যে, একজন বিবেকবান বুদ্ধিমান ব্যক্তি মনের গভীর থেকেই এ স্বতস্ফূর্ত স্বীকৃতি উচ্চারণ করে যে, আমরা তোমাকে ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করি না। আর যখন স্থির হল যে, অভাব পূরণকারী একক সত্তা আল্লাহ তা'আলা। সুতরাং নিজের যাবতীয় কাজে সাহায্যও তারই কাছে প্রার্থনা করতে হবে। বস্তুত اياك نستعين এসব বিষয়েই ইঙ্গিত বহন করে।

★ "ب" اَلْقِرَاتُ الْمُخْتَلِفَةُ فِى لفظِ اِيَّاكَ

আল্লামা কাযী বায়যাবী (রহঃ) اياك শব্দের ৩টি কিরাআত উল্লেখ করেছেন, তাহলো-

১. اِيَّاكَ হামযায় যের এবং ইয়ায় তাশদীদ দিয়ে।

২. اَيَّاكَ হামযায় যবর এবং ইয়ায় তাশদীদ সহ।

৩. هَيَّاكَ হামযাকে হা দ্বারা পরিবর্তন করে।

হাশিয়ায়ে শায়েখ যাদার ভাষ্যমতে তৃতীয় কিরাআতে "হা" এ যবর ও যের উভয় হারাকাত দেয়া যায়।

"ج" اِيَّاكَ শব্দটি সমষ্টিগতভাবে যমীর নাকি শুধু اِيَّا বা كَ শব্দটি যমীর এ সম্পর্কে আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) নাহবীদের তিনটি মাযহাব উল্লেখ করেছেন। আর তা হলো-

১. শুধু اِيَّا শব্দটি যমীর (সর্বনাম) বাকি তার সাথে যে ك - ى ও ہ সংযুক্ত হয় সেগুলো শুধুমাত্র خِطاب، تكلّم ও غَيْبت বুঝানোর জন্য আনা হয়, এটা যমীরের অংশ নয়।

২. কারো কারো মতে ى - ك ও ہ ই মূলত যমীর। আর اِيَّا শব্দকে আনা হয়েছে ঠেস বা সহায়ক স্বরূপ। কেননা এ যমীরগুলোকে যখন তার عامل থেকে

বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে তখন এ যমীরগুলোকে আলাদা ভাবে উচ্চারণ করা দুঃসাধ্য হয়ে গেছে। তাই ঠেস বা সহায়ক স্বরূপ ایا শব্দকে শুরুতে সংযুক্ত করা হয়েছে।

৩. কারো কারো মতে, পূর্ণাঙ্গ ایاك শব্দটি যমীর।

উল্লেখ্য যে, প্রথম মাযহাব অনুযায়ী ایا যমীরের সাথে যে ك ـ ى ও ه সংযুক্ত হয় তার مَحَلّ اِعْرَاب কি হবে তা নিয়ে নাহবীদের মতবিরোধ রয়েছে।

জমহুর নাহবীদের মতে, এগুলোর কোন محلّ اعراب নেই। যেমন انت যমীরের মধ্যে ت বর্ণের কোন محلّ اعراب নেই এবং رَأَيْتَكَ এর মধ্যে ك খطاب এর কোন محل اعراب নেই।

পক্ষান্তরে নাহুবিদ খলীল ইবনে আহমদের মতে, ایا যমীর এগুলোর দিকে اضافت হয়েছে তাই এগুলো مضاف اليه হিসেবে مجرور হবে। তিনি কোন এক আরব ব্যক্তির উক্তিকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেন। উক্তিটি হলো; اِذَا بَلَغَ الرَّجُلُ السِّتِّيْنَ فَاِيَّاهُ وَاِيَّا الشَّوَابِّ (যখন কোন লোক ষাট বছর বয়সে উপনীত হয়, তখন নিজেকে নব যৌবনা বালিকার সংশ্রব থেকে দূরে রাখা উচিত)। এ উক্তির মধ্যে ایا শব্দকে اَلشَّوَابِّ শব্দের দিকে اضافت করা হয়েছে এবং مضاف اليه হিসেবে جر দেয়া হয়েছে। এর দ্বারা অনুমিত হয় ایا এর সাথে যুক্ত ك ـ ى ও ه শব্দগুলোও مضاف اليه হিসেবে مجرور হবে। যদিও مبنى হওয়ার কারণে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি। তার এ মতটি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তিনি যে উক্তিটি উল্লেখ করেছেন তার উপর নির্ভর করা যাবেনা, কারণ তা شاذ বা বিরল। আর شاذ দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায় না।,

★ "د" مَعْنَى الْعِبَادَةِ وَالْاِسْتِعَانَةِ (عبادت ও استعانة এর অর্থ) ঃ

مَعْنَى الْعِبَادَةِ لُغَةً (عبادةএর আভিধানিক অর্থ) ঃ عبادة শব্দটি বাবে نصر এর মাসদার। এর অর্থ বর্ণনা করে আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) লিখেন –

الْعِبَادَةُ اَقْصٰى غَايَةِ الْخُضُوْعِ وَ التَّذَلُّلِ

অর্থাৎ ইবাদত অর্থ হল, অতিশয় বিনয়ী ও নম্রতা প্রকাশ করা।

এ ছাড়াও এর আরো অর্থ রয়েছে। যেমন

اَلْاِنْقِيَادُ অনুগত্য করা, اَلْخُضُوْعُ বিনয়ী হওয়া ও اَلْاُلُوْهِيَّةُ উপাসনা করা।

★ مَعْنَى الْعِبَادَةِ شَرْعًا (ইবাদতের শরয়ী অর্থ) ঃ هِىَ عِبَارَةٌ عَنِ الْفِعْلِ الَّذِىْ يُؤَدِّى الْفَرْضُ لِتَعْظِيْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى অর্থাৎ ইবাদত এমন কার্যকলাপকে বলা হয় যার দ্বারা আল্লাহর তা'যীমের কারণে কোন ফরয বিধান সম্পাদন করা হয়।

★ مَعْنَى الْاِسْتِعَانَةِ لُغَةً (استعانة এর শাব্দিক অর্থ) ঃ استعانة শব্দটি عون মাদ্দাহ থেকে নিষ্পন্ন। বাবে استفعال এর মাসদার। এর অর্থ হলো

১. طَلَبُ الْمَعُوْنَةِ সাহায্য প্রার্থনা করা।

২. طَلَبُ الْإِغَاثَةِ সাহায্য প্রার্থনা করা।

৩. طلبُ الْاِعانَةِ সহযোগিতা চাওয়া।

مَعْنَى الْاِسْتِعَانَةِ اِصْطِلَاحًا (اِسْتِعَانَة এর পারিভাষিক) ঃ পরিভাষায় طَلَبُ الْعَبْدِ مِنَ اللّٰهِ مَا يَتَمَكَّنُ بِهٖ عَلَى الْفِعْلِ হলো او اِسْتِعَانَة مَايُوجِبُ الْيُسْرَلَةً অর্থাৎ বান্দা কর্তৃক আল্লাহর কাছে কাজ করার শক্তি অথবা কাজকে সহজ করার সামর্থ প্রার্থনা করা।

اَقْسَامُ الْاِسْتِعَانَةِ اوِ الْمَعُوْنَةِ : ٥ (اِسْتِعَانَة বা مَعُوْنَة এর প্রকারভেদ) ঃ

আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) বলেন, مَعُوْنَة দু' প্রকার

১. ضَرُوْرِيَّة ২. غَيرِضَرُوْرِيَّة

ضرورية معونت ও قدرت এমন কে বলা হয় যা ছাড়া فعل সম্পাদিত হয়না। উসূলবিদগণের ভাষায় এটাকে قُدرتِ مُمَكِّنَه ও বলা হয়। উসূলবিদগণ এর সংজ্ঞায় বলেন,

وَهُوَ اَدْنَى مَا يَتَمَكَّنُ بِهٖ الْمَرْأُ مِنْ اِيْجَادِ الْفِعْلِ بِه

অর্থাৎ قدرت مُمَكِّنَه বলা হয় ঐ সামান্য শক্তিকে যা দ্বারা কর্তা ক্রিয়াকে সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। দার্শনিকগণ একে استطاعت বলে ব্যক্ত করেন। এর সংজ্ঞায় তারা বলেন, سَلَامَةُ الْاَسْبَابِ والْاٰلَاتِ - معونت ও قدرت এর এতটুকু পরিমাণ চার বস্তু দ্বারা হাসিল হয়। ১. ক্রিয়া সম্পাদনকারীর সক্ষমতা, ২. ক্রিয়া সম্পর্কীত জ্ঞান, ৩. যে ক্রিয়া সম্পাদন করতে উপকরণ আবশ্যক তার জন্য উপকরণের ব্যবস্থা ৪. কার্য সম্পাদন করা সম্ভব এমন মাধ্যম বা উপকরণ।

এ চারটি বস্তু সমষ্টিগতভাবে কারো মধ্যে থাকলে তাকে اِسْتِطَاعَت এর গুণে গুণান্বিত করা হয়, এবং বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে তাকে কোন কিছুর مُكَلَّف বানানো হয় তথা তার উপর দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়। আর غيرضروريه কে উসূলবিদগণ قدرت مُيَسِّرَة নামে নামকরণ করেন। معونت غيرضروريه বলা হয় এমন উপকরণ প্রস্তুত করে দেয়াকে যার দ্বারা কার্যসম্পাদন সহজ হয় এবং যার অনুপস্থিতে কার্য সম্পাদন হতে পারে তবে কষ্টসাধ্য হয়। যেমন পদব্রজে

ভ্রমণে সক্ষম ব্যক্তির জন্য আরোহীর ব্যবস্থা হওয়া, ক্রিয়া সম্পাদনকারীকে ক্রিয়ার নৈকট্যশীল করে দেয়া বা ক্রিয়া সম্পাদনে উৎসাহিত করা, এ প্রকার معونت ও قدرت এর উপর صِحَّتِ تَكْلِيْف মওকুফ নয়।

اِسْتِعَانَت শব্দটি فى এর মাধ্যমে متعدّى হওয়া সত্ত্বেও এ আয়াতের মধ্যে তার مفعول কে উল্লেখ করা হয়নি। তাহলে এর مفعول কি হবে?

এর উত্তরে আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) বলেন, اَلْمُرَادُ طَلَبُ الْمَعُوْنَتِ فِى الْمُهِمَّاتِ كُلِّهَا অর্থাৎ সকল গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনে সাহায্য প্রার্থনা করা। অর্থাৎ কখনো مفعول কে বিলুপ্ত করা হয়" ব্যাপকতা লাভের জন্য। এখানেও ব্যাপকভাবে সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ বুঝানোর জন্য مفعول উল্লেখ করা হয়নি। অথবা فِىْ اَدَاءِ الْعِبَادَاتِ অর্থাৎ ইবাদত আদায় করার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করা। পূর্বোল্লিখিত اياك نعبد এর قرينة দ্বারা বুঝা যায় বিধায় اِعْتِمَادًا عَلَى الْقَرِيْنَة অথবা اِخْتِصَارًا এখানে مفعول বিলুপ্ত করা হয়েছে।

وَجْهُ الْعُدولِ مِنَ الْغَيْبَةِ اِلَى الْخطابِ فى قوله اِيَّاكَ نَعْبُدُ : ز

সূরা ফাতিহার শুরু থেকে مَالِكِ يَوْمِ الدِّين পর্যন্ত اُسْلُوبُ الْغَيْبَةِ এ বর্ণনা করার পর হঠাৎ করে اياك نعبد তে اسلوبُ الْخِطاب এর দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে, যাকে বালাগত শাস্ত্রে اِلْتِفَاتْ বলে। এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) বলেন, পূর্বের আয়াতে প্রশংসার উপযুক্ত উল্লেখ করে তাকে মহিমামন্ডিত গুণাবলীতে গুণান্বিত করা হয়েছে। এসকল গুণাবলীর কারণে حقيقٌ بالحمد একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বতন্ত্র সত্তায় রূপ নিয়েছেন। তাই এ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বতন্ত্র সত্তারূপকে আরো অধিক স্পষ্ট এবং প্রমাণ থেকে চক্ষুসের স্তরে উন্নীত করার জন্য اِلْتفَات করা হয়েছে। অর্থাৎ হে ঐ সত্তা যিনি এমন মহিমামন্ডিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী! আমরা আপনারই আরাধনা করি এবং আপনার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। কেননা غَيْبَت এর চেয়ে خِطاب বৈশিষ্ট্যকে অধিক সুস্পষ্ট করে এবং প্রমাণের স্তর থেকে চাক্ষুসের স্তরে এবং অনুপস্থিতির স্তর থেকে উপস্থিতির স্তরে উন্নীত করে।

اِيَّاكَ نَعْبُدُ واِيَّاكَ نستعين এর মধ্যে اياك শব্দটি نعبد এর مفعول হয়েছে। আর নাহুশাস্ত্রের স্বাভাবিক নিয়ম হল فعل আগে এবং مفعول কে পরে আনা। কিন্তু উক্ত আয়াতের মধ্যে اياك শব্দকে مفعول হওয়া সত্ত্বেও উভয় স্থানে فعل এর পরে আনা হয়েছে। যা নাহু শাস্ত্রের চিরাচরিত রীতির পরিপন্থী।

আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) এর পিছনে পাঁচটি কারণ বর্ণনা করেছেন। তাহলো -

১. তা'যীমের উদ্দেশ্যে ایاك কে مقدم করা হয়েছে। কেননা ایاك শব্দের مدلول বা মর্ম হল আল্লাহ তা'আলা, আল্লাহর নাম মুমিনের কাছে সর্বাপেক্ষা মর্যাদাশীল আর মর্যাদা প্রকাশের একটি পন্থা হলো مقدم করা।

২. মাফউল তথা আল্লাহর গুরুত্ব বুঝানোর জন্য। কেননা আল্লাহ তা'আলা মুমিনের কাছে সবকিছুর চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে আগে আনাই নিয়ম।

৩. حصر ও اختصاص এর উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ إِسْتِعَانَة ও عِبَادَة কে আল্লাহর জন্য خاص করে দেয়ার জন্য। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে نَخُصُّكَ অর্থাৎ আমরা বিশেষভাবে আপনাকে উপাস্য ও সাহায্য প্রার্থনার কেন্দ্রবিন্দু বানাচ্ছি। এটাকে حصر বলে। কায়দা আছে

اَلتَّقْدِيْمُ مَا حَقُّهُ التَّاخِيْر يُفِيْدُ الْحَصْر

৪. যেহেতু وجود তথা অস্তিত্বের নিরীখে مفعول তথা আল্লাহর অস্তিত্ব আগে এবং عبادة ও استعانة এর অস্তিত্ব পরে, সেহেতু مفعول কে مقدم করা হয়েছে।

৫. সাধক বান্দাকে এ মর্মে সতর্ক করার জন্য যে, সাধকের দৃষ্টি সর্ব প্রথম মা'বুদের দিকে নিবিষ্ট রাখা উচিত।

ح : وجهُ تَفْضِيْلِ قولِ اللّه اِنَّ اللّٰهَ مَعنا على قَوْلِ اللّٰهِ اِنَّ مَعِىَ رَبِّى سَيَهْدِيْنِ

যেহেতু আল্লাহর ধ্যান ও স্মরণে নিমগ্ন হওয়া وُصول اِلى اللّٰه এর ভিত্তি। সর্বস্থায় আল্লাহকে অগ্রগণ্য রাখা, তার স্মরণকে প্রাধান্য দেয়ার মধ্যই সাধনার সার্থকতা। তাই আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বর্ণিত তার প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ (সা) এর উক্তি اِن اللّٰه مَعَنا কে হযরত মূসা (আঃ) থেকে বর্ণিত উক্তি اِنّ مَعِى رَبِّى سيهدين এর উপর প্রাধান্য দেয়া হয়। কেননা اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলাকে আগে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে اِنّ مَعِىَ رَبِّى سَيَهدِيْن এর মধ্যে আল্লাহর পূর্বে নিজেকে তুলে ধরা হয়েছে।

وَجهُ تَقديمِ الْعِبادةِ عَلى الْاِسْتِعَانَة

(استعانة এর উপর عبادة কে مقدم করার কারণ)।

عِبَادَة হলো বান্দার কাজ। পক্ষান্তরে إِسْتِعَانَة এর মধ্যে যে معونة প্রার্থনা করা হয়েছে এ مُعُوْنَة হলো আল্লাহর কাজ। আর বান্দার কাজের উপর আল্লাহর কাজ অগ্রগণ্য হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আয়াতের মধ্যে عبادة কে মুকাদ্দাম করা হয়েছে। আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) এর তিনটি কারণ উল্লেখ করেছেন।

১. পূর্বাপর আয়াতের শেষের ছন্দমিল ঠিক রাখার জন্য। কেননা نستعين কে পূর্বে উল্লেখ করে نَعْبُدُ কে পরে উল্লেখ করলে ছন্দের অন্তমিল ঠিক থাকত না।

২. نعبد কে আগে উল্লেখ করে বান্দাকে এ মর্মে সতর্ক করা হয়েছে যে, প্রার্থনাকারীর জন্য উচিত হলো প্রার্থনা করার পূর্বে কোন ওসীলা পেশ করা। যাদ্বারা আল্লাহ খুশী হন। যেমন তার প্রশংসা-স্তুতি, গুণগান, তার বড়ত্ব বর্ণনা করা, তার ইবাদত করা ইত্যাদি।

৩. বান্দা যখন نعبد বলে عبادة কে নিজের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেছে তখন এর দ্বারা তার মধ্যে অহংকার, গর্ব, আত্মতুষ্টি ভাব সৃষ্টি হয়েছে। ফলে সাথে সাথে نستعين উল্লেখ করে এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, ইবাদতসহ যাবতীয় ভাল কাজ কেবলমাত্র আল্লাহর সাহায্যেই করা সম্ভব। আল্লাহর সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া কোন নেক কাজ হতে পারে না।

س (١٥) : اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ انعمتَ عليهم
الف: اُكتبْ مناسبةَ الآيةِ بمَا قبلَها
ب: ما معنَى الهدايةِ لُغةً واصْطلاحًا ؟ وكمْ قِسمًا لهَا مِنْ حَيْثُ الاَجْنَاسِ الْمترتبةِ عَلَيْهَا وَاىُّ قِسمٍ مِنَ الْهدايَةِ يَختَصُّ بِنَيْلِه الاَنْبِيَاءُ وَالاَوْلِيَاءُ ؟
ج: ما مَعنَى النّعْمَة لُغةً و عُرفًا ؟ ومَن الْمصداقُ فى قولِه تعالَى اَلَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ؟
د: بَيِّنْ اَجْنَاسَ نِعَمِ اللّٰهِ تعالَى مَعَ اَنْوَاعِها مُفصّلاً واذكرْ اَىَّ نَوْعٍ اُرِيدَ فِى هٰذِهِ الآيةِ ولِمَ ؟
ه: الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ ما هُو وبِاَىِّ طريقٍ يَحْصُلُ؟
و: اَوْضِحِ الْعِبَارَةَ اِيْضَاحًا تامًّا فَالمطلوبُ اِمَّا زِيَادَةُ ....فَنَرَاكَ بِنُوْرِكَ

উত্তর ঃ الف : مُناسبةُ الآيةِ بِمَا قَبْلَهَا **(পূর্বের আয়াতের সাথে অত্র আয়াতের সম্পর্ক) ঃ**

আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) বক্ষমান আয়াতের সাথে পূর্বের আয়াতের সম্পর্ক দু'ভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ ১. بيانٌ لِلْمَعُوْنَةِ الْمَطْلُوْبَةِ

২. اِفْرَادٌ لِّمَا هُوَ الْمَقْصُوْدُ الاَعْظَمُ

ব্যাখ্যা ঃ ১. পূর্বের আয়াতে আল্লাহর সমীপে সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজে বা ইবাদতের ক্ষেত্রে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছে। বক্ষমান আয়াতে উক্ত সাহায্যের বিবরণ দেয়া হয়েছে অর্থাৎ পূর্বের আয়াতে যখন বান্দা আল্লাহর দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করছে তখন যেন আল্লাহ তাকে প্রশ্ন করছেন যে, আমি কিভাবে তোমার সাহায্য করব? উত্তরে বান্দা বলছে, সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ বা ইবাদতে সরল সঠিক পুণ্যপন্থা দেখিয়ে আপনি আমাকে সাহায্য করুন।

২. অথবা পূর্বের আয়াতে বান্দা আল্লাহর কাছে সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাহায্য প্রার্থনা করেছে, আর অত্র আয়াতে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ হেদায়েত বা সরল সঠিক পূন্যপন্থার দিশাকে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, এটাকে আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) اِفْرَادٌ لِمَا هُوَ الْمَقْصُوْدُ الاعظم। তথা মহান উদ্দেশ্য ও অভীষ্ট লক্ষ্যকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ কথার মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন।

★ ف : هِدَايَةٌ لُغَةً معنى الهداية (هِدَايَة এর আভিধানিক অর্থ) ঃ هِدَايَةٌ শব্দটি বাবে ضَرَبَ এর মাসদার এর আভিধানিক অর্থ হল اَلدَّلَالَةُ পথ দেখানো। তবে এটা রূপকভাবে অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। আল্লামা সাইয়্যিদ আমীমুল ইহসান (রহঃ) اَلْوَصَّاف عَلَى الكَشَّاف গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, الهِدَايَة শব্দটি কুরআনে আঠারটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণত :

১. اَلثَّبَاتُ অর্থাৎ দৃঢ়তা। যেমন اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

২. اَلدِّيْنُ অর্থাৎ জীবন ব্যবস্থা। যেমন اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ

৩. اَلْبَيَانُ বা বর্ণনা। যেমন اُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ

৪. اَلتَّوْبَةُ বা প্রত্যাবর্তন করা। যেমন اِنَّا هُدْنَا اِلَيْكَ

৫. اَلْاِيْمَانُ ঈমান। যেমন يَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًى ইত্যাদি

معنى الهداية شرعا (هداية এর শরয়ী অর্থ) ঃ الهداية এর শরয়ী সংজ্ঞায় আল্লামা কাযী বায়যাবী (রহঃ) বলেন, هِيَ الدلالة بِلُطْفٍ سَوَاءٌ كَانَتْ مُوصِلَةً اَوْ غَيْرَ مُوصِلَةٍ অর্থাৎ স্নেহশীলতার মাধ্যমে পথ প্রদর্শন করা চাই তা গন্তব্য পৌঁছিয়ে দিক বা না দিক।

উপরোক্ত সংজ্ঞানুযায়ী هداية দু'ভাগে ভাগ করা যায়

১. اِرَائَةُ الطَّرِيْقِ اِلَى الْمَطْلُوبِ অর্থাৎ অভীষ্ট লক্ষ্যের প্রতি পথ প্রদর্শন করা।

২. اِيْصَالُ اِلَى الْمَطْلُوبِ অভীষ্ট লক্ষে পৌঁছে দেয়া। প্রথম প্রকার হিদায়েত কুরআন ও রাসূলের দ্বারাও হতে পারে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকার হিদায়েত একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য খাস। غَيْرُ اللّٰه দ্বারা এটা সম্ভব নয়।

اَقْسَامُ الهِدَايَةِ بِاعْتِبَارِ الْاَجْنَاسِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهَا (হেদায়েতের প্রকারভেদ) ঃ

আল্লাহ্ তা'আলার হিদায়েত অসংখ্য نوع বা শ্রেণীতে বিভক্ত যা গণনা করা দুঃসাধ্য। তবে এটাকে جنس হিসেবে চার স্তরে ভাগ করা যায়। যথা ঃ

১ম স্তরের হিদায়েত ঃ বান্দাকে এমন শক্তি-সামর্থ দানকরা যা দ্বারা সে নিজের জন্য কল্যাণকর বস্তুসমূহ কি তা জানতে পারে। আর তাহলো বুদ্ধিমত্তা গোপনেন্দ্রিয় (যেমন ক্ষুধা, তৃপ্তি ইতাদি অনুভব করার শক্তি) ও বাহ্যেন্দ্রিয় (যেমন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ইত্যাদি।)

২য় স্তরের হিদায়েত ঃ সত্য-মিথ্যা, হক বাতিল, নিষ্ট অনিষ্ট এর মাঝে পার্থক্য বিধানের জন্য বৈশ্বিক বা দৈহিক প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠা করা। এ দ্বিতীয়স্তরের

হিদায়েতের প্রতি ঈঙ্গিত করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ এবং فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى

৩য় স্তরের হিদায়েত ঃ নবী-রাসূল প্রেরণ করে, ঐশী গ্রন্থ অবতরণ করে মানুষকে সরল পথের দিশা দেয়া। যেমন আল্লাহর বানী وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِأَمْرِنَا এবং وَإِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ أَقْوَمُ ইত্যাদিতে এ স্তরের হিদায়েতের কথাই বলা হয়েছে।

৪র্থ স্তরের হিদায়েত ঃ বান্দার অন্তকরণে সূক্ষ্ম ও গুঢ় রহস্যের বিকাশ ঘটানো এবং বস্তুসমূহকে তার বাস্তব অবস্থায় প্রদর্শন করা। হিদায়েতের ৪র্থ স্তর নবী - রাসূল হলে وحى এর মাধ্যমে প্রদান করা হয়। আর ওলী বুযুর্গ হলে ইলহাম ও সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে করা হয়। তাই হিদায়েতের ৪র্থ স্তর কেবলমাত্র নবী-রাসূল ও ওলী-বুযুর্গরাই অর্জন করতে পারেনা।

ج : مَعْنَى النِّعْمَةِ **(نعمة এর পরিচয়) ঃ** نِعْمَةٌ শব্দটি فِعْلَةٌ এর ওযনে। আর فِعْلَةٌ ওযনে যে শব্দ আসে তা هَيْئَةٌ বা অবস্থা বুঝায়। তাই আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) نِعْمَةٌ এর আভিধানিক অর্থ সম্পর্কে বলেন, هِيَ الْحَالَةُ الَّتِيْ يَسْتَلِذُّهَا الْاِنْسَانُ অর্থাৎ মানুষের সুখী অভাবমুক্ত প্রফুল্ল উপভোগ্য অবস্থাকে নিয়া'মত বলে। পরবর্তীতে যে সকল বস্তু থেকে মানুষ স্বাদ ভোগ করে তাকে নিয়া'মত বলে। আর নিয়া'মত শব্দের মূল অর্থ হল اَللِّيْنُ বা নম্রতা ও কোমলতা।

১. أَقْسَامُ النِّعْمَةِ **(نعمة এর প্রকারভেদ) ঃ** আল্লাহর নিয়ামত অগণিত অসংখ্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, وَإِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا (যদি তোমরা আল্লাহর নিয়া'মতরাজি গণনা কর তাহলে তোমরা সক্ষম হবে না) তথাপি নিয়ামত দু'শ্রেণীতে বিভিক্ত ১. دُنْيَوِى (পার্থিব) ২. أُخْرَوِىٌّ (পারিত্রিক) পার্থিব নিয়া'মত আবার দু' প্রকার। ১. مَوْهِبِى (আল্লাহ প্রদত্ত) ২. كَسْبِى (উপার্জিত)। مَوْهِبِى নিয়ামত আবার দুই প্রকার ঃ

১. رُوْحَانِى (আত্মিক)

২. جِسْمَانِى (দৈহিক)।

رُوْحَانِى নিয়া'মত যেমন মানুষের ভিতর রূহ ফুঁকা, জ্ঞান-বুদ্ধি ও তার পারিপার্শ্বিক বিষয়াদি দান করা। আর جِسْمَانِى নিয়া'মত যেমন মানুষের দেহ সৃষ্টি করা, তার মধ্যে শক্তি দান করা এবং দেহের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, যেমন সুস্থতা-অসুস্থতা ইত্যাদি।

كسبى নিয়া'মত আবার দুই প্রকর ১. رُوحَانِى যেমন সকল মন্দ স্বভাব থেকে আত্মশুদ্ধি লাভ করা এবং আত্মাকে প্রশংসনীয় চরিত্র ও উত্তম গুণাবলীতে শোভিত করা। ২. جِسْمَانِى (দৈহিক) যেমন দেহকে প্রিয় ও উত্তম সজ্জায় সজ্জিত করা এবং সম্মান- প্রতিপত্তি ধন-ঐশ্বর্য অর্জন করা।

اخروى (পারিত্রিক) নিয়া'মতের দৃষ্টান্ত হল, বান্দার সকল ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করা এবং তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাকে ইল্লিয়্যীনের সুউচ্চ আবাস স্থলে ফেরেশতাদের সাথে চিরস্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করা।

★ اَلنِّعْمَةُ الْمَطْلُوْبَةُ فِى الْاٰيَةِ (আয়াতে কাঙ্খীত নেয়ামত) ঃ

বক্ষমান আয়াতে উদ্দিষ্ট নিয়ামত হলো اخروى (পারিত্রিক) নিয়ামত এবং دنيوى (পার্থিব) নিয়ামতের মধ্যে ঐ প্রকার নিয়ামত উদ্দেশ্য যা اخروى নিয়া'মত লাভের জন্য সহায়ক হয়। যেমন আত্মশুদ্ধি, উত্তম চরিত্র ও গুণাবলী অর্জন করা। কেননা এ দুই ধরনের নিয়া'মত ব্যতীত অন্য সকল প্রকার নিয়া'মত মু'মিন কাফির সবার জন্য অবারিত। অতএব তা দ্বারা মুমিনের কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য লাভ হয় না।

ও : اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ দ্বারা উদ্দেশ্য বা এর المِصْدَاق

আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ আয়াতের নিয়া'মত প্রাপ্তদের ব্যাপারে তিনটি উক্তি উল্লেখ করেছেন

১. নবী রাসূলগণ।

২. হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আঃ) এর দ্বীন ও শরীয়ত বিকৃত হওয়ার পূর্বেকার তাদের উম্মতগণ।

৩. সাধারণ মুমিনগণ।

কিন্তু জমহুর মুফাসসিরগণের মতে এরা হলেন নবী রাসূলগণ, সিদ্দীকগণ এবং সালহগণ যাদের ব্যাপারে কুরআনের অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে।

اُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ انْعَمَ اللّٰه عَلَيْهِم مِن النَّبِيِّيْن وَالصِّدِّيْقِيْن وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِين

হাদিসে বর্ণিত আছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّه فَسَّره بِالْمَسْئَلةِ وَالنَّبِيِّيْنَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِيْن

المرادُ بِصراطَ الْمُسْتَقِيم (صراط المستقيم দ্বারা উদ্দেশ্য) ঃ :

صِراطَ الْمُسْتَقِيم দ্বারা কি উদ্দেশ্য এ সম্পর্কে বিজ্ঞ মুফাসসির দুটি অভিমত উল্লেখ করেছেন।

১. هُوَ طرِيقُ الحَق অর্থাৎ সত্যের পথ। যা সকল নবী-রাসূলগণের দ্বীনকে বুঝায়।

২. مِلَّة الاسلام ইসলাম ধর্ম। অর্থাৎ রাসূল (সা.) কর্তৃক আনিত জীবন ব্যবস্থা।

প্রশ্নোল্লেখিত ইবারতে ব্যাখ্যা ঃ

উক্ত ইবারতে একটি প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হল, বান্দা যখন আল্লাহর তা'রীফ ও তার গুণকীর্তন করল। আল্লাহকেই একমাত্র উপাস্য বলে স্বীকৃতি দিল এবং তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে নিজেকে তার হাতে সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করল। এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে,, সে মু'মিন তথা হিদায়েত প্রাপ্ত। অতএব বান্দা হিদায়েত প্রাপ্ত হওয়া সত্তেও পুনঃ আল্লাহর কাছে হিদায়েত প্রার্থনা করা অনর্থক নয় কি? এ প্রশ্নের জবাবে আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) বলেন, হিদায়েতের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। অতএব হিদায়েত প্রাপ্ত মু'মিনের হিদায়েত প্রার্থনা করার উদ্দেশ্য হল, ১. প্রাপ্ত হিদায়েতের বৃদ্ধি কামনা করা। ২. অথবা হিদায়েতের উপর অটলতা কামনা করা। ৩. অথবা প্রাপ্ত হিদায়েতের উপরস্থ স্তর প্রার্থনা করা। অতএব وصول الى الله তথা আল্লাহ তাআলার مشاهده ও معاينه এর স্তরে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি যদি হিদায়েত প্রার্থনা করে তাহলে তার উদ্দেশ্য হবে سير فى الله এর রাস্তার পথ প্রদর্শন কর, যাতে আমাদের অন্ধকার অবস্থা নিঃশেষ হয়ে যায় এবং দৈহিক যবনিকার অবসান ঘটে। ফলে আমরা আপনার পবিত্র সত্তার জ্যোতিষ্মান আলো থেকে আলো আহরণ করতে পারি এবং আপনার নূর দ্বারা আপনাকে দেখতে পারি।

عارف এর পরিচয়

সুফিগণের পরিভাষায় عارف ঐ ব্যক্তিকে বলে যিনি খোদায়ী গুঢ় রহস্য সম্পর্কে অবগত।

وَاصِل اِلَى اللّٰه। যে مُشَاهَدَه ও مُعَايَنَه এর স্তরে পৌঁছেছে। وَاصِل যিনি আল্লাহর مشاهده ও مُعَايَنه এর স্তরে পৌঁছেছেন।

سير দুই প্রকার। ১. سَيْر اِلَى اللّٰه ২. سير فى الله - سيرِ الى الله বলা হয় সৃষ্টিকূল পরিত্যাগ করে আল্লাহর مشاهده ও معاينه হাসিলের লক্ষে সাধনা করা। سير الى اللّٰه এর শেষে فناء এর স্তর রয়েছে। কেননা

তখন غير الله এর প্রতি দৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে খতম হয়ে যায়। এর পরেই আরম্ভ হয় سير فى الله এর স্তর।

সুফীবাদীদের পরিভাষায় سير হলো অদৃশ্য জগতের আশ্চার্য বিষয়াবলীর বিকাশ লাভ করে পরিপূর্ণভাবে গ্রথিত হওয়া। যার ফলে সাধক غير الله কে পরিত্যাগ করে আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট হয় এমন কি সকল বস্তুর মধ্য সে আল্লাহর অস্তিত্বের সন্ধান লাভ করে।

سير فى الله হলো আল্লাহর গুণাবলী ও তার চরিত্র অর্জন করা। আর আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী যেহেতু অপরিসীম তাই سير فى الله এর স্তরও অপরিসীম।

س (١٦) : غَيْرِالْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ

الف : مَنْ هُمُ الْمُرَادُ فِى قوله تعالى غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِم وَلا الضَّالِّيْنَ؟

ب : غيرِالْمَغْضُوْبِ مَا مَحلُّه مِنَ الْاِعْرَابِ؟

ج : مَامَعْنى غَضَبِ اللّٰه؟ وكيفَ صحَّ صفتُه تَعالى بِالْغَضَبِ وهوَ منَ الْاَعْراضِ النَّفْسَانِيَّةِ؟

د : كيفَ صحَّ ان يَقعَ كلمةُ غيرُ صِفةَ الْمَعْرِفَةِ وهو لايَتَعَرَّفُ وان اُضِيفَ الى الْمَعْرِفَةِ -

উত্তরঃ المغضوب عليهم এর الضالين দ্বারা কারা উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) দুটি অভিমত তুলে ধরেছেন,

১. المغضوب عليهم দ্বারা ইয়াহুদ জাতি উদ্দেশ্য। কেননা ইয়াহুদীদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, مَنْ لَعَنَهُ اللّٰه وَغَضِبَ عَلَيْهِ এতে তাদের ব্যাপারে غضب শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

আর الضالين দ্বারা খৃস্টান জাতি উদ্দেশ্যে। কেননা তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেন। قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوا كَثِيْرًا এতে খৃষ্টানদের ব্যাপারে ضَلَالَة শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

২. المَغْضُوب عَلَيْهِم দ্বারা পাপিষ্ঠলোক উদ্দেশ্য। আর الضالين দ্বারা আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞলোক উদ্দেশ্য। কেননা مُنْعَم عليهم হলো

যাদেরকে আল্লাহর পবিত্র সত্তার পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞান এবং সৎকর্ম সম্পাদনের তওফীক দান করা হয়েছে।

অতএব এর বিপরীতে কর্মগত অপরাধীকে ফাসিক (পাপিষ্ঠ) এবং المغضوب عليهم বলা হয়। কেননা ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারী সম্পর্কে কুরআনে পাকে ইরশাদ হয়েছে غضب الله عليهم আর বিশ্বাসগত অপরাধীকে ضالين বলা হয়। কারণ কুরআনের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلَالُ

"ب" غَيْر শব্দের إِعْرَابْ ও قِرَآت

غَيْر শব্দটিতে দু'টি قرآت রয়েছে। ১। غير শব্দটি جر দিয়ে পড়া। غير শব্দে جر দুই কারণে হতে পারে।

ক. পূর্ববর্তী الذين এর بدل হিসেবে।

খ. কারো কারো মতে عليهم এর যমীর থেকে بدل হিসেবে।

২. غير শব্দটি نصب দিয়ে পড়া। এমতাবস্থায় তারকীবের দিক দিয়ে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে।

১. عليهم এর যমীর থেকে حال হয়েছে।

২. اعنى উহ্য ফেলের مفعول হয়েছে।

৩. استثناء এর কারণে।

ج : معنى غضب الله (غضب الله এর অর্থ)

غضب শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, ثَوْرَانُ النَّفْسِ عِنْدَ اِرَادَةِ الْاِنْتِقَامِ অর্থাৎ প্রতিশোধ গ্রহণকালে মনে উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়া বা ভীষণ রাগান্বিত হওয়া।

এখানে একটি প্রশ্ন হলো غضب তথা মনের উত্তেজনা বা রাগান্বিত হওয়া একটি عرض যা অপরের সাহায্যে কায়েম হয়। সুতরাং এটা কিভাবে আল্লাহর গুণ হতে পারে? এর উত্তর হলো غضب শব্দটি যখন আল্লাহর জন্য ব্যবহার করা হয় তখন غضب এর ফলাফল অর্থাৎ انتقام বা প্রতিশোধ গ্রহণ উদ্দেশ্য হয়। অর্থাৎ غضب শব্দটি আল্লাহর জন্য রূপকার্থে (مجاز) ব্যবহার হয়েছে।

د : صِحَّةُ وُقُوْعِ لَفْظِ غَيْرَ صِفَةً لِلْمَعْرِفَةِ وَهُوَ لَا يَتَعَرَّفُ وَاِنْ اُضِيْفَ اِلَى مَعْرِفَةٍ -

উল্লেখ্য যে, غيرالمغضوب عليهم এর কয়েকভাবে তারকীব হতে পারে। তন্মধ্যে একটি হলো, এটা পূর্বোক্ত الذين انعمت عليهم থেকে

صفت হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো الذين ইসমে মাওসূল মা'রিফা। আর غير শব্দটি নাকিরা। কেননা غير শব্দটি معرفه এর দিকে مضاف হওয়া সত্ত্বেও معرفه হয় না। বরং نكره থাকে, তাহলে نكره কে معرفه এর صفت কিভাবে বলা যাবে?

এ প্রশ্নের দুটি উত্তর দেয়া যেতে পারে

প্রথমতঃ اِجْرَاءُ الْمَوصولِ مَجْرى النَّكِرَةِ তথা اَلَّذِيْنَ ইসমে মাওসূলকে نكره এর স্থলাভিষিক্ত বানানো হবে। অর্থাৎ নিয়া'মতপ্রাপ্ত কারা বা কোন যুগের এটা যেহেতু নির্দিষ্ট নয়। তাই اَلَّذِيْنَ ইসমে মাওসূল হওয়া সত্ত্বেও نكره রয়েছে। তাই غير শব্দটি نكره হওয়া সত্ত্বেও الذين এর صفت হতে পেরেছে। যেমন ভাবে وَلَقَدْ اَمُرُّ عَلَى اللَّئِيْمِ يَسُبُّنِىْ এখানে اَللَّئِيْم শব্দে ال হওয়া সত্ত্বেও শব্দটি নাকিরা হিসেবে গণ্য।

দ্বিতীয়তঃ جُعْلُ غَيْرَ مَعرِفَةً بِالْاِضَافَةِ لِاَنَّه اُضِيْفَ اِلٰى مَالَهُ ضِدٌّ واحد অর্থাৎ غير কে اضافت এর মাধ্যমে معرفة বানানো হয়েছে। কেননা এটাকে এমন বস্তুর দিকে اضافت করা হয়েছে যার মাত্র একটাই প্রতিপক্ষ রয়েছে। আর তা হলো اَلْمُنْعَمُ عَلَيْهِم বা নিয়া'মত প্রাপ্তগণ। সুতরাং এখানে غير এর অনির্দিষ্টতা ধর্তব্য নয়। যেমন غيرِ سُكُون বা শান্ত না হওয়া মানেই গতিময়তা।

س (١٧) : اَلٓمّٓ ذَالِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

الف : اَلٓمّٓ اىَّ قِسْمٍ مِّنْ اَقْسَامِ الْكَلِمَةِ الثَّلَاثِ؟ اِنْ كانَ اِسْمًا فَمَا معنٰى قوله اَلِفٌ حَرَفٌ الخ وَاِنْ كَانَ حَرْفًا فكَيْفَ قولُ الْمُفَسِّرِ اَسْمَاءُ مُسَمَّيَاتُهَا الخ اَوْضِحِ الْجوابَ؟

ب : الحُرُوفُ الْمُقَطَّعَاتُ مَاهِىَ ولِمَ اُفْتُتِحَتْ سُوْرَةُ الْقرانِ بِها ؟

ج : اَلٓمّٓ وغَيْرُهَا مِنَ الْمُقَطَّعَاتِ مُعربَةٌ او مَبْنِيَّةٌ؟ اَجِبْ مع بيانِ الْوجه ـ

د : كم سُورَةً اُفْتُتِحَتْ بِالْمُقَطَّعَات وكم مِنْ حُروفِ الْمعجمِ؟

ه : اِلاَمَ اَشارَ بقولِهِ "ذَالِكَ" وكَيْفَ؟

و : مَا معنى الرَّيْبِ ومَا المرادُ بِهِ هِنَا ؟

ز : كم مَعنىً لِلْهِدايَةِ ومَا هِيَ ومَا المرادُ هِنَا ؟

ح : كيفَ قال هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ بِالْعُمُوْمِ مَعَ اَنّ فِيهِ الْمُجْمَلُ وَ الْمُتَشَابِهُ؟

ت : اَعْرِبْ قولَهُ تعَالٰى الٓمٓ ذَالِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ -

ى : مَا مُعْنَى التَّقْوٰى لُغةً وعُرْفًا ومَرَاتِبُ التَّقْوٰى كَمْ هِيَ ومَا هِيَ بَيِّنْ كما بَيَّنَ الْقاضي؟

ك : ما مَعنى الكتابِ اَصْلًا و عُرْفًا وكَيْفَ يُطْلَقُ عَلٰى الْمَنْظُومِ؟

ل : كيفَ نَفْى الرَّيْبَ مِنَ الْقُرْاٰنِ مُطْلَقًا مَعَ اَنَّ الْمُرْتَابِيْنَ فِيهِ اَكْثَرُ من غَيْرِ الْمُرْتَابِيْنَ؟ اَجِبْ على نَهْجِ المفسّرِ العلّامِ -

م : لِمَ تُسَمّى الشَّكُّ بالرَّيْبِ؟ وَلِاَىِّ غرضٍ اتى البَيْضَاوى حديثَ دَعْ مَا يُرِيْبُكَ اِلٰى مَا لَايُرِيْبُكَ ؟

আলিফ-লাম-মীম। পবিত্র কুরআনের ২৯টি সূরার শুরুতে এ ধরনের حروف الفاظ تَهَجِّى مُقَطَّعَاتْ তথা স্বতন্ত্র উচ্চারিত বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা রয়েছে। এ গুলো اسم (বিশেষ্য) এর مُسَمّٰى ও مَدْلول হল আরবী বর্ণমালাসমূহ যা দ্বারা আরবী শব্দমালা গঠিত হয়। এগুলো اسم (বিশেষ্য) হওয়ার স্বপক্ষে আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) তিনটি প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

১. এগুলো اسم এর সংজ্ঞার আওতাভুক্ত। কেননা যে كلمه স্বনির্ভর অর্থ প্রদান করে এবং তিন কালের কোন কালের সাথে সম্পর্ক রাখে না তাকে اسم বলে। আর الفاظ تهجّى গুলোও স্বনির্ভরভাবে কোন কালের সাথে সম্পৃক্ততা ব্যতীতই حروف مبانى বুঝায়। অতএব এগুলো اسم এর সংজ্ঞার আওতাভুক্ত।

২. এগুলোর মধ্যে اسم এর বিশেষ বৈশিষ্টাবলী পাওয়া যায়। যেমন– মা'রিফা হওয়া, নাকিরা হওয়া। একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন ইত্যাদি হওয়া।

৩. ইমামুন্নাহ খলীল ইবনে আহমদ এবং আবূ আলী (রহঃ) এগুলো اسم হওয়ার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়। তাহলো হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন–

مَنْ قَرأ حَرْفًا مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لاَ أَقُوْلُ الٓمٓ حَرفٌ بَلْ اَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ ومِيْمٌ حَرْفٌ

এ হাদীসে حروف هجاء কে حرف বলা হয়েছে। অতএব এগুলো اسم হওয়ার দাবী করা বাতিল হয়ে গেল। এর উত্তরে আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) বলেন–

المرادُ بِهِ غيرُ الْمَعْنَى الَّذِى اُصْطُلِحَ عَلَيْهِ فانّ تَخْصِيْصَ الْحَرْفِ به عُرْفٌ مُجَدَّدٌ

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদীসে হরফ দ্বারা নাহবীদের পারিভাষিক حرف উদ্দেশ্য নয়। কেননা حرف এর এ সংজ্ঞা নব সৃষ্টি যা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর যুগে ছিল না। বরং আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য। حرف এর অভিধানিক অর্থ كلمه (শব্দ) طرف (অংশ)। অথবা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এগুলোকে রূপকভাবে مدلول অর্থাৎ حرفِ هِجَاء এর নামে নামকরণ করেছেন।

★ "ب" আল কুরআনের ২৯টি সূরার প্রারম্ভে আলিফ-লাম-মীম এ ধরনের হরফ স্থান পেয়েছে। ইলমে তাফসীরের পরিভাষায় এগুলোকে الحروف المُقَطَّعَات বা স্বতন্ত্র উচ্চারিত বিচ্ছিন্ন শব্দমালা বলে।

حُروفِ مُقَطَّعات দ্বারা সূরা আরম্ভ করার হেতু বর্ণনায় আল্লামা কাযী বায়যাবী (রহঃ) দু'টি কারণ প্রদর্শন করেছেন।

১. اِيقَاظًا لِمَنْ تَحَدّى بِالْقُرْاٰنِ অর্থাৎ কুরআনের সত্যতা নিয়ে কাফিরদের সন্দেহ পোষণ করায় আল কুরআন তাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ করেছিল। এসব حرف ব্যবহার করে তাদের বোধোদয় ঘটানো হয়েছে এবং তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, এখানে যে সকল বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা উল্লেখ করা হয়েছে এ গ্রন্থখানি مؤلّف من جنس هذه الحروف তথা সে সকল বর্ণমালা দ্বারাই গঠিত। আর এ সকল হরফ তোমরা নিজেদের কথোপকথোন, রচনা ও সাহিত্য সৃষ্টিতে ব্যবহার করে থাক। এ পবিত্র গ্রন্থ যদি আল্লাহর কিতাব না হয়ে মানব রচিত হতো তাহলে তোমরাও অবশ্যই অনুরূপ গ্রন্থ রচনা করতে পারতে।

২. حروف مقطعات দ্বারা আরম্ভ করার আরেকটি কারণ হলো এই যে,

لِيَكُوْنَ أَوَّلَ مَايَقْرَعُ الْأَسْمَاعَ مُسْتَقِلاًّ بِنَوعٍ مِّنَ الْإِعْجَازِ ـ

অর্থাৎ সূরার প্রারম্ভকালেই যে বিচ্ছিন্ন বর্ণের নাম তাদের বর্ণকুহরে প্রবেশ করে তা যেন স্বতন্ত্রভাবে মু'জিযারূপে প্রকাশিত হয়। কেননা এ বর্ণগুলোর স্বনামে সঠিক উচ্চারণ কেবল মাত্র লেখাপড়া জানা ব্যক্তির দ্বারাই সম্ভব। পক্ষান্তরে নিরক্ষর ব্যক্তির থেকে এর উচ্চারণ নিশ্চয় অস্বাভাবিক ব্যাপার। আর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যেহেতু امى তথা নিরক্ষর ছিলেন। তাই তার দ্বারা এগুলো উচ্চারণ হওয়া তার অলৌকিকত্বের প্রমাণ বহন করে এবং আল কুরআন আল্লাহর কিতাব হওয়া বুঝায়।

"ج" আলিফ-লাম-মীম এবং অপরাপর حروف مقطعات মু'রাব না মাবনী এ সম্পর্কে আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) বলেন– এ হরফগুলোর সাথে যখন عوامِل সংযুক্ত না হবে। অর্থাৎ قَبْل التركيب এ গুলো مبنى হবে। (عامل) এর مفعوليّت ـ فاعليّت ـــ مقتضى اعراب এবং اعراب مُوجِب اضافت না পাওয়া যাওয়ার কারণে মবনী।

তবে مبنى اصل এর সাথে সামঞ্জশীল না হওয়ার কারণে এবং اعراب গ্রহণের যোগ্যতা থাকার কারণে মু'রাব।

উল্লেখ্য যে, ওয়াকফ অবস্থায় এগুলোর শেষে যে ساكن হয় তা سكون اجتماع بناء নয়। বরং এটা سكون وقف، اَمِيْن، هٰؤُلَاءِ ইত্যাদির শেষে ساكنين থেকে বাচার জন্য যেরূপ হরকত দেয়া হয়। اسماء حروف এর শেষে اجتماع ساكنين থেকে বাচার জন্য হরকত দেয়া হয় না। এর দ্বারা অনুমিত হয় যে, এগুলো معرب ـ مبنى নয়।

★ "د" পবিত্র কুরআনের ২৯টি সূরার প্রারম্ভে যে حروف مقطعات ব্যবহার করা হয়েছে। এতে সর্বমোট ১৪টি বর্ণ রয়েছে।

ذالك দ্বারা কিসের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে।

১. الم এর তাফসীর যদি ১. المُؤَلَّفُ مِنْ هٰذه الحُروف বাক্যের দ্বারা করা হয় ২. অথবা السورة দ্বারা করা হয় ৩. অথবা القران দ্বারা করা হয় তাহলে ذالك এর مُشار اليه হবে الم

২. الم এর তাফসীর যদি উল্লেখিত তিনভাবে না করে অন্যভাবে করা হয় তাহলে ذَالِك এর مُشاراليه হবে الكتاب-الٓمٓ হতে পারবে না। এমতাবস্থায় الكتاب দ্বারা উদ্দেশ্য হবে, ঐ কিতাব ইতিপূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে انّا, سَنُلْقِىْ عَلَيْك قولاً ثَقِيلاً এর মাধ্যমে যা অবতীর্ণ করার অঙ্গিকার আল্লাহ

তায়ালা করে ছিলেন। অথবা ঐ কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জীলে যা অবতীর্ণ করার ওয়াদা করা হয়েছে।

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় তাহলো আলোচ্য আয়াতে ذالك এর مشار اليه নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও اسم اشارة للبعيد ব্যবহার করা হল কেন?

আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) এর দু'টি জবাব দিয়েছেন। **প্রথমতঃ** যখন الم উচ্চারণ করেছেন এবং খতম হয়ে গেছে এখন তা বক্তার থেকে দূরে চলে গেছে। বিধায় اسم اشارة للبعيد ব্যবহার করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হবার পর যেহেতু مرسل তথা (প্রেরণকারী) থেকে مرسل اليه তথা প্রাপকের নিকট পৌছে গেছে। এবং উভয়ের মাঝে দূরত্ব সৃষ্ট হয়েছে সেহেতু এখানে اسم اشارة للبعيد ব্যবহার করা হয়েছে।

তৃতীয়তঃ আরো একটি উত্তর রয়েছে তাহলো مشار اليه উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হওয়ার কারণে তার সম্মানার্থে اسم اشارة للبعيد ব্যবহার করা হয়েছে।

★ معنى الرَّيْب (الرَّيْب এর অর্থ) ঃ الرَّيْب শব্দটি - رَابَ يَرِيْبُ (বাবে ضَرَبَ) এর মাসদার। এর শাব্দিক অর্থ হল قَلَقُ النَّفسِ واضْطِرابُها অর্থাৎ মনের ব্যাকুলতা ও অন্তরের অস্থিরতা। যেমন আরবী ভাষীরা বলেন– رَابَنِى الشَيئُ (অমুক বস্তুটি আমাকে অস্থির করে তুলেছে)। সন্দেহ সংশয় যেহেতু মানুষকে ব্যাকুল ও অস্থির করে তোলে তাই সন্দেহ-সংশয়কে আরবী-ভাষায় الرَّيب বলা হয়। যেমন– হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে। دَعْ مَا يُرِيْبُكَ اِلٰى مَالَا يُرِيْبُكَ،فَاِنَّ الشَّكَّ رِيبَةٌ والصِّدقُ طمانِينَةٌ অর্থ– যা তোমাকে চিন্তান্বিত করে তা বর্জন করে যা তোমাকে চিন্তান্বিত করে না তা গ্রহণ করা। কেননা সন্দেহ বিপন্নকারী আর সততা প্রশান্তিদায়ক"। উক্ত হাদীসে সন্দেহ ও সংশয়কে رِيْبَةٌ বলা হয়েছে। এখানে ريبة ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সন্দেহ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। কেননা ريبة শব্দটি এখানে সন্দেহ অর্থ হলে اَسَدٌ غَضَنْفَرٌ বাক্যের মত موضوع ও محمول সমার্থবোধক হওয়ার কারণে كلام غير مفيد হত। মসিবত ও দুর্বিপাক অন্তরে অস্থিরতা সৃষ্টি করে বিধায় কালের দুর্বিপাককে رَيْبُ الزَّمانِ বলা হয়। আমাদের এ আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হল যে, رَيْب এর মূল অর্থ হল মনের ব্যাকুলতা ও অন্তরের অস্থিরতা। অবশ্য لَا رَيبَ فِيْه আয়াতে ريب সন্দেহ ও সংশয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ل : كيف نُفِىَ الرَّيْبُ مِن القران مُطلقاً مع اَنَّ الـمُرتابِيْنَ فيه اكثرُ مِنْ غيرِ الْمرتابِيْنَ اُجِبْ على نهجِ الْمفسِّر العلاّم ۔

আল্লাহর বাণী لاريب فيه দ্বারা বুঝা যায় কুরআনুল কারীমে কোনরূপ সন্দেহ নেই। অথচ প্রতি যুগে অসংখ্য লোক কুরআনের প্রতি সন্দেহ পোষণকারীদের সংখ্যাই বেশি। তাহলে সাধারণভাবে কুরআনের বাপারে সন্দেহের অস্বীকৃতি করা হল কিভাবে?

তাছাড়া কোরআনের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا

এ দ্বারা বুঝা যায় যে, কুরআন সম্পর্কে মানুষের সন্দেহ থাকতে পারে।

এ প্রশ্নের সমাধান কল্পে তফসীরকারগণ বলেন– বস্তুতঃ অত্র আয়াতে لاريب فيه দ্বারা কুরআনের ব্যাপারে অবিশ্বাসী ও ভ্রান্তবাদীদের থেকে সন্দেহ সংঘটিত না হবার কথা বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে যে, আল কুরআন কোন মানব রচিত গ্রন্থ নয়। বরং তা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এমন এক গ্রন্থ যা সকল সন্দেহ সংশয়ের উর্ধ্বে। কেউ যদি এতে সন্দেহ পোষণ করে তাহলে সেটা হবে অবান্তর বিষয়। কারণ তাতে বাস্তবে কোন সন্দেহ নেই। এ মর্মে আল্লামা বায়যাবী লিখেছেন–

مَعْنَاه اَنَّهُ لِوُضُوْحِه وسُطوعِ بُرْهانِه بِحَيْثُ لايَرْتابُ الْعاقِلُ بَعْدَ النَّظْرِ الصَّحِيْحِ فِى كونِه وَحْيًا بَالِغًا حدَّ الْاِعْجَاز ۔

অর্থাৎ পবিত্র কুরআন এমন একখানি গ্রন্থ, যা স্পষ্টভাষীতায় এবং দালিলিক ও প্রামাণিক সুস্পষ্টতায় এমন স্তরের যে, কোন পরিশুদ্ধ বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি বিশুদ্ধভাবে এ কিতাবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেই বুঝতে পারবে যে, এটা নিশ্চয় আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ঐশী গ্রন্থ; যা মানুষ রচনা করতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। এ কথার অর্থ এ নয় যে, তাতে কেউ সন্দেহ করবে না। অথবা এ আয়াতের অর্থ হল– لاريب فيه للمتقين (এ কিতাবের ব্যাপারে মুত্তাকীদের কোন সন্দেহ নেই।) এমতাবস্থায় فيه শব্দটি ريب এর সিফাত হবে। আর متقين শব্দটি لا এর খবর।

ى : ما معنى التَّقوى لغةً وعُرفًا ومَراتِبُ التَّقوٰى كَمْ هِى وما هى بَيِّنْ كَمَا بَيَّنَ الْقَاضِىْ ۔

مَعْنَى التَّقْوٰى لُغَةً (**তাকওয়ার শাব্দিক অর্থ**) ঃ

تَقْوٰى শব্দটি وَقْىٌ মাসদার থেকে নির্গত। অর্থ কষ্টদায়ক বস্তু থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা। ভীতিপ্রদ বস্তু থেকে আত্মরক্ষা করা। اَلْمَخَافَةُ (ভয় করা) যেমন কুরআনুল কারীমে বর্ণিত আছে– اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ আল্লাহকে যথাযতভাবে ভয় কর।

اَلْحَذَرُ (**সতর্কতা অবলম্বন করা**) ঃ

اَلاجْتِنَابُ (পরিহার করা বিরত থাকা) যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত আাছে। اِتَّقُوا الْحَسَدَ فَاِنَّ الْحَسَدَ يَأكُلُ الْحَسَنَاتِ তোমরা হিংসা পরিহার কর। কেননা হিংসা নেকীসমূহকে ধ্বংস করে।

معنى التقوٰى اِصْطلاحًا (**তাকওয়ার পারিভাষিক অর্থ**) ঃ শরীয়তের পরিভাষায় মুত্তাকীর সংজ্ঞা নিরূপণ করে আল্লামা কাযী বায়যাবী (রহঃ) লিখেন–

وَهُوَ فِى عُرْفِ الشَّرْعِ اسمٌ لِّمَنْ يَقِىْ نَفْسَه عمّا يَضُرُّه فى الاٰخرةِ

تَقْوٰى এর সংজ্ঞা হল اَلاِجْتِنَابُ عَمَّا يضرُّه فِى الْاٰخرةِ – চারিত্রিক জীবনে ক্ষতিকারক বিষয়াবলী থেকে বেচে থাকা।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর মতে هُوَ الامْتِثَالُ لِاَوَامِرِ اللّٰهِ وَالْاِجْتِنَابُ عَنْ نَوَاهِيهِ অর্থাৎ আল্লাহর আদেশাবলীর আনুগত্য করা এবং তার নিষেধাবলী পরিহার করা।

ইমাম রাগিব ইস্পাহানী (রহঃ) বলেন–

وصارَ التّقوٰى فى تعارُفِ الشّرعِ حِفظُ النّفْسِ عمّا يُؤثِمُ وذالِكَ بِتركِ المَحْذورِ

শরীয়তের পরিভাষায় পাপাচার থেকে আত্মরক্ষার নাম তাকওয়া।

مَرَاتِبُ التَّقْوٰى (**তাকওয়ার স্তরসমূহ**) ঃ তাকওয়ার তিনটি স্তর রয়েছে।

১. التَّوَقِّىْ عن العَذابِ المُخَلَّد بالبَرِىِّ عن الشرك অর্থাৎ শিরক হতে বেঁচে থেকে অনন্তকালের শাস্তি থেকে আত্মরক্ষা করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী– اَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى

২. اَلتَّجَنُّبُ عَنْ كُلِّ ما يُؤثِمُ من فعلٍ اَوتَركٍ حتّٰى الصّغائرِ عندَ قَوْمٍ করণীয় কিংবা বর্জনীয় এমন সকল কাজ হতে বিরত থাকা যা মানুষকে

পাপাচারে লিপ্ত করে। কারো কারো মতে সগীরা গুণাহ থেকেও বেচে থাকা। তাকওয়ার এ সংজ্ঞাটিই সুবিদিত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী– وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا

٣. اَنْ يَّتَنَزَّهُ عَمَّا يُشْغِلُ سِرَّهُ عَنِ الْحَقِّ وَلِيَتَقَبَّلَ اِلَيْهِ بِشَرَاشِرِهِ

অর্থাৎ যে সকল বস্তু আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন করে তা পরিহার করে তনুমনে আল্লাহর প্রতি ধাবিত হওয়া। এ স্তরের তাকওয়াই কামেল ও কাম্য। এ প্রসংগেই অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহর বাণী– اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ আল্লাহকে যথাযথরূপে ভয় কর।

প্রশ্ন ঃ ز : ما معنى الْهِدايةِ وما هِىَ وما الْمُرادُ بِها هنَا

مَعْنَى الْهُدٰى لُغَةً (هُدًى এর শাব্দিক অর্থ) ঃ

هُدًى শব্দটি سُرًى (রাত্রিকালীণ ভ্রমণ) ও تُقًى (পরিহার করা) এর ওজনে باب ضرب এর মাসদার। هُدًى অর্থ الدَّلَالَةُ (দেখান, ইঙ্গিত করা) সূরা ফাতিহায় উল্লিখিত اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) বলেন, هدى এর শাব্দিক অর্থ اَلدَّلَالَةُ بِلُطْفٍ স্বস্নেহে পথ প্রদর্শন করা। আর এটা দু'ভাগে হতে পারে। الدَّلَالَةُ بِاِرَاءِ الطَّرِيْقِ اِلَى الْمَطْلُوْبِ। গন্তব্যে পৌছার রাস্তা বাতলে দিয়ে পথ প্রদর্শন করা।

২. الدَّلَالَةُ الْمُوْصِلَةُ اِلَى الْبُغْيَةِ অভীষ্ট লক্ষে পৌছে দেয়া।

প্রশ্ন ঃ لِمَ خُصَّتِ الْهِدَايَةُ بِالْمُتَّقِيْنَ فِى هٰذِهِ الْاٰيَةِ وَقَدْ اَتٰى فِى قَوْلِهٖ تَعَالٰى هُدًى لِّلنَّاسِ

উত্তর ঃ মহাগ্রন্থ আল কুরআন বিশ্ববাসীর হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন। هُدًى لِّلنَّاسِ (মানব জাতির জন্য হেদায়েত স্বরূপ।) তদুপরি বক্ষমান আয়াতে কুরআনের হেদায়েতকে শুধুমাত্র মুত্তাকীনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। এর কারণ হল মুত্তাকীরাই আল কুরআনের মাধ্যমে হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছে এবং তারাই এর যুক্তি প্রমাণ দ্বারা উপকৃত হয়। মুসলিম-কাফির, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সকলের জন্য কুরআনের হেদায়েত পরিব্যাপ্ত হলেও ফলাফলের দিকে বিবেচনা করে একে মুত্তাকীদের জন্য খাস করা হয়েছে। সুতরাং তারাই উল্লেখযোগ্য ও প্রসংশার উপযুক্ত।

কুরআনের হেদায়েতকে মুত্তাকীদের জন্য সীমাবদ্ধ করার আরেকটি কারণ হলো– কুরআনের গবেষণা ও তাতে চিন্তাভাবনা করার পর ঐ ব্যক্তিই কেবল

উপকৃত হতে পারে যে, আপন মন-মস্তিষ্ককে সকল বদ্ধমূল ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-বিশ্বাস, আত্মম্ভরিতা, পূর্ব পুরুষের ভ্রান্ত ধর্ম বিশ্বাস ইত্যাদি) থেকে পবিত্র করার পর উন্মুক্ত ও অনাবিল মন-মস্তিষ্ক নিয়ে কুরআন বুঝার চেষ্টা করবে। কেননা কুরআন হল সুস্বাদু ও শক্তিবর্ধক সুখাদ্যের ন্যায়। যেমনিভাবে শক্তিবর্ধক খাদ্যের দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য উদরাময় রোগ থেকে সুস্থ হওয়া জরুরী। অনুরূপভাবে কুরআন দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য ঈমানের দ্বারা পরিশুদ্ধ মন-মস্তিষ্ক জরুরী। যেমনটি কুরআনে পাকে ইরশাদ হয়েছে- وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি যা আরোগ্য এবং বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ এবং তা যালিমদের ধ্বংসকেই বৃদ্ধি করে।

كَيْفَ قَالَ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ بِالْعُمُوْمِ مَعَ اَنَّ فِيْهِ مِنَ الْمُجْمَلِ وَالْمُتَشَابِهِ؟

প্রশ্ন ঃ পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআনের মধ্যে مُجْمَل ও مُتَشَابِه আয়াত রয়েছে যার অর্থ ও মর্ম মহান প্রভূ আল্লাহ তায়ালা ব্যতিত অপর কেউ জানেনা। তদুপরি বক্ষমান আয়াতে ব্যাপকভাবে সম্পূর্ণ কুরআনকে মুত্তাকীদের জন্য হেদায়েত আক্ষায়িত করার কারণ কি?

উত্তর ঃ এর উত্তরে আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) লিখেন। কুরআনের مجمل ও متشابه আয়াত হেদায়েত হওয়ার পরিপন্থী নয়। কেননা এর গুঢ় মর্ম অনুদঘাটিত নয়। কারণ رَاسِخ فِى الْعِلْم ব্যক্তিবর্গ এর মর্ম সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত।

উল্লেখ্য যে, শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী উক্ত জবাব বিশুদ্ধ হলেও হানাফী মাহযাব অনুযায়ী উক্ত জবাব বিশুদ্ধ নয়। কেননা হানাফীদের মতে مُتَشَابِه আয়াতের মর্ম আল্লাহ ছাড়া অপর কেউ জানেন না। অতএব তাদের পক্ষ থেকে উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর হল- কুরআনের হেদায়েত হওয়ার জন্য তার প্রতিটি অংশ হেদায়েত হওয়া আবশ্যক নয়। বরং বিশেষ তাৎপর্যের কারণে তার কিয়দংশের মর্ম বুঝা মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধির উর্দ্ধে রাখা হয়েছে। যাতে মুকাল্লাফদের মধ্য কে বিনাবাক্যে এর উপর ঈমান আনয়ন করে তা পরীক্ষা হয়ে যায়।

ما معنى الْكِتَاب اِصْطِلَاحًا وعُرْفًا وكيف يُطْلَقُ على المنظوم -

مَعْنَى الْكِتَاب لُغَةً (কিতাবের শাব্দিক অর্থ) ঃ

كِتَاب শব্দটি মাসদার যা اسم مفعول অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব كِتَاب অর্থ مَكْتُوب। অথবা শব্দটি فِعَال এর ওযনে اسم যা اسم مفعول এর অর্থ প্রদান করেছে। যেমন- لِبَاس - مَلْبُوْس এর অর্থে ব্যবহৃত হয়।

كتاب শব্দের মূলধাতু হল الكَتْبُ যার অর্থ الجَمْعُ একত্রিত করা। এ কারণেই সম্মিলিত সেনাদলকে الكَتِيْبَة বলা হয়।

(معنى الكِتاب اِصْطِلاحًا) كتاب এর পারিভাষিক অর্থ) ঃ পরিভাষায় কিতাব বলা হয় ما يُكْتَبُ فِيْه অর্থাৎ যাতে কোন কিছু লিখা হয়। কখনো কখনো লিখার পূর্বেই বক্তার মন মস্তিষ্ক ও চিন্তাধারায় সংগৃহীত তথ্যাবলীর উপর কিতাব শব্দ প্রয়োগ হয়। কেননা তা ভবিষ্যতে লিপিবদ্ধ করা হবে। আরবী অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় এটাকে مُجاز مَا يَؤول বলা হয়।

اَعْرِبْ قَوله الم ذالك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين

উপরোক্ত আয়াতের আট রকম তারকীব হতে পারে।

১ম তারকীব ঃ যদি الم কে حُروفِ مُقَطَّعات গণ্য করা হয় তাহলে তার কোন مَحلِّ اعراب নেই। আর যদি الم কে আল্লাহ, কুরআন বা সূরার নাম গণ্য করা হয় অথবা الم কে যদি المُؤَلَّفُ مِنْ جِنْسِ هٰذِهِ الحُروف এর সংক্ষিপ্তরূপ গণ্য করা হয় তাহলে الم হল مبتدا আর ذالِك الْكتاب ইসমে ইশারা ও مشار اليه মিলে তার خبر – অতএব مبتدا ও خبر মিলে جملةٌ اسمية হয়েছে।

২য় তারকীব ঃ الم মুবতাদা محذوف এর খবর। অর্থাৎ الم দ্বারা কুরআন বা সূরার নাম উদ্দেশ্য হলে পূর্বে هذا মুবতাদা উহ্য হবে। الم তার খবর হবে। আর الم কে الم الخ المُؤَلَّفُ مِنْ جِنْسِ هٰذه ব্যাখ্যা করা হলে اسم اشاره – مبتدا হয়ে مُركَّب توصيفى মিলে مشارٌاليه ও ذالك الكتاب هٰذا – محذوف এর দ্বিতীয় খবর হবে।

৩য় তারকীব ঃ الم দ্বারা কুরআন বা সূরার নাম উদ্দেশ্য হলে পূর্বে هذا মুবতাদা উহ্য হবে। الم তার খবর। আর الم কে المُؤَلَّفُ مِنْ جِنْسِ هٰذه الخ ব্যাখ্যা করা হলে الم – مبدل منه হবে ذالك – مركب توصيفى الكتاب হয়ে الم এর بدل হবে। مبدل منه ও بدل মিলে هذا উহ্য মুবতাদার খবর হবে।

৪র্থ তারকীব ঃ الم মুবতাদা ذالك এর মধ্যে اسم اشاره মুবতাদা الكتاب مشار اليه খবর। মুবতাদা খবর মিলে جملة اسمية হয়ে الم মুবতাদার খবর।

৫ম তাবীর ঃ الم প্রথম মুবতাদা আর . ذالك الكتاب ইসমে ইশারা ও مشار اليه মিলে দ্বিতীয় مبتداء। لاريب فيه পূর্ণবাক্য হয়ে (অর্থাৎ لاے

شبه فعل এর موجود উহ্য শব্দটি فيه এবং اسم তার ريب ও نفى جنس সাথে সম্পর্কিত হয়ে نفى جنس لائے এর খবর। نفى جنس لائے তার اسم ও هدى . هدى للمتقين আর خبر প্রথম হয়ে جملة اسمية মিলে خبر শবে فعل এর شبه فعل মিলে مجرور ও حرف جر – للمتقين ও شبه فعل মাসদার সাথে متعلق হয়ে দ্বিতীয় খবর। পরিশেষে ذالك الكتاب দ্বিতীয় مبتدا ও তার উভয় خبر মিলে جملةُ اسمية হয়ে الم প্রথম মুবতাদার এর খবর। মুবতাদাও খবর হয়েছে।

ষষ্ঠ তারকীব ঃ الم মুবতাদা محذووف এর প্রথম খবর। ذالك ـ ذالك মুবতাদা الكتاب খবর মিলে جملةُ اسميه হয়ে মুবতাদা الكتاب محذوف এর দ্বিতীয় খবর।

৭ম তারকীব ঃ ذالِك الكتابُ لاريب উক্তিটি একটি স্বতন্ত্র বাক্য এবং فيه هدى للمتقين আরেকটি স্বতন্ত্র বাক্য। বিস্তারিত বিশ্লেষণ হল– ذالك শব্দটি ইসমে ইশারা ও الكتاب مشار اليه মিলে مبتدا আর لا হল لائے نفى ريب তার ইসম جنس ও فيه উহ্য خبر মিলে পূর্ণ বাক্য হয়ে احبر অবশেষে مبتداء ও خبر মিলে جملة اسمية – ا

আর فيه هدى للمتقين এর বিশ্লেষণ হল– فيه জার ও মাজরূর মিলে موجود উহ্য شبه فعل এর সাথে متعلق হয়ে خبر مقدم হয়েছে। আর هدى للمتقين . هدى শিবাহ ফে'ল ও للمتقين জার ও মাজরূর মিলে هدى মাসদার شبه فعل এর সাথে متعلق হয়ে مبتداء مؤخر – ا পরিশেষে خبر مقدم ও مبتداء مؤخر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

৮ম তারকীব ঃ الم ذالك الكتاب لاريب فيه هدى للمتّقين এখানে স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ চার জুমলা রয়েছে। আর তাহলো–

১ম জুমলাম ঃ الم। অর্থাৎ الم মুবতাদা محذوف ـ هذا এর খবর হয়ে جملةُ اسميه

২য় জুমলা ঃ ذالك الكتاب অর্থাৎ ذالك মুবতাদা আর الكتاب খবর। جملةُ اسميه خبريه

৩য় জুমলা ঃ لاريبَ فيه। অর্থাৎ لا ـ لائے نفى جنس আর ريب তার اسم ও فيه খবর মিলে جمله اسميه خبريه

৪র্থ জুমলা ঃ هدى للمتقين। অর্থাৎ هدى মুবতাদা, للمُتّقين তার খবর।

س (١٨) : اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ

(الف) مَا معنى الْإِيْمَانِ لُغَةً وشَرعًا عِنْدَ الْبَيْضَاوِى ما الْفرقُ بَيْنَ مَذهَبِه ومَذهَبِ الْجمْهورِ فِى معنىُ الْإِيْمَانِ ومَا هُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ كَ؟ اكتب مُدلَّلاً -

معنى الْإِيْمَانِ لُغَةً (ايمان এর শাব্দিক অর্থ) ঃ

الايمان শব্দটি باب افعال এর মাসদার। আভিধানিক অর্থ–

১. الإِنْقِيَاد অর্থাৎ আনুগত্য করা।

২. الإِذْعَان মেনে নেয়া, সমর্পিত চিত্ত হওয়া।

৩. التَّصْدِيق সত্যায়ন করা, স্বীকৃতি দেয়া।

৪. الْوُثُوْقُ ভরশা করা, নির্ভর করা।

الايمان শব্দটি امن ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। অতএব اُمن به এর অর্থ হল اَنَّ الْمُصَدِّقَ اٰمَنَ الْمُصدَّقَ مِن التَّكْذِيْبِ وَالْمُخَالَفَةِ অর্থাৎ সত্যায়ন কারী (মুমিন) সত্যায়িত সত্ত্বা (আল্লাহ ও তার রাসূল) কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং বিরোধীতা করা থেকে নিশ্চিন্ত করেছে। আর اَلْاِيْمَانُ শব্দের همزه কে যদি صَيْرُوْرت এর অর্থে নেয়া হয় তাহলে ايمان শব্দটি وُثوق এর অর্থে ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ صَارَ الشَّخْصُ ذَا اَمْنٍ ঈমান আনয়নকারী ঈমান আনীত সত্ত্বার উপর আস্থা স্থাপন করে নিরাপদ হয়েছে।

مَعنى الْاِيْمَانِ اِصْطِلاحًا (ايمان এর পারিভাষিক সংজ্ঞা) ঃ

শরীয়তের পরিভাষায় ঈমানের সংজ্ঞা নিরূপণে বিভিন্ন উক্তি পরিলক্ষিত হয়। এ ব্যাপারে নয়টি অভিমত রয়েছে। আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) এর মধ্যে ২টির দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

১. দার্শণিক ফিকাহবিদ ও মুহাক্কিক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে ঈমানের পরিচয় হল–

اَلتَّصدِيقُ بِما عُلِمَ بِالضَّرُوْرةِ اَنَّهٗ مِنْ دِيْنِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم -

অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনীত দ্বীন বা শরীয়তের অংশ হিসেবে নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত বিষয়ের সত্যায়ন করার নাম ঈমান। যেমন– তাওহীদ, রিসালাত, পুনরুত্থান, পরকালের হিসাব নিকাশ ইত্যাদি।

২. জমহুর মুহাদ্দিসীন, মু'তাযিলা ও খারেজীদের মতে الايمانُ مَجموعَةُ ثلاثةِ أُمورٍ اعتقادُ الحَقِّ وَالاقرارُ بِهِ وَالعملُ لِمُقتضاهُ অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, জবানে আল্লাহর প্রভুত্বের স্বীকারোক্তি এবং তার সন্তুষ্টি মোতাবেক আমল করা– এ তিনটি বিষয়ের সমষ্টির নাম ঈমান। যার কেবলমাত্র বিশ্বাসগত ত্রুটি রয়েছে তাকে সর্বসম্মতিক্রমে মুনাফিক বলা হয়। আর যার শুধুমাত্র আমলগত ত্রুটি রয়েছে তাকে সর্বসম্মতিক্রমে ফাসিক বলা হয়। এমতাবস্থায় মুহাদ্দিসীনের মতে উক্ত ব্যক্তি ফাসিক হলেও ঈমানদার থাকবে। পক্ষান্তরে খারেজীদের মতে, সে কাফির হয়ে যাবে। আর মু'তাযিলাদের মতে, সে মু'মিন ও থাকবে না আবার কাফিরও হবে না। উভয় মতবাদীদের মতে উক্ত ব্যক্তি চিরতরে জাহান্নামী হবে।

ঈমান সম্পর্কে ইমাম বায়যাবী (রহঃ) এর অভিমত ঃ ঈমানের হাকীকত সম্পর্কে দার্শণিক, ফিকাহবিদ ও মুহাক্কিক আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমতকেই আল্লামা বায়যাবী সমর্থন করেন।

সংখ্যাগরিষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ইমাম বায়যাবী (রহঃ) এর অভিমতের পার্থক্য ঃ

জমহুর মুহাদ্দিস, মু'তাযিলা ও খারেজীদের অভিমত অনুযায়ী ঈমান مُرَكَّبٌ তথা তিন বিষয়ে বিমিশ্রিত। পক্ষান্তরে, মুহাক্কিকীন ও আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) এর অভিমত অনুযায়ী ঈমান بَسِيطٌ তথা একক ও অবিমিশ্রিত।

অগ্রগণ্য অভিমত ঃ এ উভয় মাযহাবের মধ্যে মুহাক্কিকীনও বায়যাবী (রহঃ) এর অভিমতই অগ্রগণ্য। এর প্রমাণ হল–

১. আল কুরআনের একাধিক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঈমানকে কলবের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। যেমন–

١. كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْإِيْمَانَ ٢. وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ ٣. وَلَمْ
وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ فِي قُلُوْبِهِمْ 8 تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ

কলব দ্বারা কেবল সূত্রে বিশ্বাস স্থাপন করা যায়। অতএব ঈমাম مُرَكَّبٌ হলে কলবের সাথে সম্পৃক্ত করা হত না।

২. আল কুরআনের অসংখ্য স্থানে اَلْاَعْمَالُ الصَّالِحُ (সৎ কর্ম)কে ঈমানের উপর عطف করা হয়েছে। যেমন–

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ـ

আর স্বতসিদ্ধ কায়েদা হল معطوف عليه ও معطوف এর মধ্যে ভিন্নতা থাকে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, اَلْاَعْمَالُ الصَّالِحَةُ ঈমানের অন্তর্গত নয়।

৩. অনেক আয়াতে গুণাহ্গারদের মু'মিন উপাধীতে সম্বোধন করা হয়েছে। অতএব পাপাচারী ফাসিক যদি মু'মিন না হত তাহলে তাদেরকে মু'মিন উপাধীতে সম্বোধন করা হত না। যেমন–

وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا ، اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ـ

৪. শরীয়তের পরিভাষায় ঈমানকে শুধু تَصْدِيْقِ قَلْبِىْ তথা অন্তরের বিশ্বাসের উপর প্রয়োগ করলে আভিধানিক অর্থের সাথে অধিক সামঞ্জস্যতা হয়। আর আভিধানিক অর্থ ও পারিভাষিক সংজ্ঞার মাঝে যোগসূত্র থাকাই কাম্য।

৫. يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ الخ আয়াতে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সংজ্ঞাই সুনির্ধারিত। কেননা اِيمَانْ শব্দ مُتَعَدِّى بالباء হলে তার দ্বারা শুধু تصديق অর্থই উদ্দেশ্য হয়। মোটকথা এ পাঁচ দলীলের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঈমানের শরয়ী সংজ্ঞায় اِقْرار بِاللِّسان এবং اعمال بِالْاَرْكان অন্তর্ভূক্ত নয়।

مَا معنى الغَيْبِ لُغةً وكم قِسْمًا لهٗ ومَا هِى و ما المُراد به هٰهُنا وما المرادُ به فى قوله تعالى وَعِنْدَهٗ مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ لَايَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ ـ

مَعْنَى الْغَيْبِ لُغَةً (اَلْغَيْبُ শব্দের অভিধানিক অর্থ) ঃ

غيب শব্দটি বাবে ضرب এর মাসদার। এর অর্থ হলো– ইন্দ্রিয়গত অনুভূতি বহির্ভূত গোপন বিষয়। অত্র আয়াতে غيب শব্দটি সম্পর্কে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে।

১. غيب শব্দটি مصدر আর মাসদার اَعْرَاض এর অন্তর্গত বিধায় ذات এর উপর প্রয়োগ করা বৈধ নয়। তদুপরি এখানে مُبالغه এর জন্য مصدر কে اسم فاعل অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

২. غَيْبٌ শব্দটি فَيْعَلٌ এর ওযনে صفت مشبه এর সীগাহ। উচ্চারণের কাঠিন্যের কারণে যের বিশিষ্ট ياء কে বিলুপ্ত করা হয়েছে। আরবী ভাষায় এরূপ বিলুপ্ত করার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) قَيْل শব্দকে উপস্থাপন করেছেন। قَيْل হিময়ারী সম্রাটের উপাধী। যা মূলতঃ قَيِّل ছিল। পরবর্তীতে যের বিশিষ্ট يا বিলুপ্ত করে قَيْل বলা হয়।

اَقسامُ الغيب (الغيب এর প্রকারভেদ) ঃ

اَلغَيْبُ দু'প্রকার। ১. قسمٌ لا دَليلَ عليه অর্থাৎ প্রথম প্রকার গাইব হল যার ব্যাপারে পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও বিবেক অনুভূতি দ্বারা এবং শরীয়তের পক্ষ থেকে কোন প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

আল্লাহর বাণী– وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ মধ্যে غيب দ্বারা এ প্রকার গায়বই উদ্দেশ্য।

২. قِسْمٌ نُصِبَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রকার غيب হলো যা শরয়ী বা বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলাদি দ্বারা প্রমাণিত। যেমন– বিশ্ব জাহানের সৃষ্টিকর্তা সুমহান স্বত্তা ও তার গুণাবলী। পরকাল ও তার অবস্থাদি। অত্র আয়াতে এ প্রকার غيب ই উদ্দেশ্য।

كَمْ تَفْسِيرًا لِلْغَيْبِ ذَكَرَهُ الْمُفَسِّرُ الْعَلَّامُ فِي قوله يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ

تفسيرُ الْغَيْبِ (غَيْبٌ এর ব্যাখ্যা) ঃ

আল্লামা নাসিরুদ্দীন বায়যাবী (রহঃ) غيب এর মোট চার (৪)টি তাফসীর উল্লেখ করেছেন। যথা–

১. الْمُرَادُ بِالْغَيْبِ الْخَفِيُّ الَّذِى لَا يُدْرِكُهُ الْحِسُّ وَلا يَقْتَضِيهِ بَدَاهَةُ الْعَقْلِ অর্থাৎ গায়ব দ্বারা উদ্দেশ্য হল এমন অদৃশ্য বিষয় যা ইন্দ্রিয় অনুভূতির বহির্ভূত এবং স্বতলব্ধ জ্ঞান যা গ্রহণ করে না। এটা আবার দু'প্রকার যা غيب এর প্রকারভেদের বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

২. أَوِ الْمَعْنٰى أَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ غَائِبِيْنَ عَنْكُمْ অর্থাৎ আয়াতের অর্থ হল (তারা তোমাদের থেকে অদৃশ্য হয়ে ঈমান আনে। এমতা'বস্থায় যে, الغيب শব্দটি يؤمنون এর ضمير থেকে حال হবে। অর্থাৎ মুত্তাকীগণ গায়ব বা অনুপস্থিত থেকেও পরিপূর্ণ ঈমান আনয়ন করে। তাদের অবস্থা মুনাফিকদের মত নয়; যারা সামনে আসলে বলে امنا, আর পশ্চাতে বলে إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُوْنَ

৩. أَوِ الْمَعْنٰى أَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ غَائِبِيْنَ عَنِ الْمُؤْمَنِ بِهِ অর্থাৎ আয়াতের মধ্যে غيب শব্দটি يؤمنون এর ضمير থেকে حال হয়েছে– এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ হল– তারা مؤمن به তথা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর থেকে অদৃশ্য থেকে ঈমান এনেছে। যেমনিভাবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত وَالَّذِى لا اله غَيْرُهُ مَا يُؤْمِنُ اَحَدٌ اَفْضَلَ مِنْ اِيْمَانٍ بِغَيْبٍ অর্থাৎ ঐ স্বত্তার শপথ যিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। অদৃশ্য থেকে ঈমান আনয়নকারী অপেক্ষা উত্তম ঈমান কেউ আনয়ন করেনি।

৪. কারো কারো মতে, اَلْمُرَادُ بِالْغَيْبِ اَلْقَلْبُ وَالْمَعْنَى يُؤْمِنُوْنَ بِقُلُوْبِهِمْ অর্থাৎ غيب দ্বারা ক্বলব উদ্দেশ্য। এমতাবস্থায় আয়াতের মর্ম হল- তারা আন্তরিকভাবে ঈমান আনয়ন করে। মুনাফিক বা কপটাচারীদের মত নয়। যারা মুখে এমন কথা বলে যা তারা অন্তরে পোষণ করে না।

غيب এর প্রথম তাফসীর অনুযায়ী بالغيب এর باء অব্যায়টি تعدية এর জন্য আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাফসীর অনুযায়ী باء টি مُصَاحَبَتْ এর জন্য এবং চতুর্থ তাফসীর অনুযায়ী استعانت এর জন্য গণ্য হবে।

س (١٩) : يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ـ

الف : كَمْ وَجْهًا ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ رح فِى تَفْسِيْرِ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَمَا هِىَ وَايُّهَا اَظْهَرُ؟

ب : مَا مَعْنَى الرِّزْقِ وَالْإِنْفَاقِ لُغَةً وَعُرْفًا؟

ج : الحرامُ رِزْقٌ اَمْ لَا ومَا قولُ اَهْلِ الْحَقِّ فيه؟ بيِّن بِالدَّلَائِلِ ـ

(الف) اَلْاَوْجُهُ فِى تَفْسِيْرِ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ (إِقَامَةُ الصَّلَاةِ এর তাফসীরসমূহ)

আল্লামা নাসিরউদ্দীন বায়যাবী (রহঃ) إِقَامَةُ الصَّلَاةِ এর চারটি তাফসীর উল্লেখ করেছেন।

১. তারা تعديل اركان এর সাথে সালাত আদায় করে। تعديل اركان হল সালাতের কোন রোকন বা কাজ কর্মে বক্রতা বা ত্রুটি না থাকা অর্থাৎ সালাতের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাবসমূহ যথাযথভাবে আদায় করা। এমতাবস্থায় اقام - وَيُقِيْمُوْنَ الْعُوْدَ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। অর্থ হেলে পড়া বা বক্র বস্তুকে সোজা করা। تعديل اَركان الصَّلٰواة কে اقامة اَجْسَام এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। অতঃপর مُشَبَّه به (উপমেয়) এর শব্দ اقامت দ্বারা تعديل اركان الصلوة উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এরপর তার থেকে فعل - يُقِيمون নির্গত করা হয়েছে। অর্থাৎ استعارة تَبْعِيَّه হিসেবে يقيمون দ্বারা تعديل اركان الصّلٰوة উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

২. يُوَاظِبُوْنَ على الصّلٰوة অর্থাৎ তারা অধ্যবসায়ের সাথে বা নিয়মিতভাবে সালাত আদায় করে। এমতাবস্থায় يُقيمون الصلوة কে قَامَتِ السُّوقُ ও

اقمت السوق (যার অর্থ বাজার চালু হওয়া বা চালু করা) থেকে নিষ্পন্ন করা হয়েছে। قامت السوق বাজার চালু করার অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার দৃষ্টান্ত হল– কবি আরমান ইবনে জুযাইম আল-আনসারীর কবিতা–

أَقَامَتْ غَزَالَةُ سُوْقَ الضِّرابِ * لِأَهْلِ الْعِرَاقَيْنِ حولاً قميطا

অর্থ ঃ গাযালা কুফা ও বসরাবাসীদের জন্য পূর্ণ এক বছর যুদ্ধের বাজার চালু রেখেছে।

এখানেও استعاره تبعيه এর ভিত্তিতে اقامت الصلوة দ্বারা الْمُدَاوَمَةُ الْمُدَاوَمَةُ وَالْمُحَافَظَةُ عَلَى الصَّلوة উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ والمحافظة عَلَى الصَّلاة কে إقامة سوق এর সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। مشبه এর فعل - يُقِيْمُوْنَ নিষ্পন্ন করে اقامة থেকে (উপমেয়) مشبه به জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

৩. تَشْمِرُّوْنَ لِأَدَاءِ هَا مِنْ غَيْرِ فُتُورٍ وَلا تَوَانٍ অর্থাৎ তারা অবহেলা ও অবসাদ পরিহার করে উদ্যম ও সোৎসাহে সালাত আদায় করে। এমতাবস্থায় يقيمون الصلوة অর্থ قَامَ بِالْأَمْرِ وَاقَامَه যার অর্থ যথাযথ প্রচেষ্টা ও উদ্যমের সাথে কোন কার্য সম্পাদন করা। علاقة لُزوم অথবা علاقة سَبَبِيَّت এর ভিত্তিতে অত্র আয়াতে اقامت শব্দটি উদ্যম ও যথাসাধ্য চেষ্টা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

৪. تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاسْمِ الْجُزْءِ অর্থাৎ তারা সালাত আদায় করে। এমতাবস্থায় সালাতের মধ্যে কিয়াম থাকার কারণে সালাতকে কিয়াম দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমনিভাবে সালাতকে কুনূত বলা হয়েছে– كَانَتْ مِنَ الْقَانِتِيْنَ اى المصلين আবার কখনো সালাতকে রুকূ বলা হয়েছে। যেমন–

وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ اىْ صَلُّوْ مَعَ الْمُصَلِّيْنَ

আবার কখনো সিজদা বলা হয়েছে। যেমন– وكُنْ مِنَ السَّاجِدِيْنَ اى المُصَلِّين আবার কখনো তাসবীহ বলা হয়েছে। যেমন– اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ اى المُصَلِّين তেমনিভাবে অত্র আয়াতে সালাতকে কিয়াম বলা হয়েছে।

★ إقامة الصلوة) أَظْهَرُ التَّفْسِير مِن تَفاسِيْرِ إقامةِ الصَّلوة এর সর্বাধিক সুষ্ঠুব্যাখ্যা) আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) اقامة الصلوة এর চারটি ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। অতঃপর এর মধ্যে প্রথম ব্যাখ্যাকে সর্বাধিক সুস্পষ্ট

ব্যাখ্যা বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং এর স্বপক্ষে তিনি তিনটি কারণ উপস্থাপন করেছেন।

১. ان تَفْسِيرُ الْاَوَّل اَشْهَرُ অর্থাৎ এ ব্যাখ্যাটি পূর্ববর্তী মহামনীষীদের মাঝে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। তাফসীর শাস্ত্রের দিকপাল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেও এ ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে।

২. ان هٰذا التفسيرَ اِلَى الْحَقِيْقَةِ اَقْرَبُ অর্থাৎ প্রথম ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে اقامة এর حَقِيْقِى অর্থের সাথে مَجَازِى (রূপক) অর্থের সুস্পষ্ট যোগসূত্র খুজে পাওয়া যায়।

কেননা প্রথম ব্যাখ্যা تعديل اركان الصلوة এর মধ্যে যেমন تَسْوِيَه এর অর্থ রয়েছে, তেমনিভাবে তার حقيقى অর্থাৎ اقامة اجسام এর মধ্যে تسويه এর অর্থ রয়েছে। পক্ষান্তরে অপরাপর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে اقامة এর حقيقى ও مجازى অর্থের মাঝে মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন।

৩. اَنَّ هٰذا التَّفْسِيرَ اَفْيَدُ অর্থাৎ এ ব্যাখ্যা অধিক ফায়দাদায়ক। কেননা এ ব্যাখ্যার মধ্যে এ কথার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, সালাতের জাহেরী হুকুক তথা ফরয, সুন্নাত ইত্যাদি এবং বাতেনী হুকুক তথা খুশু খুযূ, আল্লাহর প্রতি আন্তকরণ নিবিষ্ট রাখা ইত্যাদি রক্ষাকারী মুসল্লীই কেবলমাত্র প্রসংশার উপযুক্ত কেননা تعديل اركان এর অর্থই ছিল সালাতের জাহিরী ও বাতেনী বিষয়গুলো যথাযথভাবে অনুশীলন করা। এ কারণেই যেখানে মুসল্লীদের প্রসংশা করা হয়েছে সেখানে يقيمون الصلوة তথা اقامة শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর যেখানে নিন্দা বা ধমক দেয়া হয়েছে সেখানে وَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে অন্যান্য তাফসীরের ক্ষেত্রে এ বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করা হয়নি।

ب : مَا مَعْنَى الرِّزْقِ وَالْاِنْفَاقِ لُغَةً وعُرْفًا ـ

مَعْنَى الرِّزْقِ لُغَةً (رزق এর আভিধানিক অর্থ) ঃ

رزق শব্দটি راء বর্ণে فتح বিশিষ্ট হলে বাবে نصر ينصر এর মাসদার। যার অর্থ প্রাণীকুলের উপকারী ও কল্যাণকর বস্তুর সুব্যবস্থা করা, প্রাণী ও নিষ্প্রাণ নির্বিশেষে সৃষ্টিকূলের জন্য কল্যাণকর বস্তু সামগ্রীর সুব্যবস্থা করা। رزق শব্দটি راء বর্ণে كسره বিশিষ্ট হলে অর্থ হবে অংশ, জীবিকা, খাদ্য, সৈনিকের মাসিক ভাতা।

কখনো رزق শব্দটি مكسور الراء ও মাসদার রূপে ব্যবহার হয়। رزق কখনো مرزوق অর্থে ব্যবহৃত হয়।

معنى الرزق عرفا ঃ আভিধানিক দৃষ্টিকোণে رزق শব্দটি ব্যপ্তার্থবোধক। যা খাদ্য-অখাদ্য; ইন্দ্রিয়গোঁচর, ইন্দ্রীয়াতীত বস্তু, হালাল-হারাম সব কিছু বুঝায়। কারো মতে প্রাণী ও নিষ্প্রাণ সবকিছুর জীবিকার জন্য ব্যবহার হলেও শরীয়তের পরিভাষায় এ শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার হয়। আর তা হল–

تخصيصُ الشَّيِي بِالحَيَوانِ تَمْكِينُهٗ مِن الْاِنْتِفاعِ بِهٖ

অর্থাৎ কোন বস্তু থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য বিশেষভাবে প্রাণীর অধীনস্ত করে দেয়া।

★ معنى الْاِنْفاقِ لُغةً (إنفاق এর আভিধানিক অর্থ) ঃ

اِنْفاق শব্দটি বাবে اِفعال এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হল– اَلْبَذْلُ وَالإنْفاقُ তথা খরচ করা, ব্যয় করা।

معنى الْاِنْفَاقِ عُرْفًا (إنْفاق এর পারিভাষিক অর্থ) ঃ

শরীয়তের পরিভাষায় اِنْفاق এর সংজ্ঞায় ইমাম বায়যাবী (রহঃ) বলেন– الانفاقُ صرفُ المالِ إلى سَبيلِ الْخيرِ منَ الْفرضِ وَالنَّفلِ অর্থাৎ ফরয বা নফল ভাল কাজে ধন-সম্পদ ব্যয় করাকে اِنْفاق বলে।

ج : الحرامُ رِزقٌ ام لاَ؟ ومَا الاختلافُ فيه؟

اَلاقوالُ اَلْمُختلِفَة فى كونِ الحرامِ رِزْقًا **(হারামবস্তু রিযক হওয়ার ব্যাপারে অভিমত) ঃ**

হারাম বস্তু রিযিক কিনা এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত ও মু'তাযিলাদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

ক. মু'তাযিলাদের অভিমত ঃ মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের মতে, হারাম বস্তু রিযিক নয়। তাদের যুক্তি হলো–

১. সর্বসম্মতিক্রমে إن اللّٰهَ منزَّهٌ عَنِ الْقَبَائِح তথা আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় দোষণীয় কাজ-কর্ম থেকে পবিত্র। হারাম ভক্ষণ করা قبيح কাজ। হারাম বস্তু বা কাজের সুযোগদান করা একটি মন্দ ও গর্হিত কাজ। অতএব আল্লাহ তা'আলা যেহেতু قبيح বা মন্দ দোষণীয় কাজ কর্ম থেকে পূতঃপবিত্র। সুতরাং তার দ্বারা হারাম বস্তু ভক্ষণ করার সুযোগ দেয়া অসম্ভব। অতএব হারাম রিযিক হতে পারে না।

২. বক্ষমান আয়াত এবং অন্যান্য আয়াতে আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিক ব্যয় করার জন্য প্রসংশা করা হয়েছে। অথচ হারাম মাল ব্যয় করা নিষিদ্ধ। অতএব হারাম রিযিক হতে পারে না।

৩. অত্র আয়াত এবং কুরআনুল কারীমের বহু সংখ্যক আয়াতে رزق কে আল্লাহর দিকে নিসবত করা হয়েছে। অথচ খারাপ জিনিস আল্লাহর প্রতি নিসবত করা নিষেধ। অতএব প্রমাণিত হয় যে, رزق হারাম হতে পারে না।

৪. রিযিককে হারাম বলার কারণে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

قُلْ اَرَأَيْتُمْ مَاأَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَّحَلَالًا ـ

খ. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অভিমত ঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে হারাম বস্তু ও রিযিক। তাদের দলীল হল–

১. এ ধরা পৃষ্ঠে যাবতীয় প্রাণীকে আল্লাহ্ তা'আলা রিযিক দিচ্ছেন। এ মর্মে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا অতএব যদি হারাম বস্তু রিযিক না হয় তাহলে যারা আমরণ হারাম বস্তু ভক্ষণ করে তারা আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিক ভক্ষণ করে না। এক্ষেত্রে উক্ত আয়াতটি অর্থহীন হয়ে যায়।

২. সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা (রাঃ) বর্ণিত আমর ইবনে কুররার ঘটনা। যাতে রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন–

لَقَدْ رَزَقَكَ اللّٰهُ طَيِّبًا فَاخْتَرْتَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْكَ مِنْ رِّزْقِهِ ـ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাকে পূতঃ পবিত্র বস্তু রিযিক হিসেবে দিয়েছেন। অথচ তুমি আল্লাহর রিযিকের মধ্যে যা হারাম তা গ্রহণ করেছ। (ইবনে মাজাহ)

এ হাদীসে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) সুস্পষ্টভাবে রিযিকের উপর হারাম শব্দ প্রয়োগ করেছেন।

মু'তাযিলাদের উপস্থাপিত যুক্তি খণ্ডন ঃ

১ম দলিল খণ্ডন ঃ হারাম ভক্ষণ করার সামর্থ্য দান করা قبيح বা দুষণীয় নয়। যেমনিভাবে অন্যান্য সকল পাপাচারিতা থেকে আল্লাহ্ তায়ালা বারণ করেছেন, আবার পাপ কাজ সংঘটনের সামর্থ্যও দিয়েছেন। কেননা স্বীকৃত নিয়ম হল خَلْقُ قَبِيْحٍ قبيح نِيْسْتْ অর্থাৎ মন্দ জিনিস সৃষ্টি করা মন্দ ও দোষণীয় নয়।

২য় যুক্তি খণ্ডন ঃ রিযিক ব্যয় করার জন্য প্রসংশা করা, রিযিকের মর্মের মধ্যে হারাম অন্তর্ভূক্ত না হওয়ার প্রমাণ হতে পারে না। কেননা আয়াতের মধ্যে رزق

থেকে হারাম বাদ পড়েছে প্রসংশার স্থলে হওয়ার কারণে। অন্যথায় رزق মূল শব্দের মর্মে হারামও অর্ন্তগত।

তৃতীয় যুক্তি খণ্ডন ঃ ফরয, ওয়াজিব, মুবাহ হারাম, হালাল, মুস্তাহাব ইত্যাদি فعل مكلف এর صفت। কোন কাজ হারাম ও قبيح তথা মন্দ ও দোষণীয় হয় বান্দার দৃষ্টিকোণে আল্লাহর কাছে সবকিছুই ভাল কোন কিছুই মন্দও দূষণীয় নয়। অতএব হারামের নিসবত আল্লাহর দিকে করার দ্বারা قبيح বা মন্দ জিনিসের নিসবত আল্লাহর দিকে করা আবশ্যক হয় না।

চতুর্থ যুক্তি খণ্ডন ঃ মুশরিকরা হারামকে রিযিক আখ্যায়িত করেছে বলে আল্লাহ তা'আলা তাদের নিন্দা জ্ঞাপন করেননি। বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে যে রিযিক হারাম করা হয়নি তারা সেগুলোকে হারাম করেছিল। অতএব হালাল রিযিককে হারাম রিযিক আখ্যা দিয়ে তারা শরীয়তের বিধি-বিধানে অবৈধ হস্তক্ষেপ করেছিল বিধায় তাদের নিন্দা করা হয়েছে।

মোট কথা, হালাল হারাম সবই আল্লাহর সৃষ্টি। আর মন্দ বিষয় সৃষ্টি করলেই আল্লাহর মন্দ কাজ করা সাব্যস্ত হয় না। বরং আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্যই কেবল মন্দ সৃষ্টি করেছেন।

س (٢٠) : اَلَّذِيْنَ يُؤمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۔
الف : عَيِّنِ الْمَعطُوفَ عَلَيْهِ الَّذِيْنَ يُوْمِنُوْنَ ۔ ثم بَيِّنْ مِصداقَ الموصولِ معَ تَرجِيْحِ الرَّاجِحِ ۔
قوله اِلى الْمَلِكِ الْقرمِ وَابْنِ الْهُمَامِ * لَيْثِ الْكَتِيْبَةِ فى الْمُزدحِمِ ۔
قوله يَالَهفَ زَيَّابَةَ لِلحَارِثِ * الصَّابِحِ والغانِم والاٰئِبِ،لِمَنْ البيتانِ ولِم اوردَ هُما الْمُفسِّر اَوْضِحْ ۔

اَلَّذِيْنَ يُوْمنون بِما اُنزِل اِلَيكَ (দ্বারা উদ্দেশ্য এবং অত্র আয়াতটির معطوف عليه) ঃ

অত্র আয়াতে الذين يُوْمنون দ্বারা উদ্দিষ্ট কারা সে ব্যাপারে চারটি অভিমত রয়েছে। নিম্নে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের পরিচয় ও والذين يُوْمنون الخ এর معطوف عليه এর আলোচনা করা হল।

১. الذين يُوْمِنُوْن الخ দ্বারা আহলে কিতাবের মধ্য হতে যারা মুসলমান হয়েছেন তারা উদ্দেশ্য। যেমন- আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) আর الذين

يومنون আয়াতটি يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ الذين এর উপর عطف হয়েছে। আর الَّذِيْنَ يُؤْمنونَ بِالغَيْبِ দ্বারা মুশরিকদের মধ্যে হতে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। অতএব এ উভয় শ্রেণীর মুসলমান পূর্বের আয়াতের متقين এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

২. الذِيّن يُؤْمِنُوْن الخ দ্বারা আহলে কিতাবদের মধ্য হতে ইসলাম গ্রহণকারীরা উদ্দেশ্য। এ আয়াতটি المتقين এর উপর عطف হয়েছে। অর্থাৎ প্রথম موصول তথা الذين يومنون بالغيب আয়াত المتقين এর সিফাত হয়েছে। দ্বিতীয় موضول তথা والذين يومنون আয়াতটি المتقين এর উপর عطف হয়েছে। অর্থ হবে এ কিতাব খানা মুত্তাকী তথা শিরক্ পরিহারকারী এবং আহলে কিতাবদের মধ্য হতে ইসলাম গ্রহণকারীদের জন্য হেদায়েত স্বরূপ।

৩. والذين প্রথম الذين এর উপর عطف হয়েছে। আর উভয় موصول দ্বারা সকল মুমিন উদ্দেশ্য। প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক উদ্দেশ্য নয়।

৪. والذين পূর্বোক্ত الذين موصول এর উপর عطف হয়েছে এবং প্রথম موصول দ্বারা সকল মুমিনীন উদ্দেশ্য। আর দ্বিতীয় موصول দ্বারা বিশেষভাবে আহলে কিতাব মুমিনীন উদ্দেশ্য। যেমনিভাবে ফেরেশতাদের اجمالى আলোচনার পর বিশেষভাবে জিবরাইল, মিকাঈল ইত্যাদি শীর্ষস্থানীয় ফেরেশতাদের নাম স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়।

ب : الى الملك الخ এর কবির নাম।

আর يَا لَهْفَ زَيَّابَةَ الخ শে'রের রচয়িতা সালামা (سلمة) যিনি ابنِ ربابة নামে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন।

اِلَى الْمُلِكِ الْقَرِمِ الخ শে'রটি উপস্থাপন করার কারণ ঃ

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ الخ এর معطوف عليه কি হবে সে আলোচনা প্রসঙ্গে আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) বলেন, والذين الخ বাক্যটি পূর্বোক্ত الَّذِيْن يُؤْمنون الخ এর উপর عطف হয়েছে। প্রথম موصول দ্বারা সকল মুমিনীন উদ্দেশ্য এবং দ্বিতীয় موصول দ্বারা বিশেষভাবে আহলে কিতাব উদ্দেশ্য। ইমাম বায়যাবী (রহঃ) এর এ বক্তব্যের উপর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। প্রশ্নটি হল معطوف ও معطوف عليه এর মাঝে تغاير বা ভিন্নতা থাকা অপরিহার্য। কিন্তু আলোচ্য আয়াতটিতে الذين يومنون তার পূর্বোক্ত الذين এর উপর عطف হওয়া সত্ত্বেও কোন ভিন্নতা নেই। তাহলে عطف কিভাবে বিশুদ্ধ হল?

এ প্রশ্নের সমাধানে আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) কবিতাংশটি উপস্থাপন করেছেন। আল্লামার বক্তব্যের সারবত্তা হল, আলোচ্য আয়াত ও তার পূর্বোক্ত আয়াতের صلـه পরস্পর বিপরীত বৈশিষ্ট্যের। আর صلـه এর বিভিন্নতার ভিত্তিতে একটিকে অপরটির উপর عـطف করা হয়েছে। যেমনিভাবে উপস্থাপিত্ব কবিতাংশে সিফাতের ভিন্নতাকে ذاتـی ভিন্নতার স্থলাভিষিক্ত করে عـطف করা হয়েছে। কবিতাংশে ابـن الـهُمـام ـ الـمَلِك الـقَرم এবং لَـيْـثِ الْـكَـتِـيْـبَـة তিনটিই একই স্বত্তার বিভিন্ন গুণাবলী। গুণাবলী বিভিন্ন হওয়ার দরুন একটিকে অপরটির উপর عـطف করা হয়েছে।

يـالـهـف زيـابـة للحـارث এ কবিতাংশ কবি সালামা এর রচিত। যিনি ابـن زيـابـة নামে সুপরিচিত ছিলেন। إِلى الـمَلِـكِ الـقَرم وابـنِ الـهُمـام এর মত এ কবিতাংশেও الـصَّـابِـحِ والـغـانِـمِ والآيِـبِ গুণগুলো একই স্বত্তার হলেও গুণের বিভিন্নতার কারণে একটিকে অপরটির উপর عـطف করা হয়েছে।

وكَرَّر الـمـوصـول تَـنـبـيـهًـا عـلـى تـبـايُـنِ الـسَّـبِـيـلَـيْـن اوضـح غـرض الـمُـفـسِّـر بـهٰذا الـقـولِ إِيْـضـاحًـا تـامًّـا

ج : الـذيـن يُـؤمِـنُـوْن بِـمَـا اُنـزل ও اَلّذِيْـن يُـؤمِـنُـون بِـالْـغَـيْـب এ আয়াত দ্বয়ে اسـم مـوصـول কে দু'বার উল্লেখ করার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে আল্লামা বায়যাবী (র) বলেন, اسـم مـوصـول তাকরার বা পূণঃউল্লেখ করার কারণ হল, ঈমান লাভের দুই পথ ও পন্থা ভিন্ন ভিন্ন তা ব্যাখ্যা করা। আর তা হল প্রথম مـوصـول এর অধীনে যে ঈমানের কথা বলা হয়েছে তা লাভ করার উপায় হল বিশুদ্ধ বুদ্ধি ও পরিশুদ্ধ বিবেক। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় مـوصـول এর অধীনে উক্ত ঈমান অর্জন করার উপায় হল نـقـل তথা দ্বীনি জ্ঞান।

س (٢١) : (الف) ما مَعنى الْاِنْزال ومَا الـمرادُ بـمـا اُنْزِلَ اِلَـيْـكَ وما وجهُ الـتَّـعـبِـيْـر بِـلـفـظِ الْـمـاضـى؟ بَـيِّـن عـلـى نـهـج الـمُـفـسِّـر ـ

انـزال শব্দটি বাবে افـعـال এর মাসদার। শব্দিক অর্থ نَـقـلُ الـشَّـئِ مـن الاعـلىٰ إِلـى الْاَسْـفَـل অর্থাৎ উর্ধ্ব হতে কোন জিনিস নিম্নদেশে স্থানান্তরিত করা।

অত্র আয়াতের মধ্যে بـمـا انـزل الـيـك দ্বারা সম্পূর্ণ কুরআনও পরিপূর্ণ শরীয়ত উদ্দেশ্য। এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। আর তা হল اَلّذِيْنَ يُؤمـنـون بـمـا

انزل اليك আয়াত খানা যখন অবতীর্ণ হয় তখন যেমন সম্পূর্ণ কুরআন অবতীর্ণ হয়নি তেমনিভাবে শরীয়তও পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেনি। তার পরেও অত্র আয়াতে অতীতকাল জ্ঞাপক শব্দের দ্বারা আয়াতে বলা হয়েছে। যারা সম্পূর্ণ কুরআন ও পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত যা আপনার উপর অবতরণ করা হয়েছে তার উপর ঈমান আনয়ন করেছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তখন কুরআন সম্পূর্ণভাবে রাসূলের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ ব্যাপারটা এরূপ নয়।

আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) এ প্রশ্নের দুটি উত্তর দিয়েছেন।

১. تَغْلِيْبًا لِلْمَوجود على مالَمْ يُوْجَد অর্থাৎ مجازِ مرسل হিসেবে কুরআনের মওজুদ অংশকে অবশিষ্টাংশের উপর প্রাধান্য দিয়ে অতীতকাল জ্ঞাপক ক্রিয়া দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

২. تنزيلٌ لِلْمُنْتَظَرِ مَنْزِلَةَ الْوَاقِع অর্থাৎ استعارةٌ تبعيّه হিসেবে অবশ্যম্ভাবী প্রত্যাশিত বস্তুকে বাস্তবায়িত বিষয়ের সাথে তুলনা করে فعل ماضى এর দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

ب : اُكْتُبْ كَيْفِيَّةَ نُزولِ الْكُتُبِ اْلاِلٰهِيَّةِ على الرُّسُلِ ۔

ب ঃ ঐশি গ্রন্থগুলো রাসূলগণের উপর অবতরণ পদ্ধতি ঃ

আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) ঐশিগ্রন্থগুলো রাসূলগণের উপর অবতরণের দুটি পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন।

১. يَتَلَقَّفُهُ الْمَلَكُ مِنَ اللّٰهِ تلقُّفًا رُوحَانِيًّا অর্থাৎ ঐশীবাণী বাহক ফিরিশতা জিবরীল (আঃ) আল্লাহর কাছ থেকে রূহানীভাবে বাণীসমূহ আত্মস্থ করে রাসূলগণের কাছে পৌছে দিতেন।

২. يَحْفَظُهُ مِنَ اللُّوحِ الْمَحْفوظِ فَيُنْزِله على الرُّسُلِ অর্থাৎ জিবরীল লাওহে মাহফূয থেকে পড়ে মুখস্থ করে তা নবীগণের উপর অবতীর্ণ করতেন।

س (٢٢) : أُولَٰئِكَ على هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وأولٰئِك هُمُ الْمُفْلِحُوْن ـ

الف : مَا هِيَ وجوهُ الْإِعْرابِ لِهٰذِهِ الْجُمْلَةِ؟

ب : لِمَا أَتٰى سُبْحانَهٗ وتَعالىٰ بِاسمِ الْاِشارةِ ولِمَ كَرَّرَهٗ؟

ج : لِماذَا فُصِّلَتْ بِضَميرِ الْفصلِ بَيْنَ الْمُبتداءِ وَالخبرِ فى قولِه تعالى أُولٰئِكَ همُ الْمُفْلِحُوْنَ ولِمَ أُتِيَ حرفُ الْعَطْفِ بَيْنَ الْكلِمَتَيْنِ؟

د : فَسِّرِ الايةَ الكَرِيمَةَ كما فسَّرَ هَا العَلّامَةُ البَيْضَاوِىُّ ـ

উত্তর ঃ (الف) بَيانُ وجوهِ الْإِعْرابِ

ই'রাবের দিক দিয়ে অত্র আয়াতটি مَحلًّا مرفوع হয়েছে। তবে তা বিভিন্ন দিক দিয়ে হতে পারে। যথা–

১. خبر হিসেবে مرفوع। অর্থাৎ الذين ও الذين يومنون بالغيب الخ المتقين এর কোন একটিকে موصول এ দুই يومنون بما انزل اليك الخ থেকে পৃথক করে তাকে مبتدا গণ্য করা হবে এবং اولئك على الخ আয়াতকে بتاويل مفرد খবর গণ্য করা হবে। অতএব যদি প্রথম موصول অর্থাৎ الذين يُومنون بالغيب الخ আয়াতকে المتقين থেকে পৃথক গণ্য করা হয় তাহলে উভয় موصول পরস্পর معطوف ও معطوف عليه মিলে مبتدا হবে এবং اولئك কে তার خبر গণ্য করা হবে।

আর যদি শুধুমাত্র দ্বিতীয় موصول কে المتقين থেকে আলাদা করা হয় তাহলে শুধু দ্বিতীয় موصول ই مبتدا হবে। আর اولئك তার خبر হবে।

২. جمله مستانفة হিসেবে مرفوع। অর্থাৎ পূর্বোক্ত উভয় موصول এর কোনটিকে المتقين থেকে বিচ্ছিন্ন গণ্য না করে। অত্র আয়াতটিকে স্বয়ং সম্পূর্ণ একটি جمله হিসেবে পরিগণিত করা হবে। এমতাবস্থায় উক্ত আয়াতটি কোন উহ্য প্রশ্নের উত্তর হিসেবে গণ্য হবে না।

৩. جمله مستانفه হিসেবে مرفوع। তবে এটাকে উহ্য প্রশ্নের উত্তর পরিগণিত করা হবে। অর্থাৎ পূর্বোক্ত মুক্তাকীদের গুণাবলীর আলোচনা শুনে কেউ

হয়ত প্রশ্ন করতে পারে যে, এ সকল গুণ সম্পন্ন মুত্তাকীদের কি অবস্থা? তার উত্তরে অত্র আয়াতে বলা হয়েছে اولئك على هدى من ربهم الخ

مسند : وجهُ اِتْيَانِهٖ بِاِسْمِ الْاِشَارَةِ ঃ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ب الیه কে اسم ظاهر উল্লেখ না করে اسم اشاره উল্লেখ করার কারণ ঃ

১. اَنَّ اِسْمَ الْاِشَارَةِ هٰهُنَا كَاِعَادَةِ الْمَوْصُوْفِ بِصِفَاتِ الْمَذْكُوْرَةِ অর্থাৎ সংক্ষেপে পুর্বোল্লেখিত صفات এর সাথে مُسْنَد الیه এর দিকে ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যে اسم ظاهر এর পরিবর্তে اسم اشارة আনা হয়েছে। কেননা اسم ظاهر অর্থাৎ المتقين। উল্লেখ করলে উল্লেখিত গুণাবলী হওয়া বা না হওয়া উভয়ের সম্ভাবনা থাকত। পক্ষান্তরে যদি اسم ظاهر এর সাথে صفات ও উল্লেখ করা হত তাহলে কথা অতি দীর্ঘ হয়ে যেত। অতএব اسم اشارة আনা হয়েছে। যা اسم ظاهر কে তার صفات সহকারে বুঝায়।

২. بَيَانِ اِقْتِضَاء এর জন্য। অর্থাৎ اسم ظاهر এর পরিবর্তে اسم اشاره এ জন্য আনা হয়েছে, যাতে اقتضاء كلام তথা ভাষার চাহিদা দ্বারা এটা সুপ্রমাণিত হয়ে যায় যে, বান্দার هِدايَة مِّن رَّبِّهِم এবং فلاح এর অধিকারী হওয়ার জন্য উল্লেখিত গুণাবলী সম্পন্ন হওয়া শর্ত।

★ وَجْهُ تَكْرِيْرِ اِسْمِ الْاِشَارَةِ ঃ (اولئك ইসমে ইশারা পুনঃবার আনয়ন করার কারণ) ঃ

اُولٰٓئِكَ ইসমে ইশারা تكرار বা পুনঃবার উল্লেখকরণ ফায়দাবিহীন নয়। বরং দু'টি ফায়দার জন্য مكرر আনা হয়েছে। ফায়েদা দু'টি হল–

১. এ বিষয়টি অবহিত করার জন্য যে, মুত্তাকীদের উক্ত গুণাবলী সম্পন্ন হওয়া তাদের ইহকালে হেদায়েত লাভের এবং পরকালে সফলতা লাভের কারণ। অর্থাৎ এ গুণাবলী ধারণ করলে তারা ইহকালীন জীবনে হেদায়েত বা সুপথ লাভে ধন্য হবে এবং পরকালীন জীবনে কামিয়াবী ও সফলতা তাদের পদচুম্বন করবে। কেননা علت এর تكرار - معلول এর تكرار এর উপর دلالت করে। পক্ষান্তরে যদি اولئك ইসমে ইশারাকে تكرار না আনা হত তাহলে এ সন্দেহ সৃষ্টি হত যে, মুত্তাকীদের উক্ত গুণাবলী সম্পন্ন হওয়া শুধুমাত্র ইহলৌকিক জীবনে হেদায়েত প্রাপ্তির কারণ। পারলৌকিক জীবনে কামিয়াবীর জন্য কারণ বা علت নয়।

২. দ্বিতীয়ত এ বিষয়টি অবহিত করার জন্য ইসমে ইশারাকে تكرار আনা হয়েছে যে, মুত্তাকীদের জন্যে উল্লেখিত উভয় বৈশিষ্ট্যের প্রতিটি তাদেরকে অন্যদের থেকে আলাদা করার জন্য যথেষ্ট। যদি اولئك পুনঃবার উল্লেখ না করা হত তাহলে এ উভয়ের সমষ্টি তাদের বৈশিষ্ট্য বুঝাত আর পৃথক পৃথকভাবে অন্যদের এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার সন্দেহ সৃষ্টি হত।

★ وَجهُ اِتيانِ الضَّميرِ الفَصْل যমীরে فاصل আনার কারণ ঃ

واولئك هم المفلحون আয়াতাংশে اولئك ইসমে ইশারা মুবতাদা ও المفلحون খবরের মাঝে هم ضمير فصل আনার কয়েকটি কারণ রয়েছে। আর তা হল–

১. মুবতাদা ও খবরকে মওসূফ ও সিফাতের থেকে পার্থক্য করার জন্য। অর্থাৎ সুস্পষ্টভাবে বুঝাবার জন্য যে, اولئك মুবতাদা, এটি মওসূফ নয়। আর المفلحون খবর এটি সিফাত নয়। কেননা বৈকরণিক নিয়ম মতে, مشار اليه যদি معرف بالام হয় তাহলে সেটি খবর ও সিফাত উভয়টি হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। অতএব এখানে المفلحون কে معرف بالام দেখে যাতে কেউ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পতিত না হয় যে, এটি খবর হয়েছে নাকি সিফাত হয়েছে। তাই ضمير فصل - هم উল্লেখ করে এ দ্বিধা দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের অবসান করা হয়েছে। কেননা موصوف ও তার صفت এর মাঝে আনা জায়েয নয়।

২. تاكيد نسبت এর জন্য মুবতাদা ও খবরের মাঝে ضمير فصل আনা হয়েছে। আর ضمير فصل দ্বারা تاكيد نسبت এভাবে হয়েছে যে, هم ضمير فصل যেহেতু দ্বিতীয় মুবতাদা হয়েছে। কাজেই এর দ্বারা تكرار نسبت হয়েছে। আর تكرار দ্বারা تاكيد সৃষ্টি হয়।

৩. مسند কে مسند اليه এর জন্য খাস করার উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ ضمير فصل উল্লেখ করলে বালাগাতের নিয়ম অনুযায়ী, اِخْتِصاصُ الْمُسْنَدِ بِالْمُسْنَدِ اليه এর ফায়েদা দেয়।

س (٢٣) : مَا الْفَرْقُ بَيْنَ قولِهِ تعالى أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ وبَيْنَ قوله أُولَئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِم وأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ انَّ وَسَطَ حرفِ الْعَطْفِ فِى الثَّانِى لاَ فِى الْاَولِ ـ

উত্তর ঃ অত্র আয়াতে উভয় বাক্যের মাঝে হরফে আত্‌ফ আনার কারণ হল, উভয় বাক্যের مفهوم (মর্ম) এবং وجود (অস্তিত্ব) এর মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে।

মর্মের মধ্যে ভিন্নতা এভাবে যে, প্রথম বাক্যের মর্ম হল– মুত্তাকীদের হিদায়েতপ্রাপ্ত হওয়া। আর দ্বিতীয় বাক্যের মর্ম হল– তাদের কৃতকার্য হওয়া। আর وجود (অস্তিত্বের) মধ্যে ভিন্নতা হল– হিদায়েত প্রাপ্ত, ইহলৌকিক জীবনে হওয়া আর কৃতকার্যতা পারলৌকি জীবনে। আয়াতের মধ্যে উভয়কে পৃথক পৃথকভাবে প্রমাণিত করা উদ্দেশ্য। অতএব উভয় বাক্যের مفهوم (মর্ম) ও وجود (অস্তিত্ব) এর মধ্যে ভিন্নতার কারণে বাক্যদ্বয়ের মাঝে كمالِ اِتّصال নেই। তবে خبريت এর দিক দিয়ে অভিন্ন হওয়ার কারণে এবং خبر এর মধ্যে পরস্পর مُنَاسبت থাকার কারণে مُتَوَسِّط بَيْنَ الكَمَالَيْن হয়েছে। আর توسُّط بين الكمالين এর সময় এক বাক্যকে অপর বাক্যের উপর عطف করা হয়। এ কারণে অত্র আয়াতে উভয় বাক্যের মাঝে حرف عطف আনা হয়েছে।

উভয় বাক্যের مخيبر عنه এর اتحاد সুস্পষ্ট। আর উভয় خبر অর্থাৎ على هدى ও المفلحون এর মাঝে علت ও معلول এর مناسبت রয়েছে। কেননা ইহলৌকিক জীবনে হিদায়েতের উপর থাকা পারলৌকিক জীবনে কৃতকার্য হওয়ার জন্য علت।

পক্ষান্তরে أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ আয়াতে উভয় বাক্যের مفهوم (মর্ম) অভিন্ন। কেননা উভয় বাক্যের مخبر عنه অভিন্ন হওয়ার সাথে সাথে مخبر ও অভিন্ন। কারণ দ্বিতীয় বাক্যে যাদেরকে গাফিল বলা হয়েছে প্রথম বাক্যে তাদেরকেই গাফলতীর দিক দিয়ে চতুষ্পদ জন্তুর সাথে তুলনা করা হয়েছে। মোটকথা তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত গাফিল। অতএব দ্বিতীয় বাক্যে গাফলতীর হুকুম আরোপ করা, আর প্রথম বাক্যে চতুষ্পদ জন্তুর সাথে তুলনা করা অভিন্ন বিষয়।

সারকথা হল– দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যের জন্য তাকিদ হয়েছে। আর تاكيد ও مؤكد এর মাঝে كمال اتصال থাকে। আর كمال اتصال এর সম্পর্ক বিশিষ্ট দু'টি বাক্যের মাঝে حرف عطف আনা হয় না।

অতএব উক্ত আয়াতের উভয় বাক্যের মাঝে كَمالِ اتصال থাকার কারণে حرف عطف উল্লেখ করা হয়নি।

س (٢٤) : فَبَشِّرِ الأيَةَ اولَئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ كما فسَّرها الْبَيْضَاوِى

উত্তর ঃ সূরায় ফাতিহার শেষে বান্দা আল্লাহর রাজকীয় দরবারে صراط مستقيم প্রাপ্তির প্রার্থনা করেছিল। আর صراط مستقيم এর জন্য كتاب الله ও رجال الله উভয়ই আবশ্যক। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা ذالك الكتاب এর মধ্যে كتاب الله এর পরিচয় দিয়েছেন এবং তার সাথে সাথে رجال الله এর পরিচয়ের দিকেও ইঙ্গিত করেছেন। আর তাহল এ সকল গুণাবলী সম্পন্ন লোকেরাই মূলত رجال الله - صراط مستقيم লাভের জন্য যাদের অনুসরণ করা তোমাদের জন্য অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ অদৃশ্যের প্রতি অটুট বিশ্বাস, সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা এবং কুরআনুল কারীম ও পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ইত্যাদি গুণাবলী সম্পন্ন ব্যক্তিরাই আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়েত প্রাপ্ত এবং পরকালে কৃতকার্য হবে।

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়– প্রশ্নটি হল على অব্যয়টি استعلاء এর জন্য ব্যবহৃত হয়। যার জন্য جسم তথা দেহ বিশিষ্ট বস্তু হওয়া আবশ্যক। অথচ هدايت এর কোন جسم নেই। তাহলে এখানে على ব্যবহার করা হল কিভাবে?

এ প্রশ্নের উত্তর হল– মুত্তাকীদের হিদায়েতের উপর অটল অবিচল থাকায় هدايت কে جسم বিশিষ্ট বস্তুর সাথে তুলনা করে على অব্যয় ব্যবহার করা হয়েছে। আর هدى শব্দটি عظمت বা উঁচু মর্যাদা বুঝাবার জন্য نكره ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা হেদায়েতের সুউচ্চ আসনে সমাসীন রয়েছে। যে সীমায় অন্যরা পৌঁছতে পারবে না। আয়াতের মধ্যে مفلح শব্দটি فلاح হতে নিষ্পন্ন। আর فلاح বলা হয় কাংখিত টার্গেটে পৌঁছে যাওয়া। যার অর্থ হল– যেন মুত্তাকীদের জন্য সফলতার সকল রাস্তা উন্মোচন করে দেয়া হয়েছে। আর তারা এ সকল রাস্তায় কাংখিত গন্তব্যে উপনীত হয়েছে। আল্লামা বায়যাবী (রহ) আয়াতের মধ্যে এক নিগুঢ় তত্ত্বের অবতরণা করেছেন। তাহল এই যে, اسم اشارة দ্বারা বাক্য গঠন করা দ্বারা সংক্ষিপ্তভাবে মুত্তাকী হওয়ার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। আর مسند اليه কে পুনঃবার উল্লেখ করা, দুই বাক্যের মাঝে حرف عطف উল্লেখ করা এবং ضمير فصل ইত্যাদি দ্বারা মুত্তাকীদের সুউচ্চ মর্যাদা প্রকাশ করা হয়েছে। এবং সর্ব সাধারণদেরকে তাদের অনুসরণ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

س (٢٥) : إِنَّ اللّٰهَ لَايَسْتَحْيِيْ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ـ

الف : اذكرْ اِرْتِبَاط الْاٰيةِ بِمَاقَبْلَهَا مَعَ ذِكْرِ شَاْنِ نُزُوْلِهَا ـ

ب : ما معنٰى الحَيَاءِ ومَا هُوَ المشْتَقُّ مِنه؟

ج : ما هُو حُسْنُ التَّمْثِيْل ومَا هُوَ الحَقُّ له ومَا الشرطُ فيه؟ بَيِّنْ عَلٰى نهجِ المُفسِّرِ العَلّام؟

د : ما مَعنى الْاِسْتِحْيَاء لُغةً واصطلاحًا وكيفَ يصِحُّ اِسْنَادُ الْاِسْتِحْيَاءِ اِلَى اللّٰهِ تعالٰى معَ اَنَّهَ مِنْ قَبِيْلِ الْاِنْفِعَالِ الَّذِىْ لَايَلِيْقُ بِشَانِهٖ تعَالٰى؟

ه : مَثَلًا فِىْ اىِّ محلٍّ مِّنَ الْاِعْرَاب؟

و : قوله فما فَوْقَها عَلامُ عُطِفَ وما مَعْنَاه؟

উত্তর ঃ الف : اِرْتِباطُ الْاٰيةِ بما قَبْلَها (পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর সাথে অত্র আয়াতের যোগসূত্র) ঃ

আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) পূর্ববতী আয়াতগুলোর সাথে অত্র আয়াতের যোগসূত্র সাধনে দু'টি দিক উল্লেখ করেছেন,

১. পূর্ববর্তী আয়াত مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِىْ اسْتَوْقَدَ نَارًا الخ এবং او كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاء الخ ইত্যাদি আয়াতে মুনাফিকদের আচার-আচরণের কতিপয় তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। আর অত্র আয়াতে দৃষ্টান্ত ও উপমার শর্ত, এর জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান এবং উপমার উৎকৃষ্ট পদ্ধতি কি তা বর্ণনা করে বুঝিয়েছেন যে, উপমা দ্বারা আলোচ্য বিষয়বস্তুকে সুন্দরভাবে বুঝানো উদ্দেশ্য থাকে। আর উপমিত বস্তু বৃহৎ ও হতে পারে আবার ক্ষুদ্রতম ও হতে পারে। বাস্তবানুগ উপমিত বস্তু ক্ষুদ্র হলেও তাতে সংকোচের কিছু নেই। এ সূত্রেই অত্র আয়াতটির সাথে পূর্ববর্তী আয়াতের সম্পর্ক বিদ্যমান।

২. وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا আয়াতে আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনের সত্যতা প্রমাণের জন্য অপরিণামদর্শী কাফির মুশরিকদের প্রতি চ্যালেঞ্জ করেছেন। চ্যালেঞ্জ হলো এই যে, যদি তোমরা পবিত্র কুরআনকে আল্লাহর কালাম বিশ্বাস না কর বরং এটি মানব রচিত গ্রন্থ বলে ধারণা কর (নাউযুবিল্লাহ)

তবে পবিত্র কুরআনের মাত্র তিনটি আয়াত বিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্রতম সূরার ন্যায় একটি সূরা রচনা করে পেশ করো। আর এ কাজে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের যত সাহায্যকারী রয়েছে সকলের সাহায্য-সহয়তা গ্রহণ করতে পার।

কিন্তু কোরআনের এ চিরন্তন চ্যালেঞ্জের জবাব দেওয়া কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাদের এ ব্যর্থতা কুরআনের সত্যতা প্রমাণ করে। অতঃপর মানুষ দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে যায়। এক: পবিত্র কুরআনের বিশ্বাসী, দুই: পবিত্র কুরআনের অবিশ্বাসী দল। আল্লাহ পাক এদের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করার পর পবিত্র কুরআন সম্পর্কে অবিশ্বাসীদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত প্রশ্নাবলীর উত্তর দিয়েছেন অত্র আয়াতে। তাদের একটি প্রশ্ন ছিল। কুরআন আল্লাহর কালাম হলে তাতে মশা, মাছি ইত্যাদি নিকৃষ্ট জীবের উল্লেখ হত না। এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে অত্র আয়াতে।

شان نزول الاية **(আয়াতের শানে নুযুল)** ঃ অত্র আয়াতের শানে নুযুলে দুই ধরনের ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়।

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা যখন দু'টি উপমার মাধ্যমে মুনাফিকদের অবস্থা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন। তখন কাফিররা বলে বেড়াতে লাগল যে, আল্লাহ তাআলা এ ধরনের উপমা পেশ করার থেকে অতি উর্ধ্বে ও পবিত্র। অতএব এগুলো আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে হতে পারেনা। তখন তাদের হটকারিতামূলক অবান্তর কথার জবাবে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

২. وَاِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ لَا يَسْتَنْقِذُوْا مِنْهُ আয়াতে মুশরিকদের প্রতিমার অক্ষমতা এবং كبيت العنكبوت আয়াতে তাদের প্রতারণা উল্লেখ করেন যাতে মাছি ও মাকড়শার দ্বারা উপমা দেয়া হয়েছে। তখন আল্লাহদ্রোহী কাফিররা এক অমূলক সন্দেহ পোষণ করল। তারা নাক ছিটকিয়ে বলতে লাগল যে, কুরআন যেহেতু মহান আল্লাহর বাণী এক মহান গ্রন্থ। অতএব এর উপমাও তেমনি উচ্চমানের হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তা না করে এরূপ তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রাণী দ্বারা উপমা দেয়ার কারণ কি?

অত্র আয়াতে তাদের এ অমূলক সন্দেহ অপনোদন করে বলা হয়েছে যে, এসব তুচ্ছ ও নগন্য বস্তু দ্বারা উপমা দেয়ার তাৎপর্য হল– অনুরূপ উপমা মানুষের জন্য এক পরীক্ষাও এবং এসব দৃষ্টান্ত দূরদর্শী চিন্তাশীলদের জন্য হেদায়েতের উপকরণ যোগায়। আর চিন্তাশক্তি বিবর্জিত দুর্বিনীতদের পক্ষে অধিকতর পথভ্রষ্টতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পরিশেষে একথা বলা হয়েছে যে, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এসব উপমা দ্বারা এমন উদ্ধত ও অবাধ্যজনই বিপথগামী হয় যারা আল্লাহ পাকের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, এবং যেসব সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ পাক নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে।

ب : مَعْنَى الْحَيَاءِ لُغَةً (حياء এর আভিধানিক অর্থ) ঃ حياء এর প্রচলিত অর্থ লজ্জা, শরম। তবে আভিধানিক মূল অর্থ বর্জন করা, বিরত থাকা।

مَعْنَى الْحَيَاءِ إِصْطِلَاحًا (حياء এর পারিভাষিক অর্থ) ঃ

اَلْحَيَاءُ هُوَ تَوَاضُعٌ وَانْكِسَارٌ يَعْتَرِىْ الْاِنْسَانَ مِنْ خَوْفِ مَّا يُعَابُ وَيُذَمُّ

অর্থাৎ গর্হিত কাজ করার সময় শাস্তির ভয় বা লোক নিন্দার গ্লানিতে আন্তরিক সংকোচবোধকে حيا বলা হয়।

পরিণাম চিন্তা করে কোন মন্দ কাজ বর্জন করাকে حياء বলে। আর কোন গর্হিত কাজ করে গ্লানিবোধ করাকে خجل বলে। حياء হল লজ্জাশীলতা। এর বিপরীত শব্দ وقاحه, অর্থাৎ লজ্জা শূণ্যতা, ঘৃণিত কাজে দুঃসাহসিকতা ও স্পর্ধা।

اَلْمُشْتَقُّ مِنْه لِلْحَيَاءِ (حياء **শব্দের উৎসমূল**) ঃ

الحياء শব্দটি حَيٌّ থেকে নির্গত যার অর্থ জীবন ও প্রাণ। حَيَاء তথা লজ্জাশীলতা প্রাণশক্তির সাথে সম্পৃক্ত বিধায় একে حياء বলা হয়।

ج : حُسْنُ التَّمْثِيْلِ (**উপমার উৎকৃষ্টতা**) ঃ উপমা ও দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কোন বক্তব্যকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত করা হয়। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ পাক বহু উপমা উপস্থাপন করেছেন। আর আল্লাহ পাকের যাবতীয় কার্যাবলী উত্তম ও উৎকৃষ্ট, অতএব এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উপমা ও দৃষ্টান্ত পেশকরা একটি উৎকৃষ্ট কাজ।

حَقُّ التَّمْثِيْلِ وشَرْطُهُ (**উপমার জন্য আবশ্যকীয় বিষয় ও তার শর্ত**) ঃ উপমা ও দৃষ্টান্তের জন্য শর্ত ও আবশ্যকীয় হল উপমা ও উপমেয় (مثال ও مُمَثَّل لَهُ) উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য থাকা। বক্তার ব্যক্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের সাথে উপমার সামঞ্জস্য থাকা জরুরী নয়। প্রতিপাদ্য বিষয়কে শ্রোতাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্য নিকৃষ্ট, নগণ্য ও ঘৃণ্য বস্তুর উল্লেখ করা কোন ক্রটি ও অপরাধ নয় কিংবা বক্তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহান মর্যাদার পরিপন্থীও নয়। প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে এরূপ উপমা বর্জন করা মোটেও বাঞ্ছনীয় নয়।

د : معنى الْاِسْتِحْيَاءِ لغةً (استحياء **এর আভিধানিক অর্থ**) ঃ استحياء শব্দটি حياء থেকে বাবে استفعال এর মাসদার। এর অর্থ লজ্জাবোধ করা, সংকোচ বোধ করা, সংকোচবোধ করে কোন কাজ থেকে বিরত থাকা।

مَعْنَى الْاِسْتِحْيَاءِ اِصْطِلَاحًا (استحياء এর পারিভাষিক অর্থ) ঃ استحياء ও حياء পারিভাষিক দৃষ্টিতে সমর্থবোধক অর্থাৎ লোক-নিন্দার ভয়ে গর্হিত কাজ বর্জন করা।

نِسْبَةُ الْاِسْتِحْيَاءِ اِلَى اللّٰهِ (আল্লাহ পাকের সাথে استحياء এর সম্বন্ধ) ঃ اِسْتِحْيَاءِ ও حَيَاء শব্দে اِنْقِبَاضُ النَّفْس অন্তরের সংকোচবোধের অর্থ রয়েছে। যা সৃষ্টিজীবের বৈশিষ্ট্য। যেহেতু স্রষ্টা তথা আল্লাহ্ তা'আলা অন্তর, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হতে পুতঃ পবিত্র। অতএব তিনি আন্তরিক সংকোচবোধ হতে মুক্ত। ফলে আল্লাহর সাথে استحياء এর সম্বন্ধ হতে পারে না। তদুপরি অত্র আয়াতে এমনিভাবে اِنَّ اللّٰهَ يَسْتَحْيِى مِنْ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ الخ
اِنَّ اللّٰهَ حَيِّى كَرِيْمٌ الخ ইত্যাদি হাদীসে আল্লাহ পাকের সাথে حياء এর সম্বন্ধ করা হল কিভাবে?

আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) এর জবাবে বলেছেন, এখানে ملزوم বলে لازم উদ্দেশ্য। অর্থাৎ লজ্জাবোধের জন্য لازم হল মন্দ বা গর্হিত কাজ পরিত্যাগ করা। অতএব اِنَّ اللّٰهَ لَايَسْتَحْيِى الخ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা দৃষ্টান্ত বর্ণনা পরিত্যাগ করেন না।

এমনিভাবে رحمة অর্থ নম্র হৃদয় হওয়া অথচ আল্লাহ তা'আলা হৃদয় হতে বিমুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাকে رحيم বলা হয়। এমনিভাবে غضب অর্থ প্রতিশোধ স্পৃহায় রক্ত উদ্বেলিত হওয়া। এগুলো সবই সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। স্রষ্টা এসব কিছু থেকে পুতঃপবিত্র। কেননা এগুলো انفعالات এর অন্তর্ভুক্ত। আর স্রষ্টা منفعل বা প্রতিক্রিয়াশীল নন। তদুপরি এ শব্দগুলোকে আল্লাহর সাথে সম্বন্ধ করা হয় এগুলোর لازمى অর্থের উপর ভিত্তি করে। মোট কথা استعارة تمثيليه বা استعارة تبعيه এর ভিত্তিতে استحياء শব্দকে আল্লাহর সঙ্গে সম্বন্ধ করা হয়েছে। অথবা صنعت مشاكله এর ভিত্তিতে কাফিরদের কথার জবাবে আল্লাহর সাথে استحياء কে সম্বন্ধ করা হয়েছে। কেননা কাফেরদের উক্তি اَلَايَسْتَحْيِى الرَّبُّ اَنْ يُمَثِّلَ بِالذُّبَابِ وَالْبَعُوْضَةِ এর জবাবে اِن اللّٰهَ لَايَسْتَحْيِى ان يَّضْرِبَ مَثَلًا الخ অবতীর্ণ হয়েছে।

مَحَلِّ اِعْرَاب এর مَثَلًا : ه مَثَلًا ঃ

مَثَلًا শব্দটি بَعُوْضَة এর حال হিসেবে منصوب হয়েছে। আর ذُو الْحَال بعوضة নাকেরা হওয়ার কারণে مثلا - حال কে مقدم করা হয়েছে।

و : فَمَا فَوْقَهَا এর معطوف عليه ঃ

فَمَا فَوْقَهَا এর معطوف عليه সম্বন্ধে দুটি অভিমত রয়েছে।

১. فما فوقها এর معطوف عليه হল بعوضة।

২. مابعوضة এর প্রারম্ভের ما অব্যয়টি যদি اسم অর্থাৎ ما টি موصوفه ـ موصوله বা استفهامية এর জন্য হয় তাহলে ما অব্যয়টিই فما فوقها এর معطوف عليه হবে।

فما فوقها এর তাফসীর ঃ

فما فوقها এর দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে।

১. যা দেহাবয়ব বা শারীরিক গঠন মশার চেয়ে বৃহৎ যেমন, মাছি, মাকড়শা ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ হবে, আল্লাহ পাক মশার উপমা পেশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। অতএব অতি উত্তমরূপে এর চেয়ে বৃহৎ বস্তুর উপমা পেশ করেন।

২. অথবা তুচ্ছতা ও নগণ্যতায় যা মশার চেয়ে হীন। যেমন– মশার ডানা, যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে-

لَوْكَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَاسَقٰى مِنْهَا كَافِرًا شَرْبَةَ مَاءٍ

এমতাবস্থায় আয়াতের তরজমা হবে, আল্লাহ তা'আলা মশা বা তার চেয়ে তুচ্ছ ও নগণ্য বস্তুর উপমা পেশ করতে লজ্জাবোধ করেন না।

س (٢٦) : كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ اِسْتِخْبَارٌ فِيْهِ اِنْكَارٌ وتعجيبٌ لِكُفْرِهم بِاِنْكَارِ الْحال الّتى يَقَعُ الكفرُ عَلَيْها على الطريقِ الْبُرْهَانِىْ الخ ـ

الف : اوضح العبارةَ المذكورَةَ ـ

ب : ما الفرقُ بيْنَ الْاِسْتِخْبَار وَالاِسْتِفْهام؟

ج : وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ـ فسِّرِ الْاٰيةَ مَعَ اِيْضَاحِ مَعْنٰى الْاَمَاتَةِ وَالْاِحْيَاءِ ـ

د : ما الحِكْمَةُ فى عَطْفِ اَحْيَاكُمْ بالفاءِ والبَواقِىْ بِ "ثُمَّ" ؟

ه : مَاذا يكونُ مَعْنٰى الْحَيٰوةِ اذا وُصِفَ بِها البارِى تَعالى؟ بَيِّنْ مُوَضِّحًا ـ

উত্তর ঃ توضيح العبارة **(ইবারতের বিশ্লেষণ)** ঃ আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) এর উল্লেখিত ইবারত হৃদয়ঙ্গম করতে হলে কতিপয় বিষয় পূর্বে জেনে রাখা আবশ্যক। আর তা হলো كَيْفَ অব্যয়টি اِسْتِفْهام عَنِ الْحَال অর্থাৎ সাধারণভাবে অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসার জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু كيف কোন ক্রিয়ার পূর্বে প্রবিষ্ট হলে উক্ত ক্রিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত অবস্থাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসার অর্থ প্রদান করে।

২. استفهام দ্বারা তিনটি বিষয় উদ্দেশ্য – ক. جملهٔ اِسْتِفْهامِيَة এর বিষয়বস্তুর অস্বীকৃতি। খ. বিস্ময় জ্ঞাপন। গ. শ্রোতাকে বিস্ময়াভূত করা।

৩. لازم এর نفى ـ ملزوم কে অবশ্যম্ভাবী করে।

তাফসীরকারক আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) বলেন– كَيْفَ تَكْفُرُون بِاللّٰه এর মধ্যে যে استفهام রয়েছে তাদ্বারা তাদের কুফরীকে অস্বীকৃতি জানানো অথবা তাদের কুফরীর কারণে বিস্ময়জ্ঞাপন করা উদ্দেশ্য।

কুফরীকে অস্বীকৃতি জানানোর অর্থ এই যে, তোমাদের থেকে কুফর প্রকাশ পাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা পরিশুদ্ধ বুদ্ধি-বিবেক কুফরকে সমর্থন করে না। বিস্ময়জ্ঞাপন করার অর্থ হলো, সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের কাফিরদের অবস্থার জন্য বিস্ময়জ্ঞাপন করতে উদ্বুদ্ধ করা। যেন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন কাফির না হওয়ার উপকরণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কাফির হওয়া বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য বড় বিস্ময়ের কাণ্ড।

তোমরা জান যে, আল্লাহ তোমাদের মৃত্যু তথা অস্তিত্বহীন থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আবার তোমাদের মৃত্যু দিবেন, পুনরায় আবার জীবিত করবেন। আল্লাহর এ কারিগরী, শক্তিমত্তা তাকে অস্বীকার না করার প্রতি আহ্বান করে। এতদসত্ত্বেও তোমাদের তাকে অস্বীকার করাটা প্রত্যেক বিশুদ্ধ জ্ঞানবানকে বিস্মিত করে।

كيف যদিও حال كفر এর অস্বীকার বুঝায় কিন্তু إِسْتِدْلَالِى তরীকায় এর দ্বারা মূল কুফরের অস্বীকার বুঝানো হয়েছে। কেননা কুফরের বিকাশ কোন حال মুক্ত নয়। যেহেতু كفر হল ملزوم আর حال হল لازم – সেহেতু كَيْفَ تَكْفُرُونَ এর দ্বারা যখন তাদের এমন এক حال كفر এর অস্বীকার করা হয়েছে যাতে কুফর বিদ্যমান রয়েছে। এর দ্বারা وجود كفر এর অস্বীকার অবশ্যম্ভাবী হয়েছে।

ب : اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْاِسْتِفْهَامِ وَالْاِسْتِخْبَارِ (استفهام ও اِسْتِخْبَار এর মধ্যেকার পার্থক্য) ঃ

اِسْتِفْهَام অর্থ طَلَبُ الْفَهْمِ অর্থাৎ কোন বিষয় বুঝতে চাওয়া আর استخبار অর্থ طلبُ الْخَبرِ بِالْجَوَابِ উত্তরের মাধ্যমে সংবাদ জানতে চাওয়া।

উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো

اَلْاِسْتِخْبَارُ لَا يَقْتَضِىْ عَدَمُ الْعِلْمِ بِخِلَافِ الْاِسْتِفْهَام অর্থাৎ استخبار জিজ্ঞাসাকারীর অজ্ঞতা বুঝায় না পক্ষান্তরে استفهام জিজ্ঞাসাকারীর অজ্ঞতা বুঝায়।

কারো কারো মতে উভয় শব্দ সমর্থবোধক।

ح : تفسيرُ قوله تعالى وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ـ

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আত্মবিস্মৃত মানবজাতিকে তার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছেন– হে মানব জাতি! ইতিপূর্বে তুমি প্রাণহীন বস্তু ছিলে। নিষ্প্রাণ বস্তু ছিলে। সর্ব প্রথম عناصر اربعه (পদার্থ চতুষ্টয়) তথা জল, বায়ু, অগ্নি ও মৃত্তিকার আকৃতি ছিলে। অতঃপর এর থেকে জনক জননীর খাদ্যের রূপ ধারণ করেছিলে। অতঃপর তা থেকে পিতা-মাতার দেহে اخلاط اربعه (মিশ্রণ পদার্থ চতুষ্টয়) তথা রক্ত,কফ, পিত্ত ও سوداء রূপান্তরীত হয়। আর এর থেকে সৃষ্টি হয় বীর্য। বীর্য মাতার গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট করে, পর্যায়ক্রমে তা মাংস পিন্ড ও পূর্ণাঙ্গ বা অপূর্ণাঙ্গ দেহের রূপ লাভ করে। তাহলে বুঝা গেল মানুষ সৃষ্টির সূচনা এ সকল নিষ্প্রাণ পদার্থ থেকে হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে জীবিত করেছেন।

ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অনুকণা পদার্থকে একত্রিত করে তাতে প্রাণ সঞ্চারণ করেছেন। আবার আল্লাহ তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, আবার পুনরুজ্জীবিত করবেনও তিনিই। অর্থাৎ যিনি নিষ্প্রাণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অসংখ্যা অনুকণা ও পদার্থ সমন্বয়ে বিভিন্ন ধাপ অতিক্রান্ত করার পর তাতে প্রাণ সঞ্চার করেছেন। তিনিই আবার তোমাদের আয়ুর নির্ধারিত কাল পেরিয়ে গেলে তোমাদের জীবন শিখা নিভিয়ে দিবেন এবং এক নির্ধারিত সময়ের পর কেয়ামতের দিন তোমাদের দেহের নিষ্প্রাণ বিক্ষিপ্ত কণাগুলোকে আবার সমন্বিত করে তোমাদের পুনরুজ্জীবিত করবেন। অতঃপর কিয়ামত দিবসে তোমাদের যাবতীয় কৃতকার্যের প্রতিদান প্রদান করবেন।

تَوْضِيحُ مَعْنَى الْإِمَاتَةِ وَالْإِحْيَاءِ (মৃত্যু ঘটানো ও জীবিত করণের ব্যাখ্যা) ঃ

প্রথম মৃত্যু হল মানুষের সৃষ্টি ধারার সূচনা পর্বের নিষ্প্রাণ ও জড় অবস্থা। তা থেকে আল্লাহ তা'আলার প্রাণ সঞ্চারণ করা হল প্রথম জীবিত করা। আর দ্বিতীয় মৃত্যু হল মানুষের আয়ু শেষ হয়ে যাওয়াকালীন মৃত্যু। আর কিয়ামত দিবসে জীবন লাভ হল তৃতীয় জীবিতকরণ-এর মাঝে কবরের জীবনে কল্পনাময় স্বাপ্নিক জীবন হল দ্বিতীয় জীবিতকরণ।

الحِكْمَةُ فِي عطفِ فَاَحْيَاكُمْ بالفاءِ والبَواقِي بِ ثُمَّ : د

احياكم কে فاء অব্যয় দ্বারা এজন্য عطف করা হয়েছে যে, احياء যার উপর عطف করা হয়েছে তার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টির পূর্বে নিষ্প্রাণ অনুকণা ও পদার্থরূপে যত ধাপ পার হয়েছে তার শেষে রয়েছে পূর্ণাঙ্গ বা অপূর্ণাঙ্গ প্রাণহীনদেহ অব্যবহিত পরে احياء এর ধাপ। এজন্য فاء অব্যয় দ্বারা عطف করা হয়েছে। কেননা فاء অব্যয়টি تعقيب بِلا تَراخِي অর্থে ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে অপরাপর (অর্থাৎ ثم يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُم)। এগুলোর মাঝে ثم অব্যয় ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা বাস্তব ক্ষেত্রে এগুলোর পরস্পরের মাঝে দীর্ঘ কালের ব্যবধান রয়েছে। আর ثم অব্যয় تعقيب مع التراخي বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

مَعْنَى الحَيواة فِي وَصْفِ الْبَارِي : ه (حَيوة শব্দকে আল্লাহর সঙ্গে সম্বন্ধ করলে তার মর্ম)

حيوة শব্দের মূল অর্থ ১. কারো মতে অনুভূতি শক্তি। ২. কারো মতে, অনুভূতি শক্তির উপযোগিবস্তু।

[حيوة শব্দকে যখন আল্লাহর সঙ্গে সম্বন্ধ করা হয় তখন তার মর্ম হল, আল্লাহ তা'আলা ইলম ও কুদরত গুণসম্পন্ন হওয়া যা আমাদের মধ্যে অনুভূতি শক্তির জন্য অপরিহার্য।

س (٢٧) : هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوّٰاهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ـ

الف : اللامُ فى قولِه تعالىٰ لَكُمْ لِلْاِنْتِفاعِ فكيف يكونُ بعضُ الاشياءِ مُضِرًّا لنا وقولُه جَمِيْعًا يُنْبِئُ انَّا مُشْتَرِكُوْنَ فِىْ جَمِيعِ مَا فِى الْاَرْضِ فكيف يخُصُّ بعضُ الْاشياءِ بِبَعْضِنَا ؟ اجب مفصَّلا ـ

ب : اَلْاِسْتِواءُ مِنْ خَواصِّ الْاَجْسَامِ فَكَيْفَ يَصِحُّ نِسْبَتُه اِلى اللّٰهِ سُبحانَه وتعالىٰ؟

ج : هٰذه الْاٰيَةُ تُنْبِئُ اَنَّ خَلْقَ الْارضِ مقدَّمٌ وقولُه تعالىٰ وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحٰهَا يَدُلُّ عَلٰى اَنَّه مُؤَخَّرٌ فكيفَ التوفيقُ؟ فصِّل ـ

د : اَثْبَتَ اَصحابُ الْاَرْصادِ تِسْعَةَ اَفْلَاكٍ وفِى الْاٰيةِ سَبْعَةٌ فما الجوابُ؟

একটি প্রশ্ন ও তার সমাধান ঃ

উত্তর ঃ (الف) هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ এর لام হরফে জরটি تعليل অথবা انتفاع এর অর্থ প্রদান করেছে। لام অব্যয়টি যদি انتفاع এর অর্থ প্রদান করে তাহলে আয়াতের অর্থ হবে। তিনিই সে মহান আল্লাহ যিনি তোমাদের উপকারার্থে জগতের যাবতীয় বস্তু সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন।

এখন একটি প্রশ্ন দেখা দেয় তাহলো আমরা বাস্তব ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ করলে দেখতে পাই জগতের অনেক বস্তু এমনও রয়েছে যা মানুষের জন্য উপকারী নয় বরং অপকারী। তাহলে আয়াতে জগতের যাবতীয় বস্তু নিয়ে মানুষের উপকারার্থে সৃষ্টি করা হয়েছে এমন দাবী করাটা কতটুকু যুক্তিযুক্ত?

এ প্রশ্নের উত্তরে আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) যে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন তাহল, জগতের কোন বস্তুই এমন নেই, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের উপকার সাধন করেনা– তা সে উপকার ইহলৌকিক হোক, বা পারলৌকিক হোক। জগতের অনেক বস্তু সরাসরি মানুষের আহার ও ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয় বলে সেগুলোর উপকার অনুধাবনযোগ্য। আবার এমনও অগণিত বস্তু রয়েছে, যার আবেদন ও উপকারিতা মানুষ অলক্ষ্যে ভোগ করে যাচ্ছে, অথচ তা অনুধাবন করতে পারছে না। এমনকি বিষাক্ত দ্রব্যাদী, বিষধর জীবজন্তু প্রভৃতি যেসব বস্তু

দৃশ্যত মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করা হয়; গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায়, সেগুলোও কোন না কোন দিক দিয়ে মানুষের জন্য কল্যাণকরও বটে।

জগতের অনেক বস্তু দ্বারা পারলৌকিক উপকার সাধিত হয়। যেমন, অনেক নেয়ামতরাজি এমন আছে যা দ্বারা আল্লাহর পরিচয় লাভ করা যায়। আবার অনেক বস্তু এমন আছে যা আল্লাহর গুণাবলী বুঝায়। অনেক এমনও আছে যাদ্বারা শিক্ষা বা উপদেশ লাভ হয়। আবার এগুলো দেখে পারলৌকিক নেয়ামত ও শাস্তি অনুমান করা যায়। মোট কথা জগতের এমন কোন বস্তু নেই যা কোন না কোন ভাবে মানুষের কল্যাণ সাধন করে না।

একটি বিভ্রান্তির অপনোদন ঃ اباحية নামক একটি ভ্রান্ত সম্প্রদায় রয়েছে যাদের মতে জগতের প্রত্যেক বস্তু প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য হালাল। কোন বস্তুর উপর কোন ব্যক্তির বিশেষ মালিকানা অনুমোদিত নয়। তারা তাদের এ মতের স্বপক্ষে উল্লেখিত আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করে। কেননা অত্র আয়াতে বলা হয়েছে, জগতের সকল বস্তু তোমাদের কল্যাণ ও উপকারের সৃষ্টি করা হয়েছে, এর দ্বারা বুঝা যায় কোন বস্তু কারো বিশেষভাবে মালিকানাধীন নয়।

আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) لَا يَمْنَعُ اِخْتِصَاصُ بَعْضِهَا الخ বলে তাদের এ যুক্তি খন্ডন করেছেন। যার সার কথা হল– অত্র আয়াতের অর্থ যদি এই হত যে, জগতের প্রত্যেকটি বস্তু প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বৈধ তাহলে তাদের এ যুক্তি সঠিক বলে বিবেচিত হত। অথচ আয়াতের মর্ম এটা নয়। বরং আয়াত দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, জগতের যাবতীয় বস্তুসমষ্টি সমষ্টিগতভাবে তোমাদের সকলের জন্যে। এখন কোন কোন বস্তুতে যদি ক্রয়-বিক্রয়, দান, বিবাহ ইত্যাদি সূত্রে কারো জন্য সুনির্দিষ্ট মালিকানা প্রমাণিত হয় তাহলে তা আয়াতের মর্মের সাথে সাংঘর্ষিক হবে না. কেননা কোন কোন নির্দিষ্ট বস্তু যদি কারো কারো মালিকানায় থাকে তাহলে পরিভাষায় সামষ্টিকভাবে এ কথা বলা যায় যে, اِنَّ هٰذِهِ الْاَشْيَاءُ لَهُمْ অর্থাৎ এ সকল বস্তু তাদের জন্য।

ب : مَعْنَى الْاِسْتِوَاءِ (استواء **এর অর্থ) ঃ** استواء এর আভিধানিক অর্থ সোজা হওয়া, সমকক্ষ হওয়া, সুষ্ঠু হওয়া, স্থিত হওয়া ইত্যাদি।

পরিভাষায় استواء শব্দটি اعتدال অর্থে ব্যবহৃত হয়। اعتدال অর্থ মধ্যপন্থা অবলম্বন করা, সুষ্ঠু ও সঠিক হওয়া।

استواء শব্দটির সাথে اعتدال এর যোগসূত্র হলো اعتدال এর মধ্যে اجزاء (جسم) এর প্রণয়নে সোজা ও সঠিক করা হয়। অতএব اعتدال হল مسبب

আর সোজা ও সমতা হল سبب -এ জন্যই استوى কে রূপকার্থে اعتدال এর অর্থে ব্যবহার করা হয়।

إِطْلَاقُ الْإِسْتِوَاءِ عَلَى اللّٰهِ (মহান আল্লাহর জন্য استواء শব্দের প্রয়োগ) ঃ استوای শব্দটি আল্লাহর জন্য প্রয়োগ করা সঠিক নয়। কেননা استوای শব্দটি اعتدال অর্থ প্রদান করে। যা মহান আল্লাহর জন্যে প্রয়োগ করা শুদ্ধ নয়। কেননা اعتدال হল جسم এর বৈশিষ্ট্য, আর মহান আল্লাহর সত্তা جسم থেকে পূত-পবিত্র এজন্য আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) এর তাফসীর করেছেন- قَصْدُه إِلَيْهِ بِإِرَادَتِهِ

অর্থাৎ ঐচ্ছিকভাবে কারো দিকে মনোযোগী হওয়া। যেমন- আরবীভাষীরা বলে থাকে إِسْتَوٰى إِلَيْهِ كَالسَّهْمِ الْمُرْسَلِ অর্থাৎ সে তার প্রতি নিক্ষিপ্ত তীরের ন্যায় মনোযোগী হল। সকল কিছু থেকে বিমূখ হয়ে কেউ যখন কোন কিছুর দিকে নিবিষ্ট হয় তখন আরবীভাষীরা এ বাক্যটি ব্যবহার করে থাকে।

কারো কারো মতে, استوى অত্র আয়াতে إِسْتَوْلٰى বা ملك অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ কোন কিছুর উপর আধিপত্য বিস্তার করা। إِسْتَوٰى শব্দটি إِسْتَوْلٰى অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার পক্ষে প্রমাণ হিসেবে ইমাম বায়যাবী (রহঃ) এক কবির বক্তব্যকে উপস্থাপন করেছেন। কবির পংক্তি-

قَدِ اسْتَوٰى بِشْرٌ عَلَى الْعِرَاقِ * مِنْ غَيْرِ سَيْفٍ وَدَمٍ مُهْرَاقٍ -

'একজন মানব (বিশ্‌র ইবনে মারওয়ান) অসি ও রক্ত প্রবাহ ছাড়াই ইরাকের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে।"

ج : আসমান ও জমিনের কোনটি আগে সৃষ্টি করা হয়েছে ঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জমীন ও তন্মধ্য যাবতীয় যা কিছু রয়েছে তা প্রথম সৃষ্টি করা হয়েছে। পরে আসমান সৃষ্টি করা হয়েছে। পক্ষান্তরে সূরা আল নাযিআতের আয়াত وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا দ্বারা বুঝা যায়- প্রথমে আসমান সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পরে জমীন সৃষ্টি করা হয়েছে।

এ প্রশ্নের উত্তরে আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) বলেন, অত্র আয়াতে ثُمَّ অব্যয়টি تَرَاخِىْ فِى الرُّفْعَةِ এর জন্য ব্যবহৃত হয়নি বরং تَرَاخِىْ فِى الْوَقْفِ এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ ثم অব্যয়টি এখানে تَخْلِيْقِ مَا فِى الْاَرْضِ (জগতের যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি) এবং تَخْلِيْقِ آسْمَانَ (আসমানের সৃষ্টি) এর মাঝে তারতম্য বর্ণনা করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। সারকথা ثم অব্যয়টি ব্যবহার করে আসমান সৃষ্টিকে জগতের সৃষ্টির উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। যেমনিভাবে ثُمَّ كَانَ

মِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا আয়াতের মধ্যে ثم অব্যয়টি تَرَاخِىْ فِى الرُّفْعَةِ বা মর্যাদাগত ব্যবধান বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। অতএব ثم যেহেতু تَرَاخِىْ فِى الْوَقْف তথা সময়ের ব্যবধান বা আগে পিছে বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়নি। তাই এ দুয়ের মাঝে কোন বিরোধ নেই। অবশ্য যদি সূরা নাযিআতের আয়াতে والارض بعد ذالك دحها এর মধ্যে دحها কে বাক্যের সূচনা সাব্যস্ত করা হয় এবং الارض এর نصب এর জন্য اَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءُ بَنٰهَا এর সাথে সামঞ্জস্যশীল একটি فعل উহ্য গণ্য করা হয়। যেমন-

يَخْلُقُ الْاَرْضَ وَيُدَبِّرُ اَمْرَهَا بَعْدَ ذَالِكَ তাহলে উক্ত আয়াত দ্বারা আসমান সৃষ্টির পর জমীন সৃষ্টি করা হয়েছে এটা প্রমাণিত হয় না। কিন্তু এ ব্যাখ্যা বাস্তবতার পরিপন্থী।

د ঃ আসমানের সংখ্যা কতটি ঃ জ্যোতিষবিদগণ প্রমাণ করেছেন যে,আসমানের সংখ্যা মোট নয়টি অথচ কুরআনুল কারীমে সাত আসমান বলা হয়েছে। তাহলে ঐশীগ্রন্থ আল-কুরআন ও জ্যোতিষবিদদের বক্তব্য পরস্পব বিরোধ হয়ে যায়? এর উত্তরে আল্লামা নাসিরুদ্দীন বায়যাবী (রহঃ) বলেন, যে জ্যোতিষবিদদের বক্তব্য সন্দেহ নির্ভর ও সংশয়যুক্ত। পক্ষান্তরে আল কুরআনের বাণী চিরন্তন সত্য। অতএব জ্যোতিষীদের বক্তব্যকে কুরআনের মুকাবালায় দাঁড় করানো যায় না। আর বাস্তবেও যদি আসমানের সংখ্যা নয়টি হয় তাহলেও কুরআনের তথ্য ভুল হবে না, কেননা সাতটির বেশী আসমান নেই একথা কুরঅনের কোথাও বলা হয়নি। তাছাড়া কুরআনে বর্ণিত সাত আসমানের সাথে যদি আরশ ও কুরসী যোগ করা হয় তাহলে আসমানের সংখ্যা নয়টি হয়ে যায়। অতএব কোন বিরোধ নেই।

س (٢٨) : وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ ـ

الف : بَيِّنْ اِرْتِبَاطَ الْاٰيَةِ بِمَا قَبْلَهَا وَاَيْضًا قَوْله وَبَشِّر عَلَامَ عُطِفَ وَمَا الْمَقْصُوْدُ بِهٖ؟

ب : فَصِّل معنى الْبَشَارَةْ وَالصَّالِحَاتِ تَفْصِيْلا

ج : فَسِّر "جَنّٰت" على نَهْجِ الْمُفَسِّرِ الْعَلَّام

উত্তর ঃ ارتباط لاية بما قبلها (পূর্বের আয়াতের সাথে অত্র আয়াতের যোগসূত্র) ঃ পূর্বের আয়াতগুলোতে অবিশ্বাসীদের অশুভ পরিণতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আর অত্র আয়াতে মু'মিন বা বিশ্বাসীদের শুভ পরিণতি ও তাদের পারলৌকিক অনাবিল সুখ-শান্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

معطوف (وبشر এর المعطوف عليه ل"وَبَشِّرْ" والمقصودُ مِنْه عليه ও তার দ্বারা উদ্দেশ্য) ঃ আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) বলেন– ১. وبشر থেকে إِنْ كُنْتُمْ فِى رَيْبٍ থেকে هُمْ فِيهَا خَالِدُون পর্যন্ত বাক্য সমষ্টিকে পূর্বেকার أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْن পর্যন্ত বাক্য সমষ্টির উপর عطف করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল মু'মিন তথা বিশ্বাসীদের জান্নাতের অফুরন্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ ভোগ-বিলাস, বিমল আনন্দ স্ফূর্তি ও চরম তৃপ্তির আলোচনাকে অবিশ্বাসী কাফেরদের -চরম দুঃখ-দুর্দশা, এবং আযাব ও শাস্তির বর্ণনার সাথে عطف বা সম্পর্ক করা। কেননা আল্লাহর চিরন্তন নীতি হলো ভীতি প্রদর্শনের সাথে সাথে উৎসাহ প্রদান করা যাতে পরিত্রাণ লাভকারী আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয় এবং ধ্বংসাত্মক আমল পরিহার করে।

শুধুমাত্র بشر কে عطف করা হয়নি। কেননা তাহলে তার সাথে সাম স্যশীল امر ও نهى জাতী ক্রিয়া অন্বেষণ করে তার উপর عطف করা অবশ্যক হবে। কেননা عطف বা সংযোগের ক্ষেত্রে এরূপ সামঞ্জস্যতা আবশ্যক হয়।

২. وبشر এর معطوف عليه হল فَاتَّقُوا – وبشر এর সাথে এর সামঞ্জস্য হলো। কাফিরদের প্রতি কুরআনের ক্ষুদ্রতম একটি সূরা রচনার যে চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছিল বিরোধীরা তাতে ব্যর্থ হয় এবং নিজেদের অপারগতা প্রকাশ করে। ফলে পবিত্র কুরআনের অলৌকিকতা প্রতীয়মান হয় এবং যারা কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি তাদেরকে শাস্তি দেয়া অবধারিত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যারা কুরআনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তারা প্রতিদানের উপযুক্ত হয়ে যায়। তাই অবিশ্বাসীদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে এবং বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ শুনানো হয়েছে। অন্য এক قرأت (পাঠ্যনীতি) এ بشر (ماضى مجهول এর সীগা) রয়েছে। তখন بُشِّر এর معطوف عليه হবে أُعِدَّتْ। আর اعدت হবে جمله مستانفه।

تفصيلُ الْبَشَارةِ والصّالحات (بَشَارَة ও صَالِحَات এর বিশ্লেষণ) ঃ

بَشَارَة শব্দটি بَشَرَةٌ থেকে নিষ্পন্ন। بَشَرَةٌ অর্থ চামড়ার উপরিভাগ। আনন্দ ও খুশির চিহ্ন বা প্রতিক্রিয়া যেহেতু চামড়ার উপরিভাগে বিকশিত হয় এজন্য আনন্দ-দায়ক সংবাদকে بَشَارَة বলা হয়।

ফকীহগণ বলেন, আনন্দদায়ক বিষয়ের সর্ব প্রথম সংবাদকে بَشَارة বলে। কেননা সর্ব প্রথম সংবাদ দ্বারাই আনন্দ ও খুশি লাভ হয়। আনন্দদায়ক বিষয়ের প্রথম সংবাদের পরবর্তী সংবাদ দ্বারা কোন নতুন আনন্দ লাভ হয় না। এর উপর ভিত্তি করে তারা বলেন– যদি কোন মনিব ঘোষণা করেন, যে গোলাম আমাকে আমার পুত্রের শুভাগমন সংবাদ শুনাবে সে স্বাধীন, এখন আলাদা আলাদাভাবে

কয়েকজন গোলাম যদি মনিবের পুত্রের শুভাগমন সংবাদ শুনায় তাহলে কেবলমাত্র সর্বপ্রথম সংবাদবাহকই স্বাধীন হবে। পক্ষান্তরে যদি ঘোষণা করে যে আমাকে পুত্রের আগন সংবাদ দিবে সে আযাদ। তাহলে আগমনবার্তাবাহক সকল গোলামই আযাদ হয়ে যাবে।

صالحات শব্দটি صالحة এর বহুবচন। صالحة শব্দটি বাবে كرم يكرم ـ فتح يفتح نصر ينصر এর ওযনে الصلح মাসদার থেকে নিষ্পন্ন। অর্থ সংশোধিত হওয়া, সততা অবলম্বন করা। সৎ হওয়া। صالحة শব্দটির صفت এর সীগাহ হওয়া সত্ত্বে তার মধ্যে اسميت প্রবল হওয়ার কারণে موصوف ছাড়াই ব্যবহার হয়। যেমন حسنة শব্দটি শরীয়ত যে সকল কাজকে বৈধ ও উৎকৃষ্ট আখ্যায়িত করেছে পরিভাষায় তাকে صالحة বলে।

تفسير الجنّة : ن (জান্নাতের তাফসীর) ঃ الجنّة শব্দটি বাবে نصر ينصر এর মাসদার। فعلة এর ওযনে اسم مرة। অর্থ একবারে ঢেকে ফেলা, বাগান, উদ্যান।

الجن والجنون মাসদারের অর্থ অদৃশ্য হওয়া, আচ্ছন্ন হওয়া, ঢেকে যাওয়া। جن (জ্বিন জাতি) শব্দটি এর থেকে নির্গত, জ্বিনজাতি মানব জাতির চক্ষুর আন্তরালে থাকে বিধায় جن নামকরণ করা হয়েছে।

جنان (হৃদয়) মানব দেহের অভ্যন্তরে গোপন থাকে বিধায় হৃদয়কে جنان নামকরণ করা হয়েছে। جنون (উম্মাদনা) মস্তিষ্ক বিকৃতি বা পাগলামি মানুষের বুদ্ধির উপর আড়াল সৃষ্টির কারণ হয় বলে একে جنون নামকরণ করা হয়েছে।

جنة ঃ এমন বৃক্ষ সমষ্টি যেগুলোর ডালপালা পরস্পর নিবিড়ভাবে মিলে থাকার কারণে নিরংকুশ ছায়া প্রদান করে তাকে جنة বলা হয়। যেন বৃক্ষগুলো তার নিম্নাংশকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

পরবর্তীতে জান্নাত শব্দটি বাগান ও উদ্যানের জন্য প্রয়োগ করা হয়। পরকালে প্রতিদানের স্থানে বাগ-বাগিচা, মনলোভা উদ্যান থাকবে বিধায় তার জন্যও জান্নাত শব্দ ব্যবহার করা হয়।

কারো মতে, دار الثواب তথা প্রতিদানের স্থানে মানুষের জন্য যেসব নেয়ামতরাজি প্রস্তুত রয়েছে তা মানব চক্ষুর অন্তরালে বিধায় তাকে জান্নাত বলা হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বর্ণনানুসারে জান্নাত মোট আটটি। ১. জান্নাতুল ফিরদাউস ২. জান্নাতুল আদন, ৩. জান্নাতুল নাঈম, ৪. দারুল খুলদ, ৫. জান্নাতুল মা'ওয়া, ৬. দারুস সালাম, ৭. দারুল ক্বারার ও ৮. ইল্লিয়্যুন। আবার প্রত্যেক জান্নাতে রয়েছে অসংখ্য স্তর।

س (٢٩) : وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰئِكَةِ ـ

(الف) مامعنى التعليم ههنا؟ حرّركما قرأتَ فى كتابك ـ

(ب) لفظ اٰدم اسمٌ عربىٌّ او عجمىٌّ وايّهما ارجح؟ بيّن مع ذكر المشتقّ منه ـ

(ج) ما معنى الاسم اشتقاقا وعرفا واصطلاحا؟ واىّ معنى أريد فى الاية؟

(د) بيّن اختلاف العقلاء فى حقيقة الملئكة بعد حلّ لغاته ـ

(ه) اكتب معانى الكلمات الاتية ـ

السّجدة ـ الاشتراء ـ الظّلم ـ الاستحياء ـ الاستواء

(الف) معنى التّعليم ههنا (অত্র আয়াতে تعليم এর অর্থ) ঃ

আমরা জানি تعليم এমন ক্রিয়াকে বলে যার সাথে সাধারণত علم ক্রিয়া জড়িত থাকে। তবে সদা সর্বদা تعليم ক্রিয়ার সাথে علم ক্রিয়া জড়িত থাকে না। যেমন আরব ভাষাভাষীরা বলেন, علّمته فلم يتعلّم আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছি কিন্তু সে শিক্ষা লাভ করেনি। এখানে تعليم ক্রিয়া পাওয়া গেলেও علم ক্রিয়া পাওয়া যায়নি। تعليم এর সাথে علم সদা-সর্বদা ওতপ্রোৎভাবে জড়িত হলে উপরোক্ত উক্তিটি বলা সহীহ হতো না।

অত্র আয়াতে علم দ্বারা (ক) علم ضرورى উদ্দেশ্য অর্থাৎ হযরত আদম (আঃ)কে সৃষ্টি করার সময় তার মধ্যে উক্ত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছিল। যেমন মুরগীর ছানা ডিম থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই জমীন থেকে দানা অন্বেষণে ব্রত হয়। এ জ্ঞান তার জন্মগত। এর জন্য সাধনা করতে হয় না। পরিশ্রম করে এ জ্ঞান অর্জন করতে হয় না। অর্থাৎ এটা علم كسبى নয় যা লাভ করার জন্য বিভিন্ন اسباب এর প্রয়োজন হয়।

(খ) অথবা এখনে علم দ্বারা علم وهبى উদ্দেশ্য। যা হযরত আদম (আঃ)কে সৃষ্টি করার সময় তার রূহের মধ্যে গচ্ছিত রাখা হয়েছিলো অথবা জিবরাঈলের মাধ্যমে তার অন্তকরণে ঢেলে দেয়া হয়েছিলো।

ادم শব্দের বিশ্লেষণ ঃ

ادم শব্দটি আরবী নাকি অনারবী এ নিয়ে ভাষাবিদদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। আল্লামা কাযী নাসিরদ্দীন বায়যাবী (রহঃ) এর মতে, ادم শব্দটি অনারবী।

তবে কারো কারো মতে, ادم শব্দটি আরবী। যারা ادم শব্দটি আরবী বলে মতপোষণ করেন, তারা এর مشتق منه (উৎপত্তিস্থল) সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। যেমন-

১. কারো মতে ادم শব্দটি الادمة (همزه বর্ণে পেশসহ পাঠ্য) থেকে নিষ্পন্ন। অর্থ السمرة অর্থাৎ গৌরবর্ণ হওয়া। গোধূম বর্ণ হওয়া। যেহেতু হযরত আদম(আঃ) গোধূম বর্ণের ছিলেন, তাই তাকে এ নামে নামকরণ করা হয়েছিল।

২. কারো মতে ادم শব্দটি الأُدْمَة (همزه বর্ণে ফাতাহ দিয়ে পাঠ্য) থেকে নিষ্পন্ন। যার অর্থ الأُسْوَة অর্থাৎ নেতা বা আদর্শ। যেহেতু হযরত আদম নবী হওয়ার কারণে অন্যের জন্য নেতা, আদর্শ ও অনুসরণীয় ছিলেন। তাই তাকে ادم নামে ভূষিত করা হয়েছে।

৩. কারো মতে ادم শব্দটি اَدِيْمُ الاَرْض থেকে নিষ্পন্ন। যার অর্থ ভূপৃষ্ঠ। হযরত আদম (আঃ) সমগ্র ভূপৃষ্ঠের মৌল মাটি দ্বারা সৃষ্ট বলে তাকে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে। যেমনিভাবে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- আল্লাহ তায়ালা শক্ত হোক বা নরম হোক সমগ্র ভূখণ্ড থেকে একমুষ্টি মাটি নিয়ে তা দ্বারা হযরত আদম (আঃ)কে সৃজন করেছেন। হযরত আদম (আঃ)কে বিভিন্ন বর্ণের মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছিল বিধায় তার গায়ের রং বিভিন্ন বর্ণের ছিল। এ কারণে তার সন্তান কৃষ্ণাঙ্গ, শ্বেতাঙ্গ, বিভিন্ন বর্ণের হয়েছে।

৪. কারো মতে, ادم শব্দটি الأُدْمَة থেকে নিষ্পন্ন। যার অর্থ اُلْفَتْ বা প্রীতি-ভালবাসা। যেহেতু আদম সন্তান পরস্পরে একে অপরকে ভালবাসে। একে অপরের প্রীতিভাজন হয়। এজন্য ادم করে নামকরণ করা হয়েছে। যেমনিভাবে اِدْرِيس শব্দটি دَرْسٌ থেকে, يعقوب শব্দটি عَقْبٌ থেকে এবং اِبْلِيس শব্দটি اِبْلَاسٌ থেকে নিষ্পন্ন। কিন্তু আল্লামা বায়যাবী এ মতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেননা তার মতে ادريس - يَعقوب ও اِبلاس ইত্যাদি শব্দগুলো অনারবী।

ج : معنى الاسم اشتقاقًا (اسم এর আভিধানিক অর্থ) ঃ اسم শব্দটি اصل বা মূলরূপ কি ছিল তা নিয়ে নাহুবিদদের মতভেদ রয়েছে। (ক) বসরার অধিবাসী নাহুবিদদের মতে, اسم এর মূলরূপ سُمُوٌّ ছিল। (খ) অপরদিকে কুফার অধিবাসী নাহুবিদদের মতে, اسم এ মূলরূপ ছিল وَسْمٌ। বসরার অধিবাসী নাহবিদদের মতানুসারে اسم শব্দটির মূলরূপ سُمُوٌّ অর্থ- উঁচু হয়া, বুলন্দ হওয়া। নামকরণের কারণ হল اسم টা বস্তুর জন্য এমন দলীল যা বস্তুকে মানুষের

মেধা-মননে তুলে ধরে। তাছাড়া اسم (বিশেষ্য) فعل (ক্রিয়া) ও حرف (অব্যয়) এর তুলনায় মেধায় সু উচ্চ। পক্ষান্তরে কূফাবাসী নাহবীদের মতানুযায়ী اسم এর মূলরূপ وسم - যার অর্থ আলামত। নামকরণের সার্থকতা হল اسم তার مسمى এর জন্য আলামত বা চিহ্ন হিসেবে পরিগণিত।

اسم এ عُرف عامّ ঃ (اسم **শব্দের প্রচলিত অর্থ**) معنى الاسم عُرفًا শব্দটি لفظٌ وُضعَ لِمَعنى অর্থের জন্য গঠিত শব্দকে اسم বলে। অর্থাৎ তিন প্রকারের كلمه - اسم - فعل ও حرف এমনিভাবে مفرد ও مركّب সব কিছুর জন্য اسم শব্দের প্রয়োগ প্রচলিত রয়েছে। مفرد এর জন্য اسم শব্দের প্রয়োগ সকলের জানা বিষয়। আর مركب এর জন্য اسم এর প্রযোগের উদাহরণ। যেমন- الحمد لله থেকে ولا الضالين একাধিক বাক্য সমষ্টির পূর্ণাঙ্গ সূরার নাম রাখা হয়েছে فاتحة করে। مركب এ لا اله الا الله محمد رسول الله কে كلمةُ طيبه নামে নামকরণ করা হয়েছে।

معنى الاسم اصطلاحًا (اسم **শব্দের পারিভাষিক অর্থ**) ঃ তিনকালের কোন কালের সাথে সম্পৃক্ত না হয়ে যে শব্দ সনির্ভর অর্থ বুঝায় তাকে নাহব শাস্ত্রের পরিভাষায় اسم বলে।

اسم ঃ (**অত্র আয়াতে** اسم **দ্বারা উদ্দেশ্য**) المرادُ بالاسم فى هذه الاية এর পূর্বোক্ত তিনটি অর্থের মধ্য থেকে অত্র আয়াতে প্রথম দুটি অর্থ নেয়া যেতে পারে। তবে তৃতীয় অর্থটি কোন ভাবেই নেয়া যায় না। কেননা হযরত আদম (আঃ) এর যুগে শুধু কোন নাহুই নয় কোন শাস্ত্রীয় পরিভাষার অস্তিত্বই লাভ করেনি।

اختلاف العقلاء فى حقيقة الملئكة (ملئكة **এর স্বরূপ সম্পর্কে মনীষীদের মত পার্থক্য**) ঃ মুহাদ্দিসীন, কুফাহা ও দার্শনিকগণ এ ব্যাপারে একমত যে, ملائكه নামে একটি জাতি রয়েছে। যাদেরকে আমরা দেখতে পাই না। তবে তাদের হাকীকত সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। নিম্নে তা বর্ণনা করা হল-

১. مذهبُ اكثر المُسلمين ঃ অধিকাংশ মুসলিম মুহাকিক্ককদের মতে

انّ الملئكة اجسامٌ لطيفة قادرة على التشكل باشكال مختلفة

অর্থাৎ বিভিন্ন আকৃতি ধারণে পারঙ্গম অতি সূক্ষ্ম শরীর বিশিষ্ট প্রাণীই ملائكه বা ফেরেশতা জাত। তাদের যুক্তি হল, বিভিন্ন সময়ে নবীগণ ফেরেশতাদেরকে দেখেছেন, যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈল (আঃ) কে দেখেছেন। এবং এ সম্পর্কে বলেছেন- احيانا ياتينى فى صورة دحية الكلبى

অর্থাৎ অনেক সময় তিনি (জিবরাঈল (আঃ)) দাহ্ইয়ায়ে কালবীর আকৃতি ধারণ করে আসতেন।

২. هى مُذْهَبُ الطَّائِفَةِ مِنَ النَّصَارٰى খ্রীস্টানদের এক সম্প্রদায়ের মতে, النفوس الفاضلة البشرية المفارقة للابدان অর্থাৎ পরলোকগত মহামনীষীদের শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন দেহান্তরীত স্বর্গীয় অস্তিত্বই হল ملائكة বা ফেরেশতদের স্বরূপ। তাদের এ দাবি যুক্তি সমর্থিত নয় বরং অসত্য, অবাস্তব। কেননা মানব জাতির সৃষ্টি ফেরেশতাদের পরে হয়েছে। মানব জাতি সৃষ্টিরপর ফেরেশতাদের সৃষ্টি হয়েছিল বলেই আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)কে সৃষ্টির পূর্বে ফেরেশতাদের অভিপ্রায় জানতে চেয়েছিলেন। যেমন আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً

৩. مَذْهَبُ الْحُكَمَاءِ দার্শণিকদের মতে هِىَ جَوَاهِرُ مُجَرَّدٌ مُخَالِفَةٌ ـ لِلنُّفُوسِ النَّاطِقَةِ فِى الْحَقِيْقَةِ অর্থাৎ মূলত ফেরেশতা হল মানবীয় আত্মার বিপরীত একটি স্বতন্ত্র বস্তু।

مَلَائِكَةُ (ملائكة এর শাব্দিক বিশ্লেষণ) ঃ حَلِّ لُغَاتِ لَفْظِ مَلَائِكَة শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হল– مَلْاَكٌ –একবচন مَلَكٌ নয়। কেননা فعل ওজনে কোন اسم এর বহুবচন فَعَائِل আসে না। এজন্য বলতে হয় مَلَكٌ মূলত مَلْأَكٌ ছিল। همزه এর হরকত لام বর্ণকে প্রদান করে همزه কে বিলুপ্ত করা হয়েছে। ফলে ملك রূপ লাভ করেছে। আর ملاك শব্দটি مَأْلَكٌ এর مقلوب বা পরিবর্তিত রূপ। অর্থাৎ همزه কে لام এর স্থানে, আর لام কে همزه এর স্থানে স্থানান্তর করে مَلْاَك বানানো হয়েছে। مألك শব্দটি اَلْاَلُوْكَةُ শব্দ থেকে নিষ্পন্ন। الالوكة অর্থ رسالة বা দূত হওয়া। যেহেতু আল্লাহর বাণী রাসূলগণের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ফেরেশতাগণ আল্লাহ ও নবীগণের মাঝে দূতালীর কাজ করেছেন এজন্য তাদেরকে ملائكه নামকরণ করা হয়েছে।

معنى الكلمات : ০ (শব্দ বিশ্লেষণ) ঃ

★ معنى السَّجْدَةِ لُغَةً (السجدة শব্দের আভিধানিক অর্থ) ঃ

السجدة والسجود শব্দ বাবে نصر ينصر এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হল ১. اَلْاِطَاعَةُ আনুগত্য করা, ২. اَلتَّذَلُّلُ وَالتَّطَامُنُ অবনত মস্তক বা বিনয়ী হওয়া।

معنى السَّجْدَةِ اِصطلاحا (السَّجْدَة শব্দের পারিভাষিক অর্থ) ঃ

পরিভাষায় সাজদাহ বলা হয় وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَى الْاَرْضِ عَلٰى قَصْدِ الْعِبَادَةِ বন্দেগীর উদ্দেশ্যে ললাট ভূমিতে স্থাপন করা।

★ مَعْنَى الْاِشْتِرَاءِ لُغَةً (اشتراء এর আভিধানিক অর্থ) ঃ কাংখিত বস্তু লাভ করার জন্য মূল্য ব্যয় করাকে অভিধানে اِشْتِرَاء বলা হয়। ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে اَحَدُ الْعِوَضَيْن যদি نَقْد (মূদ্রা হয়)) তাহলে সেটা নিশ্চিতরূপে ثَمَن - আর এটা ব্যয় করার নাম اِشْتِرَاء। আর যদি আদান-প্রদানকৃত উভয় বস্তু عَيْن হয় তাহলে উভয়ের যেটাকে عَيْن গণ্য করা হবে তা খরচ করাকে اِشْتِرَاء বলে।

مَعْنَى الْاِشْتِرَاءِ مَجَازًا (اشتراء এর রূপক অর্থ) ঃ اشتراء শব্দটির অর্থে পরবর্তীতে ব্যাপকতা আনয়ন করা হয়েছে। অতএব নিজের মালিকানাধীন বস্তু থেকে বিমুখ হয়ে অর্থগত বা বস্তুগত অন্য কিছু বেছে নেয়াকে اشتراء বলে। যেমন- এক কবি বলেছেন-

اَخَذْتُ بِالْجُمَّةِ رَأْسًا اَزْعَرا - وَبِالثَّنَايَا الْوَاضِحَاتِ الدُّرْدُرَا

وَبِالطَّوِيلِ الْعُمْرِ عُمْرًا جَيْدَرًا - كَمَا اشْتَرَى الْمُسْلِمُ اِذَا تَنَصَّرَا

"তুমি অঢেল কেশগুচ্ছ পরিত্যাগ করে অল্প ও বিক্ষিপ্ত কেশ, অত্যুজ্জল দন্তরাজির পরিবর্তে দণ্ডহীন মাড়ি এবং সুদীর্ঘ জীবনের পরিবর্তে স্বল্প আয়ুকে বেছে নিয়েছ। যেমনিভাবে বেছে নেয় মুসলমান ব্যক্তি যখন সে খ্রীস্টান হয়ে যায়"।

এ কবিতার শেষ পংক্তিতে اِشْتَرى শব্দটি বেছে নেয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অতঃপর এ অর্থে আরো অধিক ব্যাপকতা আনয়ন করা হয়েছে এবং দুটি বিষয়ের একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি বেছে নেয়াকে اِشْتِرَاء বলে। এর মধ্য একটি তার হস্তগত থাকুক বা না থাকুক।

★ مَعْنَى الظُّلْمِ (জুলুমের সংজ্ঞা) ঃ ظلم শব্দটি বাবে ضرب يضرب এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ, নির্যাতন করা, অত্যাচার করা, সীমালংঘন করা। পরিভাষায় জুলম বলা হয়- وَضْعُ الشَّيْئِ فِيْ غَيْرِ مَحَلِّهِ অর্থাৎ কোন বস্তুকে যথাযথ স্থানে না রাখা। আবার ন্যায় অধিকার হরণকেও জুলুম বলা হয়।

★ مَعْنَى الْحَيَاءِ لُغَةً (حَيَاء এর আভিধানিক অর্থ) ঃ حَيَاء শব্দটি حى থেকে নির্গত। শাব্দিক অর্থ লজ্জা, শরম, শারীরিক দুর্বলতা। লজ্জাশীলতা প্রাণশক্তির সাথে সম্পৃক্ত বলে حَيَاء কে حَيَا করে নামকরণ করা হয়েছে।

مَعْنَى الْحَيَاءِ اِصْطِلَاحًا (حَيَاء এর পারিভাষিক অর্থ) ঃ

১. اَلْحَيَاءُ هُوَ تَوَاضُعٌ وَانْكِسَارٌ يَعْتَرِىْ الْاِنْسَانَ مِنْ خَوْفٍ مَّا يُعَابُ بِهِ وَيُذَمُّ অর্থাৎ ঘৃণিতও নিন্দিত হওয়ার ভয়ে মন্দ কাজে লিপ্ত হতে মানসিকভাবে সংকোচিত থাকাকে حيا বলে।

★ اَلْاِسْتِوَاء (পূর্বে লেখা হয়েছে)

س (٣٠) : وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰئِكَةِ ـ قوله اِمَّا بِخَلْقِ عِلْمٍ ضَرُورِيٍّ بِهَا فِيْهِ اَوِ الْقَاءٍ فِى رُوْعِهِ وَلَا يَفْتَقِرُ اِلَى سَابِقَةِ اصْطِلَاحٍ

اوضِحِ العبارةَ مع بَيَانِ طَرِيقَتَيِ التَّعْلِيمِ ثم بَيِّنْ لِمَ لَايَفْتَقِرُ اِلَى سَابِقَةِ اِصْطِلَاحٍ؟

উত্তর ঃ উপরোক্ত ইবারতের বিশ্লেষণ ঃ اِمَّا بِخَلْقِ عِلْمٍ ضَرُورِيٍّ بِهَا - بِهَا এর مرجع হল اَسْمَاء শব্দটি। আর فِيْه এর যমীরের مرجع হল ادم - فِيْه الخ এর মধ্যে

অতএব ইবারতের অর্থ হল (আল্লাহ তাআলা আদমকে সমস্ত বস্তুর নাম শিখিয়েছেন। এ শিক্ষার দু'টি পদ্ধতি রয়েছে একটি উক্ত ইবারতে বলা হয়েছে তাহল বস্তু নিচয়ের নাম সমূহের প্রয়োজনীয় জ্ঞান (علم ضرورى) আদম (আঃ) এর মধ্যে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ফলে مسمى তার সামনে আসা মাত্রই তিনি উপলব্ধি করতেন যে, এ مسمى এর অমুক নাম।

او القاءٍ فِى رُوْعِه - رُوْع শব্দটি رَاء বর্ণে পেশ দিয়ে পাঠ্য। এর অর্থ অন্তর মেধা ও মনন। উক্ত ইবরতে আল্লাহ কর্তৃক আদম (আঃ) কে বস্তু নিচয়ের নামসমূহ শিক্ষা দেয়ার সম্ভাব্য দ্বিতীয় পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। আর তাহলো আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের মাধ্যমে বস্তুনিচয়ের নামসমূহের জ্ঞান আদম (আঃ) এর অন্তকরণে সরবরাহ করেছেন।

وَلَا يَفْتَقِرُ اِلَى سَابِقَةِ اِصْطِلَاحٍ

لَا يَفْتَقِرُ এর فاعل হল تعليم الاسماء ـ سابقة শব্দটি عافية كافية ইত্যাদির মত মাসদার। আল্লামা কাযী বায়যাবী (রহঃ) উক্ত ইবারত দ্বারা আবু হাশিমের মত খন্ডন করেছেন। বিস্তারিত ব্যাখ্যা এই যে, বস্তুনিচয়ের নামসমূহ বা ভাষাজ্ঞান প্রণেতা আল্লাহ তা'আলা; নাকি মানবজাতি এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। যথা–

১. আশাইরাদের মতে, বস্তুনিচয়ের নামসমূহের জ্ঞান স্বয়ং আল্লাহ প্রণয়ন করেছেন। তবে কিছু কিছু বস্তুর নাম বান্দা ও প্রণয়ন করেছে।

২. মু'তাযিলাদের মতে এর প্রণেতা মানুষ।

৩. কারো কারো মতে কিছু সংখ্যকের প্রণেতা আল্লাহ এবং অপর কিছু সংখ্যকের প্রণেতা বান্দা।

আল্লামা বায়যাবীর মতে আশাইরাদের অভিমত অধিকতর গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ বস্তু নিচয়ের নামের জ্ঞানের প্রণেতা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। তিনি তা (জ্ঞান) মানব হৃদয়ে সরবরাহ করেছেন। কিন্তু আবূ হাশিমের মতে মু'তাযিলাদের অভিমত গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ বস্তু নিচয়ের নাম রেখেছে মানুষে। আবু হাশিম এ মতের স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে বলেন– নামসমূহের জন্য পূর্বে একটি পারিভাষিক ভাষাজ্ঞান থাকা আবশ্যক। যে পারিভাষিক ভাষাজ্ঞান নামসমূহকে মানুষের প্রণয়ন ও পরিভাষার সাহায্যে নির্ধারিত মর্মের জন্য বিশেষিত করবে।

আল্লামা বায়যাবী لا يَفْتَقِرُ الى سَابِقَةِ اِصْطِلاحٍ বলে আবূ হাশিমের উপরোক্ত যুক্তির খন্ডন করেছেন, এর সারকথা হল– تعليم اسماء তথা নামসমূহের শিক্ষাদান যদি পূর্বের কোন পরিভাষার উপর নির্ভরশীল হয়। তাহলে ঐ পরিভাষা ও তার পূর্বের কোন পরিভাষার উপর নির্ভরশীল হবে। এভাবে تَسَلْسُلْ আবশ্যক হবে। আর تسلسل বাতিল। কাজেই যা تَسَلْسُلْ কে আবশ্যক করে তাও বাতিল। অতএব سبقيّتِ اِصْطِلاح এ দাবি বাতিল প্রমাণিত।

اَوْضِحْ قول الْمُفَسِّر فى قوله تعالى ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰئِكَةِ الضميرُ فيه لِلْمُسَمَّيَاتِ الْمَدْلُوْلِ عليه ضِمْنًا ـ

উক্ত ইবারতের মাধ্যমে আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) عَرَضَهُمْ এর মধ্যস্থ هم যমীরের مرجع নির্ধারণ করেছেন। এর ব্যাখ্যা হল, عَرَضَهُمْ এর ضمير এর مرجع اسماء হতে পারে না। কেননা اسماء শব্দটি جمع مكسر। আর এর জন্য واحد مؤنث বা جمع مؤنث এর যমীর ব্যবহৃত হয়। অতএব عَرَضَهُمْ এর যমীরের مرجع যদি اسماء হত তাহলে عَرَضَهُنَّ অথবা عَرَضَها বলা হত। عرضهم তথা جمع مذكر এর যমীর ব্যবহার করা হত না। অতএব هم যমীরের مرجع اسماء হবে না বরং এর مرجع হল اسماء ـ المسمّيات শব্দটি دلالتِ تَضَمُّنِى হিসেবে مسمّيات এর অর্থ প্রদান করছে অর্থাৎ মূল ইবারত ছিল اسماء المسمّيات ـ اسماء المسميات مضاف اليه কে বিলুপ্ত করা হয়েছে। কেননা اسماء উহ্যভাবে مضاف এর অর্থ প্রদান করছে। আর مضاف اليه محذوف এর পরিবর্তে مضاف এর শুরুতে الف لام যুক্ত করা হয়েছে।

س (٣١) : وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِيْس اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ

الف : مامَعْنَى السَّجْدَةِ لغةً وشرعا وما المرادُ بها هٰهُنا ؟

ب : اللام فى قوله تعالى لادم لاى معنى وما معنى الاِبَاءِ وما الفرقُ بَيْنَ الاِسْتِكْبَارِ والتَّكَبُّرِ؟

ج : اِبْلِيْس اللَّعِيْنُ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ اَوْ مِنَ الْجِنِّ؟ عَلَى الاول يُخَالِفُ قوله تَعالى كَانَ مِنَ الْجِنِّ وعَلَى الثَّانِىْ لَايَكُوْنُ مُخَاطَبا لِلسَّجْدَةِ فكيفَ اللَّعْنَةُ اِلٰى يوَمِ الدِّيْنِ؟

د : هل تجوزُ سَجْدَةُ التحِيَّةِ للمشائخ تَمَسُّكًا بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ وبِقِصَّةِ اِخْوَةِ يُوْسُفَ؟ رجِّحْ مُخْتَارَكَ .

السَّجْدَةُ ঃ (সাজদার আভিধানিক অর্থ) مَعْنَى السَّجْدةِ لغةً : الف التَذَلُّل مَعَ والسُّجُوْد শব্দ বাবে نصر ينصر এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ تَطَامُنٍ অর্থাৎ অবনত মস্তক বা বিনয়ী হওয়া। আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) سجده শব্দের এ অর্থের সমর্থনে দু'জন কবির পংক্তি উল্লেখ করেছেন।

প্রথম পংক্তি تَرَى الاَكَمَّ فِيه سُجَّدًا لِلْحَوَافِرِ

"তুমি টিলাকে দেখবে সে ঘোড়ার সামনে অবনত মস্তকে বিনয়াবনত রয়েছে।" এতে سجدا শব্দটি ساجد এর বহুবচন। যা নতশীরে বিনয়ী হওয়ার অর্থ প্রদান করেছে।

২. দ্বিতীয় পংক্তি وَقُلْنَ لَهُ اسْجُدْ لِلَيْلٰى فَاسْجُدَا

"সে সকল নারীগণ (উষ্ট্রীকে) বললো, তুমি প্রেমিকার সামনে নিজের মস্তক অবনত কর। তখন উষ্ট্রী তার মস্তক অবনত করল।"

مَعْنَى السَّجْدَةِ اِصْطلاحًا (সাজদার পারিভাষিক অর্থ) ঃ শরীয়তের পরিভাষায় সাজদার সংজ্ঞা সম্পর্কে আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) লিখেছেন- وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلٰى قصدِ الْعِبَادَةِ বন্দেগীর অভিপ্রায়ে আপন মস্তক ভূমিতে লুটিয়ে দেয়াকে সাজদা বলে।

ب : معنى اللام في قوله تعالى "لآدم" (**আল্লাহরবাণী "لادم" মধ্যে لام এর অর্থ**) : অত্র আয়াতে لادم এর لام অব্যয়টি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে।

১. بمعنى الى অর্থাৎ الى অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনিভাবে হযরত হাস্‌সান (রাঃ) এ পংক্তি।

أليس أول من صلى لقبلتكم واعرف الناس بالقران والسنن

এর মধ্যে لِقِبْلَتِكُم এর শুরুতে ব্যবহৃত لام অব্যয়টি الى অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব আয়াতের অর্থ হলো– তোমরা আদমের দিকে মুখ করে (আমার) সাজদা কর।

২. اللام للسببية অর্থাৎ لام অব্যয়টি سببيت (কারণ বর্ণনা) এর অর্থ প্রদান করেছে। যেমনিভাবে কুরআনের আয়াত أقم الصلوة لدلوك الشمس এর মধ্যে لِدُلُوْكِ এর শুরুর لام অব্যয়টি سببيت এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে.

এমতাবস্থায় আয়াতের মর্ম হলো– তোমরা আদমের কারণে আমাকে সাজদা কর। অর্থাৎ ফেরেশতাদের উপর সাজদা ওয়াজিব হওয়ার কারণ হল হযরত আদম (আঃ)।

معنى الاباء (اباء **এর অর্থ**) : আল্লামা কাযী বায়যাবী (রহঃ) اباء এর অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন– الإباء امتناع باختيار

অর্থাৎ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন কাজ থেকে বিরত থাকা।

الفرق بين التكبر والاستكبار (**তকব্বুর ও إستكبار এর মধ্যকার পার্থক্য**) :

تكبر অর্থ– ان يرى الرجل نفسه اكبر من غيره অর্থাৎ নিজেকে অপরের চেয়ে বড় মনে করাকে تكبر বা অহংকার বলে। আর استكبار হলো। طلب التكبر بالتشبع পরিতৃপ্তির সাথে অহংকার করা। অর্থাৎ অহংকারকে নিজের জন্যে গর্বের বিষয় মনে করা।

উভয়ের মধ্য পার্থক্য হলো تكبر অর্থ অন্যকে নিজের চেয়ে নিকৃষ্ট মনে করা। আর إستكبار অর্থ অহংকারকে গর্বের বিষয় মনে করা। অর্থাৎ استكبار এর জন্য নিজেকে উৎকৃষ্ট এবং অন্যকে নিকৃষ্ট মনে করার কোন প্রয়োজন নেই।

ج : ابليس اللعين من الملئكة أو من الجن (**ইবলীস ফিরিশতাদের অন্তর্গত ছিল, নাকি জ্বিন জাতির অন্তর্গত ছিল?**) :

ابليس শব্দটি শয়তানের নাম। বহুবচন ابالسة ও اباليس এ শব্দটি ابلاس ধাতুমূল থেকে নিষ্পন্ন। অর্থ الابعاد عن رحمة الله অর্থাৎ আল্লাহর

রহমত থেকে দূরে নিক্ষিপ্ত হওয়া, নিরাশ হওয়া। যেহেতু অভিশপ্ত শয়তান আল্লাহর রহমত থেকে দূরে ও নিরাশ; সেহেতু শয়তানকে ابليس বলা হয়।

ইবলীসের সত্তাগত পরিচয় ঃ ইবলীস জ্বিন না ফিরিশতা এ সম্বন্ধে উভয়মুখী বক্তব্য পাওয়া যায়। যেমন–

১. হযরত আলী (রাযিঃ), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রহঃ)সহ জমহুর মুহাক্কিকদের মতে, ইবলীস ফেরেশতাদের অন্তর্গত ছিলো। আর আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, ইবলীস মূলতঃ ফিরিশতা ছিল। তার মতে ফিরিশতা দুই প্রকার। এক প্রকারের ফিরিশতা এমন রয়েছে, যারা বংশ বিস্তার করে। এদেরকে জ্বিন বলা হয়। ইবলীস এ ধরণের ফিরিশতাদের অন্তর্গত ছিল। দ্বিতীয় প্রকারের ফেরেশতা হল, যারা বংশ বিস্তার করে না।

২. কারো কারো মতে, ইবলীস জ্বিন জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। যেমন– কুরআনে বর্ণিত كَانَ مِنَ الْجِنِّ ইবলীস জ্বিন জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এখন প্রশ্ন হল, যদি ইবলীস ফিরিশতাদের অন্তর্গত হয় তাহলে আল্লাহর বাণী كَانَ مِنَ الْجِنِّ এর বিরোধী হয়। আর যদি জ্বিন জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়। তাহলে সে সাজদার আদিষ্টদের অন্তর্ভূক্ত না হওয়ার কারণে অপরাধী ও অভিশাপের উপযুক্ত হয় না। এর জবাবে মুফাসসিরগণ বিভিন্নরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

১. إِنَّ إِبْلِيسَ مِنَ الْجِنِّ فعلا ومن الملئكة نوعا অর্থাৎ ইবলীস কার্যতঃ জিন জাতির অন্তর্ভূক্ত ছিল। তবে জাতিগতভাবে ফেরেশতাদের অন্তর্গত ছিল। অতএব وكان من الجن দ্বারা فعلا তার জ্বিন হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। আর نوعا তথা জাতিগতভাবে ফিরিশতাদের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার কারণে অত্র আয়াতে সে সাজদার مامورين (আদিষ্টদের) অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

২. كان من الجن এর মধ্যে জ্বিন শব্দ দ্বারা ফিরিশতা বুঝানো হয়েছে। কেননা ফেরেশতাদের মধ্যে যারা জান্নাতের তদারকীর দায়িত্ব পালন করে তাদেরকে كان من الجن জ্বিন বলা হয়। ইবলীস এ শ্রেণীর সর্দার ছিল বলে كان من الجن বলা হয়েছে।

৩. মুলতঃ জ্বিনদেরকেও সিজদার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তবে জ্বিন জাতির চেয়ে উন্নত জাতি ফিরিশতাদের উল্লেখ করার কারণে অত্র ভাষ্যে জ্বিনদের উল্লেখ করা হয়নি। বরং ফিরিশতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৪. বস্তুত ফিরিশতারাই ছিল সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। অতএব তাদেরকে আদম (আঃ) এর প্রতি সাজদার নির্দেশ দেয়া হলে জ্বিন জাতি بطريق اولى তথা অতি অগ্রে বিবেচিত ভিত্তিতে এ নির্দেশের অন্তর্গত হয়ে যায় বিধায় তাদের অত্র ভাষ্যে উল্লেখ করা হয়নি।

حكم سجدة التحية **(সম্মানসূচক সাজদার বিধান)ঃ** একথা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট যে, বন্দেগীর উদ্দেশ্যে আল্লাহ ব্যতিত অন্য কাউকে সাজদা করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। এটা শিরকও বটে। ফিরিশতাগণ আদম (আঃ) কে এবং হযরত ইউসূফ (আঃ) এর ভ্রাতাগণ হযরত ইউসূফ (আঃ) কে সাজদা করেছিলেন তা سَجدة لغرض العبَادَة অর্থাৎ ইবাদতের উদ্দেশ্যে ছিল না বরং سجدة لغرض التعظيم অর্থাৎ সম্মান ও অভিবাদন সূচক সাজদা ছিল। আর এ সাজদা আমাদের পূর্ববর্তী শরীয়তে বৈধ হলেও আমাদের শরীয়তে তা সম্পূর্ণরূপে না জায়িয। কেননা– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন–

لَوْ اَمَرْتُ اَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللّٰهِ لَاَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ يَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

২. অথবা ফিরিশতাগণ মূলতঃ আল্লাহকেই সাজদা করেছিল। তবে আদম (আঃ) কে তার ব্যক্তিগত উচ্চ মর্যাদার কারণে অথবা তিনি ফিরিশতাদের সাজদা করার মূল উৎস হেতু তাকে কিবলা হিসেবে সামনে রাখা হয়েছিল।

৩. অথবা আদম (আঃ) কে সাজদা করাটা উর্ধ্ব ও আধ্যাত্মিক জগতের বিষয় ছিল। সে জগতের বিধানের সাথে পার্থিব জগতের বিধানকে কিয়াস করা যায় না।

৪. অথবা, সাজদার নির্দেশ যেহেতু আল্লাহ স্বয়ং দিয়েছেন; অতএব এটা سَجْدَةً لِغَيْرِ اللّٰه ছিল না, বরং سَجْدَةً لِاِطَاعَةِ اَمْرِ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্যের জন্য সাজদা করা হয়েছিল। অতএব এর উপর ভিত্তি করে গায়রুল্লাহকে سجده التحيه করা জায়েয হবে না।

س (٣٢) : قوله تعالى فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ .

الف : ترجم الاٰية الكريمة .

ب : اُذْكُرِ الْكَلِمَاتِ الَّتِىْ تَلَقَّاهَا اٰدَمُ عَلَيه السلام من ربه .

ج : معنى التَّوْبَةِ الْاِعْتِرَافُ بِالذَّنْبِ وَالنَّدَمُ عَلَيْهِ فكيف وَصَفَ اللّٰه نَفْسَهٗ بِالتَّوَّابِ وما فائدة الجَمْعِ بَيْنَ الْوَصْفَيْنِ التَّوَّابُ والرَّحِيْم؟

د : اِنَّ الظَّاهِرَ مِنَ الاٰيةِ ان اللّٰه تعالى تابَ علٰى اٰدمَ عليه السلام فَمَابَالُ حَوَّاءِ؟

ه : قوله تعالى فتابَ عَلَيْهِ يدُلُّ على أنّ أدَمُ كانَ عاصِيًا مُذنبًا وكذا قولُه تعالى فِى سورة طٰهٰ "وَعَصٰى أدمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى" صريحٌ فِىْ ذالِكَ فَماذَا رايُكُمْ فِى عِصْمَةِ الْاَنْبِياءِ عَليهم السلام وما جوابُكُمْ عنْ هٰذه الايات؟ حرِّرْ مفصَّلًا

ز : قال البيضاوى عِندَ مَا انْتَهٰى إلى تَفْسِيرِ الْايَاتِ الْمُتعلِّقة بِقصَّةِ إخْراجِ أدمَ مِنَ الْجَنَّةِ ـ تَنْبِيْهٌ وقدْ تَمسَّكتِ الْحَشْوِيَّةُ بِهٰذا الْقِصَّةِ علٰى عَدَمِ عِصْمَةِ الْاَنْبِيَاءِ الخ مَنْ هُمُ الْحَشْوِيَّةُ؟ هَل هُمُ الْمَوْجُوْدُوْنَ الْيَوْمَ؟ فَبِاَيِّ فِرْقَةٍ او اسمٍ يُعْرَفُوْنَ الْيَوْمَ؟

ج : اذكرْ إعْتِراضاتِ الْحَشْوِيَّة ثم أجِبْ عنها على نَهْجِ المفسِّرِ الْعَلّام

ترجمة الآيةِ الكريمة **(আয়াতের অনুবাদ)** ঃ

অতপর হযরত আদম (আঃ) স্বীয় পালনকর্তার কাছ থেকে সোৎসাহে কয়েকটি বচন শিখে নিলেন। অতঃপর আল্লাহপাক তার প্রতি (করুণাভরে) লক্ষ্য করলেন, নিশ্চয় তিনি মহা ক্ষমতাশীল ও অসীম দয়ালু।

ب : الكلماتُ الّتى تلَقّاها أدمُ عليه السلام **[আদম (আঃ) এ শেখা বচনাবলী]** ঃ হযরত আদম (আঃ) শয়তানের প্রবঞ্চনা ও প্রতারণায় নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করেন। ফলে তাকে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে অবতারিত করা হয়। এতে হযরত আদম (আঃ) চরমভাবে বিচলিত হয়ে মনে মনে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। কিন্তু নবী সূলভ প্রাজ্ঞদৃষ্টি এবং সে কারণে চরমভাবে সঞ্চালিত ভীতির দরুন মুখ থেকে কোন কথাই বের হচ্ছিল না। বরং তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও হতবাক হয়ে পড়েছিলেন। এ করুণ অবস্থা দেখে স্বয়ং আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা প্রার্থনা নীতি সম্বলিত কয়েকটি বচন শিখিয়ে দিলেন। সে বচনগুলো কি ছিল এ সম্পর্কে একাধিক বর্ণনা পাওয়া যায়। নিম্নে তা তুলে ধরা হল–

১. কোন বর্ণনায়– رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا الخ ـ

২. অন্য বর্ণনায় আছে–

سُبْحَانَكَ اللّٰهمّ وبِحمدِكَ وتبارك اسْمُك وتعالى جدُّك ولا اله الا اَنْتَ.ظَلَمْتُ نَفْسِى فَاغْفِرْلِىْ اِنَّهٗ لا يَغْفِرُ الذّنوبَ اِلّا اَنْتَ

৩ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক বর্ণনায় আছে কথাগুলো ছিল–

يَا رَبِّ اَلَمْ تَخْلُقْنِىْ بِيدِكَ؟ قال بلٰى! قال يارَبِّ اَلَمْ تنفُخْ فِىَّ الرُّوْحَ مِن رُّوحِكَ؟ قال بلٰى : قال الَمْ تسبقْ رحمَتُكَ غضَبَكَ؟ قال بلٰى : قال الَمْ تُسْكِنِىَ جنَّتَكَ؟ قال بلٰى! قال يارَبِّ ان تُبْتُ وَاصلحْتُ اَراجِعِىَّ انْتَ الَى الْجَنَّةِ؟ قال نَعَمْ .

অর্থ ঃ হে প্রতিপালক! তুমি কি আমাকে তোমার কুদরতী হাতে সৃষ্টি করনি আল্লাহ বললেন হ্যা। আদম (আঃ) বললেন– হে আমার প্রতিপালক! তুমি কি আমার মাঝে তোমার রূহ ফু'কে দেওনি? আল্লাহ বললেন হ্যা। তিনি বললেন– তোমার করুণা তোমার ক্রোধের উপর কি বিজয়ী হয়নি? আল্লাহ বললেন হ্যা। তিনি বললেন তুমি কি আমাকে জান্নাতে বাস করাওনি? আল্লাহ বললেন– হ্যা। আদম (আঃ) শুধালেন হে আমার পালনকর্তা! যদি আমি তওবা করি এবং পরিশুদ্ধি লাভ করি তুমি কি পুনরায় আমাকে জান্নাতে ফিরিয়ে দিবে? উত্তরে আল্লাহ বললেন– হ্যা।

فتابَ ঃ **(আল্লাহর সাথে তাওবার সম্বন্ধ)** نِسبةُ التَّوبَةِ الى اللّٰه : ج عَلَيْهِ এ আয়াতাংশে তাওবার সম্বন্ধ আল্লাহর সঙ্গে করা হয়েছে। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করেন তাওবার অর্থ হল তিনটি বস্তুর সমষ্টি ১. الاعترافُ بالذَّنْبِ কৃতপাপের স্বীকারোক্তি। ২. والنَّدَمُ عَلَيْه কৃতপাপের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া। ৩. العزْمُ ان لّا يَعُوْدَ اِلَيْه ভবিষ্যতে এরূপ না করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা। তাহলে আল্লাহর সঙ্গে তাওবার সম্বন্ধ কিভাবে করা হল?

উত্তর ঃ এর উত্তর হল توبة (তাওবা) এর প্রকৃত অর্থ الرُّجُوْعُ অর্থাৎ ফিরে আসা। তাওবার সম্বন্ধ যখন মানুষের সঙ্গে করা হয় তখন তর অর্থ উপরোক্ত তিন বস্তুর সমষ্টি। আর যখন তাওবার সম্বন্ধ আল্লাহর সাথে করা হয় তখন তার অর্থ তওবা গ্রহণ করা।

অত্র আয়াতে ও فتاب عليه এর অর্থ তিনি (আল্লাহ) তার তওবা গ্রহণ করলেন। (বা করুণার দৃষ্টি ফিরালেন।) অতএব কোন প্রশ্ন হতে পারে না।

এ رحيم ও تواب) فَائدةُ الْجمْعِ بَيْنَ الْوصفَيْنِ التَّوَّاب والرَّحيم দু'টি গুণ সমন্বয় করার উপকারিতা) ঃ

অত্র আয়াতে تواب (তাওবা গ্রহণকারী) এবং رحيم (অতিশয় দয়ালু) এ দু'টি صفت (গুণ) এর সমন্বয় করার হিকমত বা রহস্য হলো। যাতে পাপী বান্দা আল্লাহর করুণা থেকে নিরাশ না হয়ে পড়ে। কারণ এখানে تواب অর্থ عفو عن

تَوَعَّدُهُ بِالْإِحْسَانِ অর্থাৎ رحيم তথা পাপ মোচনের সাথে সাথে المعصيت তথা করুণার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। অতএব তওবা ও অনুশোচনাকারী বান্দার জন্য পাপ মোচনের সাথে সাথে করুণা পরবশ হওয়ার প্রতিশ্রুতির উপকারিতার জন্য এ উভয় গুণকে সমন্বয় করা হয়েছে।

"১" **তওবার মধ্যে হযরত হাওয়া (আঃ) এর অন্তর্ভূক্তি ঃ** নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের কারণে হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়া (আ) উভয়ই আল্লাহর কাছে অপরাধী বলে সাব্যস্থ ছিলেন। ফলে তারা উভয়ে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। এবং উভয়ের তাওবাই আল্লাহর কাছে গৃহীত হয়েছিল। তা সত্ত্বে অত্র আয়াতে শুধুমাত্র আদম (আঃ) এর তাওবার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। হাওয়া (আঃ)এর প্রসঙ্গ উল্লেখ না করার, কয়েকটি কারণ হতে পারে। যেমন–

১. আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) বলেন كَانَتْ حَوَّاءُ تَبَعًا لِآدَمَ فِى الْحُكْمِ الخ। অর্থাৎ হযরত হাওয়া (আঃ) বিধানের ক্ষেত্রে হযরত আদম (আঃ) এর অনুগত ছিলেন। নারী জাতি বিধানের ক্ষেত্রে পুরুষ জাতির অনুগামী বিধায় কুরআন ও হাদীসে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীদের আলোচনা পরিত্যাগ করা হয়েছে। এমনিতেই তারা হুকুমের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়।

২. কারো মতে, নারী জাতি পর্দানশীন বিধায় তাদের পাপের বিষয়টিও গোপন রাখা হয়েছে।

عصمة الانبياء (নবীগণের নিষ্পাপ হওয়া)

পবিত্র কুরআনের এ আয়াতের فتاب عليه বাক্য দ্বারা বাহ্যিকভাবে অনুমিত হয় যে, হযরত আদম (আঃ) পাপী ও অবাধ্য ছিলেন। অনুরূপভাবে সূরায়ে ত্বাহা-এর فعصى ادم ربه فغوى আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি পাপী ছিলেন। অথচ নবীগণ পাপ থেকে বিমুক্ত ও পবিত্র।

সঠিক তথ্য এই যে, নবীগণের যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত ও পরিশুদ্ধ থাকার কথা যুক্তি-বুদ্ধির দ্বারা এবং শরীয়ত ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রমাণাদি দ্বারা সুপ্রমাণিত। চার ইমাম ও উম্মতের সর্বসম্মতিক্রমে স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, নবী-রাসূলগণ ছোট-বড় যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত ও পবিত্র। কারণ নবীগণকে গোটা মানবজাতির অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল। যদি তাদের দ্বারা আল্লাহ পাকের ইচ্ছার পরিপন্থী ছোট-বড় কোন পাপ কাজ সম্পন্ন হত, তাহলে নবীগণের বাণী ও কার্যাবলীর উপর থেকে আস্থাও বিশ্বাস উঠে যেত।

অবশ্য কুরআনে পাকের উপরোক্ত দুই আয়াত ছাড়াও বহু আয়াতে অনেক নবী সম্পর্কে এ ধরণের ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। যা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাদের দ্বারাও পাপ সংঘটিত হয়েছে। এ ধরণের ঘটনাবলী সম্পর্কে উম্মতের সর্বসম্মত অভিমত

হল কোন ভুল বুঝাবুঝি বা অনিচ্ছাকৃত কারণে নবীদের দ্বারা এ ধরণের কাজ সংঘটিত হয়ে থাকবে। কোন নবী জেনে শুনে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর হুকুমের পরিপন্থী কোন কাজ করেননি। ইজতিহাদগত ও অনিচ্ছাকৃত এ ত্রুটিকে শরীয়তের পরিভাষায় পাপ বলা চলে না। এ ধরণের ভুলত্রুটি তাদের একান্ত ব্যক্তিগত কাজ কর্মে হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ পাকের দরবারে নবীগণের স্থান ও মর্যাদা যেহেতু অত্যন্ত উচ্চে এবং মহান ব্যক্তিবর্গের দ্বারা ক্ষুদ্র ত্রুটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হলেও তাকে অনেক বড় মনে করা হয়। সেহেতু কুরআনও হাদীসে এ ধরণের ঘটনাবলীকে অপরাধ ও পাপ বলে অভিহিত করা হয়েছে। যদিও প্রকৃত পক্ষে সেগুলো আদৌ পাপ নয়।

ز : اعتراضات الحشوية والجواب عنها (حَشْوِيَّة সম্প্রদায়ের আপত্তিসমূহ ও তার উত্তর) :

আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) বলেন– حشويه সম্প্রদায় হযরত আদম (আঃ) এর জান্নাতের নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার উক্ত কাহিনীকে পুঁজি করে ইসমতে আম্বিয়া তথা নবীগণের নিষ্পাপ হওয়ার বিপক্ষে ছয়টি আপত্তি উপস্থাপন করেছে। সেগুলো হলো–

১. আদম (আঃ) একজন নবী ছিলেন। তিনি নিষিদ্ধ কাজ করেছেন। আর নিষিদ্ধ কাজ সম্পাদনকারী অবাধ্য পাপী। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নবীগণ মা'সূম বা নিষ্পাপ ছিলেন না।

২. নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণের কারণে আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ) কে 'জালিম' আখ্যা দিয়েছেন। আর জালিমরা অভিশপ্ত; যেমনিভাবে ইরশাদ হয়েছে– اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ (নিশ্চয়ই জালিমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত)। আর কবীরা গুণাহ সম্পাদনকারীই কেবল অভিশাপের উপযুক্ত হয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত আদম (আঃ) কবীরা গুণাহ করেছেন। তাই নবীগণ মা'সূম বা নিষ্পাপ নন।

৩. আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ) এর সাথে عصيان (অবাধ্যতা) ও গুমরাহীর সম্বন্ধ করেছেন। যেমন সূরা ত্বাহায় ইরশাদ হয়েছে- فعصى ادم ربه فغوى যা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে এটাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি গুণাহগার ছিলেন। তাই নবীগণ মা'সূম নন।

৪. فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّه كَلِمَاتٍ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আঃ) কে ক্ষমা প্রার্থনানীতি সম্বন্ধীয় কতিপয় বচন শিক্ষা দিয়েছেন। আর তওবা বলা হয় কৃত গুণাহের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া এবং তা পরিহার করাকে। এর দ্বারা বুঝা যায় হযরত আদম (আঃ) গুণাহ করেছিলেন।

৫. وَاِن لَّمْ تَغفِر لنا وترحمْنا لنكونَنَّ مِن الخاسرين এ বাণীর মাধ্যমে হযরত আদম (আঃ) সর্বান্তকরণে স্বীকার করেছেন যে, যদি তাকে ক্ষমা না করা হয় তাহলে সে خاسر বা ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্গত হয়ে যাবে। আর خاسر বা ক্ষতিগ্রস্থ কেবল মাত্র কবীরা গুণাহ সম্পাদনকারীরাই হয়ে থকে।

৬. হযরত আদম (আঃ) কোন গুণাহ বা পাপ কাজ না করলে তার সাথে এরূপ রূঢ় ও কঠোর আচরণ করা হত না। যেমন– তার শরীরের বস্ত্র নগ্ন করে তাকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করা, আসমান থেকে জমীনে অবতরণ করা ইত্যাদি। তিনি পাপী ও অপরাধী ছিলেন বলেই তাকে এ রূপ শাস্তি কঠোর দেয়া হয়েছে।

الجواب عن هذه الاعتراضات (এ সকল প্রশ্নের জবাব) ঃ

আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) সুনিপুণভাবে حشوية সম্প্রদায়ের এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তিনি যে উত্তরগুলো উল্লেখ করেছেন তা নিম্নে প্রদত্ত হল–

১. হযরত আদম (আঃ) যখন নিষিদ্ধ কাজ করেছিলেন তখন তিনি নবী ছিলেন না। অর্থাৎ নবুওয়াতী লাভের পূর্বে তিনি এরূপ করেছেন। নবুওয়াতের পরে তার দ্বারা কোন কবীরা গুনাহ প্রকাশ পায়নি। উল্লেখ্য যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মধ্যে যারা নবীগণের দ্বারা নবুওয়াত লাভের পূর্বে কবীরা গুণাহ করা বৈধ মনে করেন তদের পক্ষ থেকে এ উত্তর প্রযোজ্য হতে পারে।

২. উক্ত বৃক্ষের ফল খাওয়ার নিষেধাজ্ঞা হারামের পর্যায়ভুক্ত ছিল না বরং মাকরূহে তানযীহি ছিল। তথাপি তাকে জালিম ও খাসির বলার কারণ হল তিনি উত্তমতাকে পরিত্যাগ করে নিজের উপর জুলুম করেছেন এবং নিজের উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছেন।

আর আদম (আঃ) এর সাথে غوى ও عصيان এর সম্বন্ধ করার কারণ হলো এর দ্বারা আদম (আঃ) এর পদস্থলনকে বড় করে দেখিয়ে আদম সন্তানকে এমন কাজ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এভাবে আদম (আঃ)কে তওবার তালকীন দেয়ার কারণ হলো, اولى বা উত্তম কাজ বর্জন করার ফলে তার যে মর্যাদাগত ঘাটতি হয়েছে তা পুরানোর জন্য। অনুরূপ তার সাথে এমন কঠোর আচরণ (জান্নাত থেকে বহিষ্কার করে দেয়া ইত্যাদি) করার কারণ হলো اولى বা উত্তম কাজ বর্জন করার জন্য ধমকি দেয়া হয়েছে। তদুপরি এর মাধ্যমে হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ তাআলা ফিরিশতাদের কাছে اِنِّى جاعلٌ فى الارضِ خَليفَةً দ্বারা যে ওয়াদা করেছিলেন তা পূর্ণ করা হয়েছে।

৩. শয়তান যখন হযরত আদম (আঃ)কে সে গাছের উপকারিতা ও গুণাবলীর বর্ণনা দিচ্ছিল। যেমন– সে গাছের ফল খেলে আপনি অনন্তকাল নিশ্চিন্তে জান্নাতের

নেয়ামতরাজি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে পারবেন, তখন তার সৃষ্টির প্রথমপর্বে সে গাছ সম্পর্কে আরোপিত নিষেধাজ্ঞার কথা মনে ছিল না। যেমনি কুরআনের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে– فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا অর্থাৎ "তিনি (আদম) ভুলে গেলেন আর আমি তার মধ্যে সংকল্পের দৃঢ়তা পাইনি"। কিন্তু হযরত আদম (আঃ) এর শানে নবুওয়াত এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে তাঁর উচ্চ -মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিচ্যুতিকেও যথেষ্ট বড় মনে করা হয়েছিল। আর এজন্যই কুরআন মজীদে একে পাপ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

৪. হযরত আদম (আঃ) ইজতিহাদগত ভুলের কারণে সে গাছের ফল খেয়েছিলেন। কারণ হারাম পর্যায়ের নিষেধাজ্ঞাকে তিনি মাকরূহে তানযীহী পর্যায়ের মনে করেছিলেন।

অথবা হযরত আদম (আঃ) এর ধারণা ছিল যে, যে গাছের প্রতি ইঙ্গিত করে নিষেধ করা হয়েছিল। এ নিষেধের সম্পর্ক ঐ বিশেষ গাছটিতেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু তাতে শুধুমাত্র সে গাছটিই উদ্দেশ্য ছিল না; বরং সে জাতীয় যাবতীয় গাছই এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একদিন রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক টুকরা রেশমী কাপড় ও এক খন্ড স্বর্ণ হাতে নিয়ে এরশাদ করলেন– "এ বস্তু দুটি আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম।" আর এ কথা সুস্পষ্ট যে, রাসূলের হাতের ঐ বিশেষ কাপড় ও স্বর্ণখণ্ডের ব্যবহারই হারাম ছিল না বরং যাবতীয় রেশমী কাপড় ও স্বর্ণ এ হুকুমের অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু এখানে এ ধারণা হতে পারে যে, এ নিষেধাজ্ঞার হুকুম শুধু রাসূলের হাতের রেশমী কাপড় ও স্বর্ণখণ্ডের সাথে সম্পর্কিত। হযরত আদম(আঃ) এর দ্বারা এ ধরনের ইজতিহাদগত বিচ্যুতিই সংঘটিত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও তার শানে নবুওয়াত ও উচ্চ মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে এ বিচ্যুতিকে বড় মনে করা হয়েছে এবং তার সাথে কঠোর আচরণ করা হয়েছে।

س (٣٣) : أَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِيْنَ

الف : الاستفهامُ هِنَا لِأَيِّ مَعنًى ومَا معنى البِرِّ وكَمْ قِسْمًا لهُ وماهى؟

ب: مامعنى نِسْيَانِ النَّفْسِ وفِيْمَنْ نَزَلَتْ هٰذِهِ الايةُ ومَا المرادُ بِقولِهِ تعالى وَأَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتَابَ؟

ج : مَنْ خُوْطِبَ بِقَوْلِهِ وَاسْتَعِيْنُوْا ومَا سَبَبُ الْخِطَابِ؟

د : ما معنى الصَّبْرِ لغةً وما ذا يُرادُ بِهِ فِي الشَّرْعِ؟ كيفَ تحصلُ الاستِعانَةُ بالصبرِ والصلواة ؟

ه : عَيِّنْ مُرْجِعَ الضَّميرِ فى "انَّهَا" علىٰ نَهْجِ المفَسِّرِ العلّامِ

و : مامعنىٰ الْخُشُوْعِ وَالظَّنِّ فى هذه الاية؟

ز : ما معنى الخشوعِ ومَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وبَيْنَ الْخُضوعِ؟

ح : كيف تكونُ الصّلوةُ كَبِيْرَةٌ وهِيَ لَيْسَتْ إِلّا سَهْلًا فى بَادِى الْأَمْرِ؟

উত্তর ঃ إِرْتِبَاطُ الْاٰيَةِ بِمَا قَبْلَهَا (পূর্বের আয়াতের সাথে অত্র আয়াতের যোগসূত্র) ঃ

ইয়াহুদী ধর্মযাজকগণ ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকত। পূর্ববর্তী আয়াতে তাদের এ নিন্দনীয় আচরণের জন্য তিরস্কার করা হয়েছে। আর এ আয়াতেও তাদেরকে সম্বোধন করে তাদের সংশোধনের পথ নির্দেশ করা হয়েছে। তাদেরকে গোমরাহী পরিহার করে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ ঐশী গ্রন্থ আল-কুরআনের উপর ঈমান আনয়ন করে তা মানতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যা তাদের জন্য বাহ্যত অতি দুঃসহ কষ্টকর ব্যাপার। এছাড়া এর দ্বারা তাদের নেতৃত্ব পরিত্যাগ করতে হতো এবং সর্বসাধারণ থেকে উপঢৌকন ও বখশিশ পাওয়া বন্ধ হয়ে যেতো। এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কুরআনের নির্দেশ সহজে মান্য করার উপায় বাতলে দিয়েছেন। কোন কোন তাফসীরকারকদের মতে, এ আয়াতটি মু'মিনদের সম্বোধন করে অবতীর্ণ হয়েছে।

الف : استفهام এর معنى الاستفهام فى هذه الاية (অত্র আয়াতে অর্থ) ঃ اتأمرون الناس الخ আয়াতের মধ্যে استفهام কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সে সম্পর্কে আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) বলেন- ইস্তিফহামটি تقرير مع توبيخ وتعجيب অর্থাৎ ধমক ও বিস্ময়জ্ঞাপনের সাথে সাথে মূল বক্তব্যকে সুদৃঢ় করণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, تقرير এর দুই অর্থ- ১. স্বীকারোক্তির জন্য অনুপ্রাণিত করা, ২. কোন বক্তব্যকে প্রমাণ করা। আল্লাহর বাণী- أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين এর মধ্যে استفهام টি همزه، تقرير এর প্রথম অর্থ প্রদান করেছে। আর هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون এর মধ্যে هل استفهام টি تقرير এর দ্বিতীয় অর্থ প্রদান করেছে। গ্রন্থকারের বক্তব্যে تقرير শব্দটি উভয় অর্থের জন্য হতে পারে। প্রথম অর্থ অনুযায়ী استفهام দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আয়াতের বিষয়বস্তু স্বীকার করার জন্য ইয়াহুদীদেরকে অনুপ্রাণিত করা। আর দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী استفهام দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আয়াতের বিষয়বস্তুকে সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণিত করা।

بر এর অর্থ ও তার প্রকারভেদ) ঃ (معنى البر واقسامه بر) শব্দটি بر শব্দ থেকে নির্গত। بر অর্থ সু প্রশস্ত খোলা প্রান্তর, بر এর আভিধানিক অর্থ হলো, সৎ কাজ আনুগত্য, পূণ্য, সত্যবাদিতা, দান ও সদাচার ইত্যাদি। আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) শব্দটির অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-التوسع في الخير অর্থাৎ পূণ্যের কাজে অনাবিল অবিমুক্ত মনে অগ্রসর হওয়া। যাবতীয় পূণ্যের কাজকেই بر বলা হয়।

اقسام البر (بر এর প্রকাভেদ) ঃ

কারো কারো মতে بر তিন প্রকার-

১. আল্লাহর বন্দেগী সংক্রান্ত পূণ্য।

২. আত্মীয়-স্বজনদের সহযোগিতা সংক্রান্ত بر বা পূণ্য।

৩. অনাত্মীয়দের সাথে আচার আচরণের بر বা পূণ্য।

وانتم تتلون الكتاب এর المراد بقوله وانتم تتلون الكتاب) মমার্থ) ঃ

আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) وانتم تتلون الكتاب এর মর্ম বুঝাতে গিয়ে বলেছেন- تبكيت كقوله وانتم تعلمون অর্থাৎ এর পূর্বের আয়াতে وانتم تعلمون বলে যেভাবে ইয়াহুদী ধর্মযাজকদের নির্বাক করে দেয়া হয়েছে। তেমনিভাবে অত্র আয়াতে وانتم تتلون الكتاب বলেও তাদেরকে নির্বাক করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ'হে ইয়াহুদী ধর্ম যাজকগণ! নিশ্চয় তোমরা তাওরাত কিতাব

অধ্যয়ন করেছ। সেখানে কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতার পরিণাম বর্ণনা করা হয়নি? কথা ও কাজের মাঝে গরমিল থাকার পরিণতি বর্ণনা করা হয়নি?

ب : مَعْنٰى نِسْيَانِ النَّفْسِ (ব্যক্তি সত্তা ভুলে যাওয়ার মর্মার্থ) ঃ

এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, কোন ব্যক্তি কখনই নিজের ব্যক্তিসত্তাকে ভুলতে পারে না। অতএব আল্লাহ তাআলা ইয়াহুদী ধর্মযাজকদের সম্বোধন করে تَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ (তোমরা নিজেদেরকে ভুলে গিয়েছ) কিভাবে বললেন? আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন– تَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ অর্থ تَتْرُكُوْنَ مِنَ الْبِرِّ كَالْمَنْسِيَّاتِ। অর্থাৎ তোমরা নিজেদের মনকে সৎকাজে অনুপ্রাণিত করতে ভুলে গেছ যেমনিভাবে বিস্মৃত বিষয় মানুষ পরিত্যাগ করে। অর্থাৎ নিজেদের মনকে সৎকাজের প্রতি অনুপ্রাণিত না করাকে نِسْيَانٌ (ভুলে যাওয়া) মাসদারের সাথে উপমা দিয়ে استعارهٔ مُصَرَّحَة تَبْعِيَّة এর ভিত্তিতে মনকে সৎকাজের প্রতি অনুৎসাহিত করার জন্যে نسيان শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে।

এর অর্থ এই নয় যে, তারা তাদের ব্যক্তিসত্তাকে ভুলে গিয়েছিল। বরং অর্থ হলো, তারা নিজেদের মাঝে সৎ কাজ প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে উদাসীন ছিল।

سببُ نُزولِ الْأيـة او فِيْمَنْ نَزَلَتِ الاٰيَةُ (আয়াতের শানে নুযূল) ঃ

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন– মদীনার কোন কোন ইয়াহুদী ধর্মযাজক তাদের প্রীতিভাজন ব্যক্তিদেরকে গোপনে ইসলাম কবূল করতে উৎসাহিত করতো, ইসলামের সত্যতা স্বীকার করতে মানুষদের অনুপ্রাণিত করতো, তবে নিজেরা ইসলাম কবুল করত না। এ আয়াত তাদেরকে সম্বোধন করে অবতীর্ণ হয়েছে।

হাফিয ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেন– ইয়াহুদী আলিমগণ আপন অনুসারীদেরকে সাদকা করার নির্দেশ দিত। কিন্তু নিজেরা কখনো দান-খয়রাত করত না। আলোচ্য আয়াতটি তাদেরকে সম্বোধন করে অবতীর্ণ হয়েছে।

ج : اَلْمُخَاطَبُوْنَ لِاٰيَـةِ وَاسْتَعِيْنُوْا (اِسْتَعِيْنُوْا আয়াতের দ্বারা কাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে) ঃ

১. সংখ্যা গরিষ্ঠ তাফসীরকারকগণের মতে, استعينوا। আয়াত দ্বারা বণী ইসরাইল তথা ইয়াহুদী আলিমদের সম্বোধন করা হয়েছে। তাদেরকে সম্বোধন করার কারণ হল অর্থলোভও পদ মর্যাদার লিপ্সা দূরীভূত করে মুহাম্মদ (সঃ) -এর আনীত শরীআত মানা তাদের জন্য বড় দুঃসহ মনে হয়েছিল। তাদের এ মনকষ্ট দূর করার প্রতিষেধক হিসেবে আল্লাহ তাদেরকে এ আয়াতে নির্দেশ দিয়েছেন।

২. কারো কারো মতে, আলোচ্য আয়াত ইহুদী নয় বরং মু'মিনদের সম্বোধন করে অবতীর্ণ করা হয়েছে।

معنى الصَّبْرِ والمرادُ به كَيفِيَّةُ الاِسْتِعانَةِ بِالصَّبْرِ وَالصَّلوٰةِ : د

(সবরের অর্থ ও উদ্দেশ্য এবং সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার পদ্ধতি) ঃ

الصَّبْر। এর আভিধানিক অর্থ হল– বিরত রাখা, বাধা দেওয়া। পারিভাষিক অর্থ, ইচ্ছার দৃঢ়তা, সংকল্পের পরিপক্কতা এবং লালসা-বাসনার নিয়ন্ত্রণ যার সাহায্যে কোন ব্যক্তি প্রবৃত্তির তাড়না ও বাহ্যিক প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে নিজের অন্তর ও বিবেকের মনোনীত পথে অব্যাহত গতিতে অগ্রসর হতে পারে।

الصبر। এর দুটি তাফসীর করা হয়– ১. তোমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য আল্লাহর উপর ভরসা করে সফলতা ও চিন্তামুক্ততার জন্য অপেক্ষমান থেকে সাহায্য কামনা কর,

২. সবর দ্বারা উদ্দেশ্য الصوم। (রোযা)। আয়াতের অর্থ রোযা অর্থাৎ তিনটি কামনীয় বস্তু খাদ্য, পানীয় এবং স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থেকে প্রবৃত্তির তাড়না দমিত করে এবং আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য কামনা কর।

সালাতের ও দুটি তাফসীর করা হয়–

১. সালাত দ্বারা পারিভাষিক সালাতই উদ্দেশ্য। আয়াতের মর্ম সালাতের উসিলায় ও তার আশ্রয়ে থেকে সাহায্য কামনা কর। কেননা সালাত হলো বিভিন্ন প্রকার আত্মিক ও দৈহিক ইবাদতের সমষ্টি। যার সাহায্যে আত্মা বিস্ময়কর শক্তি অর্জন করে এবং এর দ্বারা সকল সমস্যা সংকট বিদূরীত হয়। সালাত যে সকল ইবাদতের সমষ্টি তা হলো, তাহারত, সতর আবৃত করণ, কিবলামুখী হওয়া, নিরিবিলি শান্তভাবে দণ্ডায়মান হওয়া, (যা ইতিকাফ সদৃশ) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা নিজের হীনতা প্রকাশ করা, অন্তরে বিশুদ্ধ নিয়্যত করা। সালাতরত অবস্থায় শয়তানের সাথে যুদ্ধ করা, আল্লাহর সাথে একান্তে কথোপকথন করা, কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা, তাশাহ্হুদের মধ্যে কালিমায়ে শাহাদত পাঠ করা, পানাহার ও সহবাস থেকে প্রবৃত্তিকে বিরত রাখা যা রোযা সদৃশ্য। অর্থাৎ তোমরা নিজেদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য এবং দুঃখ-মুসীবত থেকে নিষ্কৃতির জন্য সবর ও সালাতের সাহায্য কামনা কর।

২. সালাত দ্বারা অত্র আয়াতে দু'আও উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা দুআ ও কায়মনবাক্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনার মাধ্যমে প্রবৃত্তি দমিত হয়। অন্তরে নম্রতা পয়দা হয় এবং আত্মা দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্ত হয়ে মা'রেফাতের নূরে আলোকিত হয়। যার ফলে আত্মা অতিশয় শক্তি লাভ করে। অতএব তোমরা সবর ও দুআর মাধ্যমে সাহায্য কামনা কর।

د : "مرجعُ الضمير فى "إِنَّهَا (إِنَّهَا এর ضمير এ উদ্দীষ্ট) ঃ

إِنَّهَا এর যমীরের مرجع কি হবে সে সম্পর্কে আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) তিনটি সম্ভাবনা উল্লেখ করেছেন–

১. انها এর যমীরের مرجع হল إِسْتَعِيْنُوْا ক্রিয়ার মধ্যে লুকায়িত মাসদার।

২. انها এর যমীরের مرجع হলো الصلواة। সবর ও সালাতের মধ্য থেকে শুধুমাত্র সালাতের দিকে যমীর ফিরানের কারণ দু'টি– ১. সালাত মহান তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্ববহ হওয়ার কারণে. ২. সালাত বহুসংখ্যক ইবাদতের সমষ্টি হওয়ার কারণে।

৩. انها এর যমীরের مرجع হলো পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বণী ইসরাঈলদের যে সকল বিষয়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং যে সকল বিষয় থেকে বারণ করা হয়েছে তার সমষ্টি।

ز : معنىُ الخُشوع

الخشوع বাবে فتح يفتح এর মাসদার। এর অর্থ হল الاخبات। অর্থাৎ বিনয়াবনত হওয়া, হীনতা ও দীনতা প্রকাশ করা, আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞচিত্তে প্রার্থনা করা। বিনয়ের দ্বারা যেহেতু দেহ ঝুকে পড়ে সেহেতু ঝুকে পড়া বালুকাময় টিলাকে خشعة বলা হয়।

معنى الخضوع (خضوع এর অর্থ) ঃ

خضوع বাবে فتح يفتح এর মাসদার। এর অর্থ হল اللِّيْنُ والْاِنْقِيَادُ অর্থাৎ অবনত হওয়া এবং বশ বা অনুগত হওয়া।

الفَرْقُ بَيْنَ الْخُشوع والخُضُوع (خضوع ও خشوع এর মধ্যকার পার্থক্য) ঃ

আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) خضوع ও خشوع এর মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয় বলেছেন–

الخشوعُ بالْجَوارح وَالخُضوعُ بالقَلْب অর্থাৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিনয়ের নাম خضوع – আর অন্তরের হীনতা ও বশ্যতার নাম হলো– خضوع।

ح **ঃ নামায কঠিন বোধ হওয়ার কারণ ঃ** নামায নিছক একটি সহজ ইবাদত হওয়া সত্ত্বেও তা কঠিনবোধ হওয়ার কারণ হল, মানবমন কল্পনারাজ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে অভ্যস্ত। আর মানুষের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও মনেরই অনুসরণ করে। কাজেই যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মনের অনুসরণে মুক্তভাবে বিচরণ করতে প্রয়াসী। নামায এরূপ স্বাধীনতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। না বলা, না হাসা, পানাহার না করা, চলাফেলা না করা প্রভৃতি নানাবিধ বাধ্যবাধকতার ফলে মন অতিষ্ঠ হয়ে উঠে এবং মনের অনুগত অঙ্গ প্রত্যঙ্গও এর দ্বারা কষ্টবোধ করতে থাকে। ফলে তাদের জন্যে নামায কঠিন ও কষ্ট কর কাজে।

س (٣٤) : وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا

الف : فَسِّرِ الْاٰيَةَ ـ

ب : ما مَعْنَى الشَّفَاعَةِ وَالْعَدْلِ وَالنَّصْرِ؟ اكتُبْ معَ بَيانِ الْفرقِ بَيْنَها

ج : ما النِّسْبَةُ بَيْنَ النُّصْرَةِ وَالْمَعُوْنَةِ؟

د : اَلْاٰيَةُ تدُلُّ على نَفْيِ الشَّفاعةِ لِاَهْلِ الْكَبائِرِ كَما هُوَ رَاىُ الْمُعْتَزِلَةِ ـ مَا الْجوابُ عَنه؟ بيِّن مُدلَّلًا ـ

উত্তর ঃ الف : تفسير الاية الكريمة (আয়াতের তাফসীর) ঃ

প্রারম্ভকথা ঃ বনী-ইসরাঈল জাতির একটি অমূলক ও ভ্রান্ত ধারণা ছিল এই যে, তারা মহিমান্বিত নবীগণের বংশধর এবং মহৎ প্রাণ পীর দরবেশ, পরহেযগার ও সাধক পুরুষদের সাথে তাদের গভীর ও নিকটতম সম্পর্ক থাকার কারণে পরকালে তারা মুক্তি লাভ করবে। উক্ত আয়াতে তাদের এ বদ্ধমূল ভ্রান্ত ও অমূলক বিশ্বাসের অপনোদন করা হয়েছে।

মূল বক্তব্য ঃ দুনিয়াতে সাধারণত নিয়ম হলো কোন মানুষ বিপন্ন বিপদগ্রস্থ হলে তার আপন জনেরা তাকে বিপদমুক্ত করতে সচেষ্ট হয়। নিজেদের পক্ষে তা সম্ভব না হলে কারো সুপারিশের মাধ্যমে উদ্দেশ্য হাসিল করতে প্রয়াসী হয়। যদি এ প্রয়াস ও ব্যর্থ হয়, তখন অর্থ সম্পদ ব্যয় করে বিনিময় মূল্য বা মুক্তিপণ আদায় করে তাকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করে। যদি এ চেষ্টাও ব্যর্থ হয়, তাহলে সম্মিলিত শক্তি প্রয়োগ করে যে কোন মূল্যে তাকে বিপদমুক্ত করতে স্বচেষ্ট হয়। অত্র আয়াতে অল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, পরকালে এ সমস্ত প্রক্রিয়ায় বিপদমুক্ত হওয়া যাবে না। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বণী ইসরাঈলের পূর্বোক্ত ভ্রান্ত ধারণা এবং অমূলক বিশ্বাসের বাতুলতা ও অসারতা ঘোষণা করেছেন– সেদিনকে ভয়কর অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যে দিন কেউ কারো কোন প্রকার উপকারে আসবে না এবং কারো পক্ষে কোন সুপারিশ ও গ্রহণযোগ্য হবে না। কারো পক্ষ থেকে কোন বিনিময় মূল্য ও গ্রহণ করা হবে না এবং তারা কোন সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।

শিক্ষা ঃ কিয়ামত দিবসের জন্য সকলের যথাসাধ্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য।

ب : مَعنى الشَّفَاعَةِ (شفاعة অর্থ) ঃ الشفاعة শব্দটি বাবে فتح يفتح এর মাসদার। অর্থ সুপারিশ করা।

مَعْنَى الْعَدْلِ (عدل অর্থ) ঃ الْعَدْل শব্দটি বাবে ضرب يضرب এর মাসদার। عدل অর্থ ন্যায় পরায়ণতা, পরিণাম, প্রতিদান, মধ্যপন্থা, সমতা, সোজা হওয়া ইত্যাদি। আয়াতে প্রতিদান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

معنى النَّصْر (نصر অর্থ) ঃ نصر শব্দটি মাসদার। অর্থ সাহায্য করা, সহযোগিতা করা, মুক্তি দেয়া ইত্যাদি।

الفرقُ بَيْنَهُنَّ (পারস্পরিক পার্থক্য) ঃ

النِّسبةُ بَيْنَ النُّصْرَةِ وَالْمَعُوْنَةِ (নুছরত ও মাউনাতের মধ্যকার সম্পর্ক) ঃ

النُّصْرَة এবং الْمَعُوْنَة এর মধ্যে عموم خصوص مطلق এর সম্পর্ক রয়েছে। نصرة হল خاص। কেননা বিপদ-মুসিবত কষ্ট-ক্লেশ দূর করার জন্য সাহায্য করাকে النصرة বলে। পক্ষান্তরে المعونت হল عام। দুঃখ বেদনা, কষ্ট– ক্লেষ্ট দূর করার এবং দুঃখ-কষ্ট দূর করা ব্যতিরেকে শুধুমাত্র উপকৃত করা উভয়ের জন্য সাহায্য করাকে المعونت বলে।

১ ঃ **মু'তাযিলাদের যুক্তি খন্ডন ঃ** উক্ত আয়াতকে মু'তাযিলা সম্প্রদায় প্রমাণ হিসেবে পেশ করে বলেন– কবীরা গুণাহকারী ব্যক্তির জন্য আখিরাতে সুপারিশ চলবে না। তাদের এ যুক্তি খন্ডন করে আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) বলেন, অত্র আয়াতে শুধুমাত্র কাফির মুশরিকদের সুপারিশ গ্রহণ না করার কথা বলা হয়েছে। কেননা অসংখ্য আয়াত ও হাদীসে আহলে কাবায়েরের পক্ষে সুপারিশ গ্রহণ করা হবে একথা বলা হয়েছে। অত্র আয়াতে সুপারিশ গ্রহণ না করার বিষয় যে শুধুমাত্র কাফির মুশরিকদের ব্যাপারে এর স্বপক্ষে দুটি যুক্তি রয়েছে।

১. আয়াতে কাফিরদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে।

২. আয়াতটি বণী ইসরাঈলের একটি ভ্রান্ত ধারণা ও অমূলক বিশ্বাস অপনোদনের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। আর তাহলো তাদের ধারণামতে তাদের পূর্বপুরুষ মহামনীষীরা তাদের জন্য পরকালে সুপারিশ করবে। এ উভয় বিষয় এ কথাই বুঝায় যে, এখানে সুপারিশ গ্রহণ না করার সম্পর্ক কাফিরদের সাথে।

س (٣٥) : قوله تعالى بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَاِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ـ

الف : بَيِّنْ مُنَاسَبَةَ الاية بِمَا قَبْلَهَا ـ

ب : ما الفرقُ بَيْنَ الْاِبداعِ وَالتَّكْوِيْنِ؟

ج : ما معنى الْقَضَا اَصْلًا ومَجَازا ؟

د : ما هو المرادُ بِكَلِمَةِ "كُنْ" ؟

ه : قال البيضاوى (رحـ) وَفِيْهِ تقريرٌ لِمَعْنَى الْاَبْدَاعِ وَاِيْمَاءٌ اِلٰى حُجَّةٍ خَامِسَةٍ كَيْفَ التَّقْرِيْرُ وكيفَ الْاِيْمَاءُ وَالْحُجَّةُ لِاَيِّ اَمْرٍ ؟

উত্তর ঃ الف : مُنَاسَبَةُ الاية بِمَا قَبْلَهَا **(পূর্বের সাথে যোগসূত্র) ঃ** পূর্বের আয়াতের সাথে অত্র আয়াতের নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে তাহলো এই যে, পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে– আহলে কিতাবগণ বলে, আল্লাহ পাক সন্তান-সন্ততি ধারণ করেন। অত্র আয়াতে তাদের এহেন দাবীকে খন্ডন করে বলা হয়েছে যে, নিখিল বিশ্ব আল্লাহর সৃষ্টি। তিনি 'কুন' বা 'হও' বললে সবকিছু হয়ে যায় অতএব তার সম্পর্কে এমন কথা চিন্তা করা অমার্জনীয় অপরাধ বৈ কিছুই নয়।

ب : الفرقُ بَيْنَ الْاِبْدَاعِ وَالتَّكْوِيْنِ (ابداع ও تكوين **এরপার্থক্য) ঃ**

আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) ابداع এবং تكوين এর মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন–

اَلْاِبْدَاعُ اِخْتِرَاعُ الشَّيْئِ لَا عَنْ شَيْئٍ دَفْعَةً অর্থাৎ পূর্ব নমুনা ও উপাদান ছাড়াই মুহূর্তের মধ্যে কোন বস্তু তৈরী করা বা আবিষ্কার করা হলো اِبداع।

والتكوِيْنُ الَّذِىْ يَكُوْنُ بِتَغْيِيْرٍ وَفِىْ زَمَانٍ غَالِبًا অর্থাৎ কোন বস্তুকে পরিবর্তন করে অন্য কোন বস্তু তৈরী করাকে تكوين বলে। তাকবীনে সাধারণত সময় ব্যয়িত হয়।

এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে ابداع ও تكوين এর মাঝে দু'রকমের পার্থক্য রয়েছে।

১. ابداع বলা হয় কোন বস্তু পূর্ণ নমুনা বা উপাদান ছাড়া সৃষ্টি করা, আর এক বস্তু পরিবর্তন করে অন্য বস্তু সৃষ্টি করা হলো تكوين।

২. মুহূর্তের মধ্যে– ক্ষণিকের বিলম্ব ছাড়াই কোন বস্তু তৈরী করাকে ابداع বলে। আর সময় ক্ষেপণ করে কোন বস্তু তৈরী করাকে تكوين বলে।

ج : مَعْنَى الْقَضَاءِ اَصْلًا (قضى এর আভিধানিক অর্থ) ঃ

القضاء শব্দটি বাবে ضرب يضرب এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ নিপুণভাবে তৈরী করা, নির্ধারণ করা, প্রয়োজন পূর্ণ করা, লক্ষ্যে পৌছা, ঋণ পরিশোধ করা, মৃত্যুবরণ করা।

আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) বলেন– القضاء এর মূল অর্থ হল اِتْمَامُ الشَّيْئِ قَوْلًا اَوْفِعْلًا

কথা বা কাজে কোন বস্তু পূর্ণতায় পৌছানো। কথায় পূর্ণতায় পৌছানো অর্থাৎ ফয়সালা করা। যেমন আল্লাহর বাণী وَقَضٰى رَبُّكَ اَنْ لَّاتَعْبُدُ আর কাজে পূর্ণতায় পৌছার অর্থ কোনকর্মে নৈপুণ্য প্রদর্শন করা। যেমন আল্লাহর বাণী– فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ অর্থাৎ তিনি সুনিপূণভাবে সপ্তাকাশ তৈরী করলেন।

مَعْنَى الْقَضَاءِ مَجَازًا (قضاء এর রূপক অর্থ) ঃ

রূপকার্থে قضاء শব্দটির প্রায় ক্ষেত্রে বর্ণনা করে আল্লামা বায়যাবী (রহঃ)– বলেন– وَاُطْلِقَ عَلٰى تَعَلُّقِ الْاِرَادَةِ الْاِلٰهِيَّةِ لِوُجُودِ الشَّيْئِ مِنْ حَيْثُ اَنَّهٗ يُوْجِبُهٗ অর্থাৎ কোন বস্তু অস্তিত্বলাভের সাথে আল্লাহর অভিপ্রায় এমনভাবে সম্পৃক্ত হওয়া যা قضاء কে আবশ্যক করে।

د : اَلْمُرَادُ بِكَلِمَةِ "كُنْ" (كن শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য) ঃ

كُنْ শব্দের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) বলেন–

لَيْسَ الْمُرَادُ بِهٖ حَقِيْقَةُ اَمْرٍ وَامْتِثَالٌ بَلْ تَمْثِيلُ حُصُولِ مَاتَعَلَّقَتْ بِهٖ اِرَادَتُهٗ بِلَا مُهْلَةٍ بِطَاعَةِ الْمَامُورِ الْمُطِيْعِ بِلَاتَوَقُّفٍ

অর্থাৎ كن শব্দ দ্বারা বাস্তব নির্দেশজ্ঞাপক ক্রিয়া বা তা বাস্তবায়ন উদ্দেশ্য নয় বরং আল্লাহর অভিপ্রায় যার সাথে সম্পৃক্ত হয়। ক্ষণিক বা প্রহরসম বিলম্ব ছাড়াই বাধ্যগত অধীনস্তের আনুগত্যের সাথে তা প্রস্তুত করা।

ه : كَيْفَ التَّقْرِيرُ فِى قَوْلِهٖ "فِيْهِ تَقْرِيْرٌ" ঃ অত্র আয়াতে আহলে কিতাবের ভ্রান্ত দাবী খন্ড করা হয়েছে। তাদের দাবী হল আল্লাহ্ তা'আলা সন্তান সন্ততি ধারণ করেন। আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) বলেন– فَاِذَا قَضٰى اَمْرًا اِنَّمَا يَقُولُ لَهٗ كُنْ فَيَكُونُ (অর্থাৎ তিনি যখন কিছু সৃষ্টি করার অভিপ্রায় করেন, তখন তিনি শুধু 'কুন' তথা 'হও' বললে তা হয়ে যায়।) আয়াতাংশের 'কুন' বাক্য তাদের দাবী খণ্ডনকে সমর্থন করে। কেননা كن দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তাঁর ইচ্ছার সাথে সাথে বিলম্ব ছাড়াই বস্তু অস্তিত্ব লাভ করা। অথচ সন্তান লাভ করতে হলে স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী দীর্ঘদিন সময় লাগে। এর দ্বারা তার সন্তান সন্ততি ধারণ না করাকেই সমর্থন করে এবং অত্র আয়াতাংশে আহলে কিতাবদের দাবীর অসারতা ও বাতুলতার পঞ্চম দলিলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা وَاِذَا قَضٰى اَمْرًا

عطف بديعُ السَّمٰوٰتِ الخ আয়াতাংশ يقولُ لَهُ كُنْ فَيَكون এর উপর হয়েছে। আর معطوف عليه ও معطوف পরস্পর আলাদা বিষয়ই হয়ে থাকে। অতএব بديع দ্বারা যেহেতু চতুর্থ দলিল দেয়া হয়েছে। অতএব فاذا قضى পঞ্চম দলিল হবে।

اَلْحُجَّةُ الْخَامِسَةُ (পঞ্চম দলিল) ঃ পঞ্চম দলিল হল সন্তান-সন্ততি জন্মলাভের জন্য বিভিন্ন ধাপ অতিক্রান্ত হতে হয়; যার ফলে অনেক সময় ব্যয়িত হয়। আর আল্লাহর কার্যাবলী এর থেকে মুক্ত। অতএব তার পক্ষে সন্তান-সন্ততি ধারণ করার দাবী অযৌক্তিক ও অবাস্তব।

س (٣٦) : قوله تعالى مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْنُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا ۔

الف : اكتُبْ سَبَبَ نُزولِ الْاٰيَةِ ۔

ب : ما مَعْنَى النَّسْخِ لغةً وشرعًا ؟

ج : اَوْضِحِ الْقِرَاٰةَ فِى قوله تعالى نَنْسَخْ اَوْ نُنْسِهَا حقَّ الايضاح۔

د : ما الحكمةُ فى نسْخِ الْاَحْكامِ الشَّرعِ وهلْ يجوزُ نَسْخُ الكتابِ بِالسُّنَّةِ حرِّر مُوضِحًا ۔

উত্তর ঃ الف سَبَبُ نُزُولِ الاٰيَة (আয়াতের শানে নুযূল) ঃ আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) এই আয়াতের শানে নুযূল প্রসংগে বলেন– যখন পৌত্তলিক ও ইয়াহুদীগণ কটাক্ষ করে বলতে লাগল যে, দেখ! মুহাম্মদ তার অনুসারীদের আজ এক কথা বলে, আর কাল এক কথা বলে। কুরআন যদি সত্যি সত্যি আল্লাহর কালাম হতো তাহলে তাতে এত পরিবর্তন হয় কেন? আর কুরআনের আদেশ রহিত হয় কেন? এর জবাবে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেছেন। এর সারকথা হলো মানুষের অবস্থা পরিবেশ উন্নতি অবনতি প্রয়োগ ইত্যাদি সবকিছু আল্লাহর নখদর্পনে। তাই মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে নিছক তাদের কল্যানার্থে আল্লাহ তা'আলা কোন আদেশকে রহিত করেন।

ب : معنى النَّسْخِ لُغَةً (নসখের আভিধানিক অর্থ) ঃ

نسخ শব্দটি বাবে فتح يفتح এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ রহিত করা, দূর করা, বাতিল করা, বিকৃত করা, অনুলিপি প্রস্তুত করা।

আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) বলেন–

اَلنَّسْخُ فِى اللُّغَةِ إِزَالَةُ الصُّوْرَةِ عَنِ الشَّيْئِ وإثْبَاتُهَا فِى غَيْرِه كَنَسْخِ الظِّلِّ لِلشَّمْسِ

অর্থাৎ কোন বস্তু থেকে তার আকৃতি দূর করে তা অপরের মধ্যে প্রকাশ করা। যেমন ছায়া কর্তৃক রৌদ্রকে বিকৃত করা। ইমাম রাগিব ইস্পাহানী বলেন–

النَّسْخُ إِزَالَةُ الشَّيْئِ بِعُقُوْبَةٍ

مَعْنَى النَّسْخِ إِصْطِلَاحًا (নসখের পারিভাষিক অর্থ) ঃ

কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় এক বিধানের স্থলে অন্য বিধান প্রবর্তন করাকে নসখ বলে।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) নসখের সংজ্ঞায় বলেন–

هُوَ رَفْعُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِدَلِيْلٍ شرعيّ مُتَأَخِّرٍ

কুরআনের আয়াতের নসখ প্রসংগে আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) বলেন–

نسخُ الْأيَة بيانُ انْتِهَاءِ التَّعَبُّدِ بِقِرَائَتِهَا او الحكمِ الْمُسْتَفَاد مِنْهَا اَوْبِهِمَا جَمِيْعًا অর্থাৎ কোন আয়াত মানসূখ হওয়ার তাৎপর্য হল, আয়াতের তেলাওয়াত অথবা আয়াত থেকে প্রাপ্ত হুকুম পালন করা অথবা উভয়কে বন্দেগী হিসেবে গৃহীত হওয়ার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা।

اقسامُ النَّسْخِ (নসখের প্রকারভেদ) ঃ কুরআনী নসখ মোট তিন প্রকার–

১. نسخُ التِّلَاوَة والحكمِ مَعًا (তিলাওয়াত ও হুকুম উভয়টি রহিত করা)

২. نسخ الحكمِ دُوْنَ التلاوة (শুধু হুকুম রহিত করণ, তিলাওয়াত নয়)

৩. نسخُ التِّلَاوةِ دُوْنَ الْحُكْمِ (কেবল তিলাওয়াত রহিত করণ; হুকুম নয়)

توضيحُ الْقِرَاتِ فِى قوله تعالى نَنْسَخْ اَوْنُنْسِهَا : ج

نَنْسَخْ এর কিরাআতসমূহ ও তার অর্থ ঃ

نَنْسَخْ শব্দে দুটি কিরাআত রয়েছে।

১. জমহুর কারীগণের মতে– نَنْسَخْ বাবে فتح থেকে। অর্থ আমি কোন আয়াত রহিত করলে।

২. ইবনে আমিরের মতে نَنْسَخْ বাবে إفعال থেকে। অর্থ আমি আপনাকে অথবা জিবরাঈলকে যে আয়াত রহিত করার নির্দেশ দেই। কিংবা অর্থ হল, আমি যে আয়াত রহিত পাই।

نُنْسِهَا কিরাআতসমূহ ও তার অর্থ ঃ

نُنْسِهَا এর মধ্যে আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) ছয়টি কিরাআত উল্লেখ করেছেন। অর্থসহ তা নিম্নে প্রদত্ত হলো–

১. জমহুর কারীগণের মতে, বাবে افعال হতে। অর্থ আমি বিস্মৃত করে দিলে।

২. ইবনে কাসির ও আবূ আমির (রহঃ) এর মতে বাবে فتح থেকে। نَنْسَاهَا অর্থ (اٰيتِ نَاسِخَه রহিতকারী আয়াত সম্পর্কে বলা হচ্ছে)। আমি যখন বিলম্ব করি।

৩. বাবে تفعيل থেকে نُنَسِّهَا অর্থ আমি কাউকে যে আয়াত ভুলিয়ে দেই।

৪. বাবে فتح থেকে واحد مذكر حاضر এর সীগাহ। تنسها অর্থ যে আয়াত তুমি বিস্মৃত হয়ে যাও।

৫. বাবে افعال থেকে مضارع مجهول এর واحد مذكر حاضر। تُنْسَهَا অর্থ যে আয়াত তোমার থেকে বিস্মৃত করা হয়।

৬. বাবে افعال থেকে مضارع معروف এর جمع متكلم এবং كاف যমীরসহ نُنْسِكَهَا অর্থ আমি তোমাকে যে আয়াত বিস্মৃত করে দেই।

د : اَلْحِكْمَةُ فِىْ اَحْكَامِ الشَّرْعِ **(শরীআতের বিধান রহিত করণের গুঢ় রহস্য) ঃ** কোন বিধান রহিত করণে নিম্নোক্ত হিকমত বা গুঢ় রহস্য বিদ্যমান থাকে।

১. মানব কল্যাণ সাধন।

২. মানুষকে আত্মশুদ্ধি লাভের পথ প্রদর্শন।

৩. অভিজ্ঞ চিকিৎসক রুগীর অবস্থার পরিবর্তনের সংগে সংগে ঔষধের তালিকায় যেমনিভাবে পরিবর্তন করে থাকে। তেমনিভাবে মানুষের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক তার সংশোধনের ধারায়ও পরিবর্তন সাধন করেন।

৪. জীবনোপকরণের ন্যায় কল্যাণকর কাজসমূহ যুগ ও ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। এজন্য মানুষের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে আল্লাহ তা'আলা মানুষের বিধান পরিবর্তন করেন।

نَسْخُ الْقُرْاٰنِ بِالسُّنَّةِ (হাদীস দ্বারা কুরআনী বিধান রহিত করণ) ঃ হাদীস দ্বারা কুরআনী বিধান রহিতকরণ বৈধ কিনা এ ব্যাপারে ইমামগণের মতবিরোধ রয়েছে।

(ক) ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর মতে نَسْخُ الْقران بالسُّنَّة বৈধ নয়। তিনি তার মতের সমর্থনে কয়েকটি দলিল পেশ করেন।

১. হাদীস كَلاَمِىْ لاَيَنْسَخُ كلاَمَ اللّٰه

২. হাদীসের তুলনায় কুরআনের মর্যাদা বেশী। অতএব নিম্ন মর্যাদাবান বিষয় দ্বারা উচ্চ মর্যাদাবান বিষয়কে রহিত করা বৈধ হবে না।

৩. হাদীসদ্বারা কুরআনকে রহিত করা হলে ইসলামের শত্রুরা বলবে রাসূল (সাঃ) স্বয়ং আল্লাহর বিরোধিতা করেন।

(খ) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর মতে, হাদীস দ্বারা কুরআনী বিধান রহিত করা বৈধ। তাঁর দলিল হলো রাসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহর বাণী–

اِنَّ اَحَادِيْثَنَا يَنْسَخُ بَعْضُهَا بعضًا كَنَسْخِ الْقُرانِ

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের উত্তর –

১. হাদীসের শব্দ كَلَامِىْ (আমার বাণী) দ্বারা নবী করীম (সাঃ) এর সেসব বাণী বুঝানো হয়েছে যা তাঁর নিজের চিন্তাপ্রসূত মতামত যা ওহীলব্ধ নয়।

২. كَلَامِىْ (আমার বাণী) দ্বারা কুরআনের তেলাওয়াত রহিত হয় না; কিন্তু বিধান রহিত হয়।

৩. كَلَامِىْ لَايَنْسَخُ الخ হাদীসটি ইবনে উমরের বর্ণিত اِنَّ اَحَادِيْثَنَا الخ। হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

উল্লেখ্য যে, হাদীসে মুতাওয়াতির দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে কুরআনী বিধান রহিত করা বৈধ। পক্ষান্তরে خبر واحد দ্বারা সর্বসম্মতিতে কুরআনের আয়াত রহিত করা বৈধ নয়।

س (٣٦) : وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وسَعٰى فِىْ خَرَابِهَا اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَا اِلَّاخَائِفِيْنَ

الف : ما الْمُرادُ بِالْمَنْعِ وَمَا مِصْدَاقُ مَسَاجِدَ فِى الْاٰية

ب : اُذْكُرْ سَبَبَ نُزولِ الْاٰيةِ

ج : بيِّن حُكْمَ مُذاكراةِ الْاُمُورِ السِّياسَةِ فِى الْمَساجِدِ والْمَنْعِ عنها بِالادلة العقلية والنقلية ـ

د : اِدْفَعِ الْوَهْمَ النَّاشِىْ عَنْ ظَاهِرِ الْاٰيَةِ عَلٰى نَهْجِ الْمُفَسِّرِ العلام ـ

উত্তর ঃ المرادُ بِالْمَنْعِ (منع এর দ্বারা উদ্দেশ্য) ঃ

আয়াতে منع শব্দ উল্লেখ রয়েছে। যার অর্থ বিরত রাখা, বঞ্চিত করা। তবে এখানে মসজিদ জনশূন্য ও উজাড় করার সম্ভবপর যতপন্থা হতে পারে সবই উদ্দেশ্য। খোলাখুলিভাবে মসজিদকে বিধ্বস্ত করা ও জনশূন্য করা যেমনিভাবে এর

অন্তর্ভূক্ত তেমনিভাবে এমন কারণ সৃষ্টি করাও এর অন্তর্ভূক্ত, যার ফলে মসজিদ জনশূন্য ও উজাড় হয়ে যায়। মসজিদ জনশূন্য ও উজাড় হওয়ার অর্থ এই যে, সেখানে নামাজ পড়ার জন্য কেউ আসেনা কিংবা নামাজীর সংখ্যা হ্রাস পাওয়া। এমনিভাবে মসজিদে যিকির ও নামাযে বাধা প্রদানের যত পন্থা হতে পারে তার সবই এ হুকুমের অন্তর্ভূক্ত। মসজিদে গমনকরতে অথবা সেখানে তেলাওয়াত ও নামায অদায় করতে পরিষ্কার ভাষায় নিষেধাজ্ঞা প্রদান যেমন এর অন্তর্ভূক্ত; তেমনিভাবে মসজিদে হট্টগোল করে অথবা আশেপাশে গান-বাজনা করে মুসল্লীদের নামায, যিকিরে বিঘ্ন সৃষ্টি করা ও এর অন্তর্ভূক্ত।

مِصداقُ مساجِد فى الاية **আয়াতে মসজিদ দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ** এ সম্পর্কে তাফসীরকারকগণ লিখেন– যদিও বাইতুল্লাহ শরীফের বিশেষ ঘটনা মতান্তরে বাইতুল মাকদিসের বিশেষ ঘটনায় আয়াতটি নাযিল হয়েছে। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ পাকের কালাম চিরন্তন, তার ঘোষণা সর্বকালের জন্য। তাই মসজিদ শব্দের বহুবচন মাসাজিদ শব্দটি আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব মাসাজিদ দ্বারা বিশ্বের সকল মসজিদ উদ্দেশ্য। মসজিদে হারাম (বাইতুল্লাহ), বাইতুল মুকাদ্দাস ও মসজিদে মসজিদে নববীর অবমাননা যেমনিভাবে সর্বনিকৃষ্টতম; জুলুম ও বড় অপরাধ তেমনিভাবে অন্যান্য মজিদের বেলায়ও তা সমভাবে প্রযোজ্য। তবে এ তিনটি মসজিদের বিশেষ মাহত্ম্য ও সম্মান স্বতন্ত্রভাবে স্বীকৃত।

ب : سببُ نزولِ هٰذِهِ الاٰية **আয়াতের শানে নুযুল ঃ**

আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে দুটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

১. ইবনে আব্দুর রহমান (রহঃ) ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণনা করেন, ষষ্ঠ হিজরীতে যখন প্রিয়নবী (সাঃ) ১৪শ সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) নিয়ে মদীনা শরীফ থেকে মক্কা শরীফ রওয়ানা হয়েছিলেন। তাঁর এ সফরের উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র কা'বা শরীফ তাওয়াফ, জিয়ারত এবং তথায় নামায আদায় করা। কোন প্রকারের যুদ্ধের চিন্তা তাঁর ছিল না। তাই মুসলমানরা নিরস্ত্র অবস্থায় মক্কা অভিমুখে গমন করেছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মক্কাবাসী পৌত্তলিকগণ মক্কার অদূরে অবস্থিত হোদাইবিয়া নামক স্থানে প্রিয়নবী (সাঃ) কে বাধা দেয়। এ সময় এই আয়াতটি নাযিল হয়।

২. আল্লামা বগভী (রহঃ) লিখেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), আতা (রাঃ) প্রমূখ বলেন, খ্রীস্টান রাজা তাইসুস আছিয়ানুস রুমী ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। তখন সে বাইতূল মুক্কাদ্দাস বিধ্বস্ত করে তথায় আবর্জনা ও শুকর নিক্ষেপ করে এবং তাওরাতের কপিসমূহ জ্বালিয়ে দেয়। সমগ্র শহরে হত্যা ও লুণ্ঠন চালায় এবং শহরটিকে জনমানবহীন প্রান্তরে পরিণত করে। এ ঘটনা স্মরণ করিয়ে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

ج : مُذَاكَرَةُ الْأُمُورِ السِّيَاسِيَّةِ فِى الْمَسَاجِدِ **(মসজিদে রাজনৈতিক আলোচনা) ঃ**

মসজিদ আল্লাহর ঘর। এর পবিত্রতা ভাবগাম্ভীর্যতা রক্ষা করা সকলের ঈমানী দায়িত্ব। মসজিদের বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার জন্যেই কিছু বৈধ কাজ বা আচরণ মসজিদের অভ্যান্তরে অবৈধ করা হয়েছে। যেমন– মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করা, মলমূত্র ত্যাগ করা, কলরব– হৈ হুল্লোড় করে ইবাদতকারী, ধ্যানী, গবেষক, শিক্ষার্থী প্রমুখের জন্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করা, কোনো অপরাধীকে শাস্তি দেয়া, পশু জবাই করা প্রভৃতি এমন অনেকগুলো কাজ চিহ্নিত করা যায়; যেগুলো মসজিদের বাইরে করা সম্পূর্ণ জায়েয হলেও মসজিদের অভ্যন্তরে করা জায়েয নয়। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর মসজিদ ছিল একাধারে প্রধান সচিবালয়, আলোচনা গৃহ, শিক্ষা নিকেতন এবং সকল সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্র। মূলতঃ মসজিদ হলো মু'মিন জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু বর্তমান রাজনীতি শরীআত মুতাবিক পরিচালিত না হওয়ায় এবং এর দ্বারা মসজিদের মর্যাদা ও পবিত্রতা ক্ষুন্ন হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে বিধায় মসজিদে কোনো প্রকার রাজনৈতিক প্রোগ্রাম করার অনুমতি দেয়া যায় না। তাছাড়া রাজনৈতিক সভায় সাধারণত মিথ্যাচারের কাসুদ্ধি গাওয়া হয় যা মসজিদের আদব ও মর্যাদার পরিপন্থী।

د : دَفْعُ تَوَهُّمِ النَّاشِئِ عَنِ الْاٰيَةِ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ .... **(আয়াত থেকে সৃষ্ট বিভ্রান্তি অপনোদন) ঃ**

বক্ষমান আয়াতের বাহ্যর্থের প্রতি লক্ষ করলে এ বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় যে, আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ অনুযায়ী বুঝা যায়, মসজিদে গমনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীরা ভীত-সন্ত্রস্থ হয়ে মসজিদে প্রবেশ করেছিলো। অথচ বস্তুতঃ তারা অহমিকার সাথে নিশ্চিন্তে তথায় প্রবেশ করেছিল। আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) এ বিভ্রান্তি অপনোদনে চারটি ব্যাখ্যা পেশ করেছেন।

১. مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَا اِلَّا خَائِفِيْنَ আয়াতাংশের لهم এর ل হরফটি اَلْاِخْتِصَاصُ عَلٰى وَجْهِ اللِّيَاقَةِ অর্থাৎ উপযুক্ততার ভিত্তিতে বিশিষ্ট করে দেয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর خائفين দ্বারা خائفين من الله উদ্দেশ্যে। আয়াতের অর্থ বিনয় ও ভীত-সন্ত্রস্থ না হয়ে তথায় প্রবেশ করা তাদের জন্য শোভনীয় নয়। অতএব মসজিদ ধ্বংস বা বিরান করার দুঃসাহস প্রদর্শন করা তাদের জন্য মোটেও ঠিক হয়নি।

২. لهم এর ل হরফটি الاستحقاق। অর্থাৎ উপযুক্ততার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। خَائِفِيْنَ দ্বারা خَائِفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ উদ্দেশ্য। এমতাবস্থায়

আয়াতের অর্থ হল, মুমিনদের ভয়ে তাদের সেখানে প্রবেশ করার অধিকার নেই। অতএব মুমিনদের তথায় গমনে বাধা দান করার প্রশ্নই আসে না।

৩. لهم এর ل হরফটি الْاِرْتِبَاط অর্থাৎ যোগসূত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আয়াতের অর্থ– আল্লাহর জ্ঞান ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তথায় তারা ভীত-সন্ত্রস্থ ছাড়া প্রবেশ করবে না।

৪. এখানে خبر (সংবাদ) দ্বারা نهى (নিষেধ) উদ্দেশ্য। আয়াতের অর্থ– তাদেরকে মসজিদে অবস্থানে করতে নিষেধ করা হয়েছে।

س (٣٧) : خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وعَلٰى سَمْعِهِمْ وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَة ولَهُمْ عَذابٌ عَظِيْم

الف : مَا الْمُنَاسَبَة لِهٰذِهِ الْاٰيَةِ بِمَا قَبْلَهَا ؟

ب : مَامَعْنٰى الْخَتْمِ وَالْغِشَاوَةِ اَصَالَةً وعُرْفًا ؟

ج : ما المرادُ بِالْخَتْمِ وَالْغِشَاوَة ؟

د : الْخَتْمُ وَالتَّغْشِيَةُ محمولٌ علٰى الْحَقِيْقَةِ امْ علٰى المجازِ؟ بيِّن مع ذكرِ مذهبِ الْمُعتزِلة

ه : أذكرْ وَجْهَ ذكرِ الغِشاوَةِ لِلاَبْصَارِ وَالْخَتْمَ لِلْقُلُوْبَ والسَّمْعَ

و : ما النُّكْتَةُ فِى اِيْرَادِ الْقُلُوْب وَالاَبْصَارِ بِصِيْغَةِ الْجَمْعِ والسَّمْعِ بصيغةِ الواحِد ومَا المرادُ بهٰذه الثلاثة ؟

উত্তর ঃ الف : .... مناسبة الاية بما قبلها (পূর্বের আয়াতের সাথে অত্র আয়াতের সম্পর্ক) ঃ

আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) خَتَمَ اللّٰهُ আয়াত ও পূর্বের আয়াত اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا এ দুই আয়াতের মাঝে সম্পর্ক প্রসঙ্গে বলেন– خَتَمَ اللّٰهُ الخ আয়াতটি পূর্বের আয়াতের জন্য سبب ও علت হয়েছে। অর্থাৎ পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে কাফিরদের দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দেয়া না দেয়া সমান; কোন অবস্থাতেই তারা ঈমান আনবেনা। অত্র আয়াতে এর কারণ বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তকরণে মোহর এটে দিয়েছে। তাদের দৃষ্টিশক্তির উপর অন্তরাল সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের কর্ণকুহর বন্ধ করে দিয়েছেন। سبب ও مسبب এর মাঝে অনুরূপভাবে علت ও معلولএর মাঝে كمال اِتِّصال বা নিবিড় সম্পর্ক থাকে বিধায় এখানে عطف পরিহার করা হয়েছে।

مَعْنَى الْخَتْمِ (ختم এর আভিধানিক অর্থ) ঃ الختم শব্দটি বাবে ضرب يضرب এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ- গোপন করা। আর الختم এর প্রচলিত অর্থ হল- ১. اَلْاِسْتِيْثَاقُ مِنَ الشَّيْئِ بِضَرْبِ الْخَاتَمِ عَلَيْهِ অর্থাৎ কোন বস্তুর উপর মোহরাঙ্কিত করে তাকে সুদৃঢ় করা।

২. اَلْبُلُوغُ اٰخِرَهُ অর্থাৎ কোন বস্তুর প্রান্তসীমায় পৌছে যাওয়া। আভিধানিক অর্থ এবং প্রচলিত অর্থের মধ্যকার সম্পর্ক হল–১. মোহরাঙ্কিত করার দ্বারা অভ্যন্তরীণ বস্তু প্রাপক ব্যতিত অন্যের কাছে গোপন থাকে। ২. কোন বস্তুর প্রান্তসীমায় পৌছার দ্বারা উক্ত বস্তু সংরক্ষিত হয়ে যায়।

ب : مَعْنَى الْغِشَاوَةِ (غِشَاوَة এর অর্থ) ঃ غِشَاوَة শব্দটি فعالة এর ওযনে اسم اله এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। এটা تَغْشِيَة মাসদার থেকে উৎকলিত। এর অর্থ চতুর্দিক হতে আচ্ছাদিত করা, غشاوة এর শাব্দিক অর্থ– পর্দা, ঢাকনা।

আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) বলেন– بُنِيَتْ لِمَا يَشْتَمِلُ عَلَى الشَّيْئِ كَالْعِصَابَةِ وَالْعِمَامَةِ অর্থাৎ غشاوة শব্দটি গঠন করা হয়েছে এমন বস্তু বুঝাবার জন্য যা কোন বস্তুকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে নেয়। যেমন– عِمَامَة অর্থ পাগড়ী যা মাথাকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে রাখে।

ج : الْمُرَادُ مِنَ الْخَتْمِ وَالْغِشَاوَةِ (ختم ও غشاوة দ্বারা উদ্দেশ্য) ঃ

উল্লেখ্য যে, উক্ত আয়াতে خَتْم ও غِشَاوة শব্দদ্বয়কে তার মূল অর্থে ব্যবহার করা হয়নি বরং রূপক (مجازى) অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) এ সম্পর্কে বলেন– আল্লাহদ্রোহী কাফিরদের কুফর ও পাপের প্রতি আসক্তি ঈমান ও সৎকর্মের প্রতি বিদ্বেষ, হঠকারিতা, অন্ধানুকরণের কারণে এবং সুস্থ-বিবেচনা থেকে স্বেচ্ছায় বিরত থাকার কারণে তাদের মন-মানসিকতায় এমন এক অবস্থা সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে যার ফলে তাদের অন্তকরণে এবং কর্ণকুহরে হক তথা সত্য কথা প্রবেশ করে না এবং তাদের চর্ম চক্ষু আল্লাহর নিদর্শনাবলী দেখতে পায় না। আর এ কারণে কুফর ও পাপাচার তাদের কাছে প্রিয় এবং ঈমান ও সৎকর্ম তাদের কাছে ঘৃণীত। মনে হয় যেন, তাদের অন্তকরণে ও কর্ণকুহরে মোহরাঙ্কিত করা হয়েছে এবং তাদের চোখের উপর পর্দা ফেলে দেয়া হয়েছে তাই তারা আল্লাহর নির্দশনাবলী দেখতে পায় না। সৎকথা শুনতে এবং উপলব্ধি করতে পারে না।

الْخَتْمُ وَالتَّغْشِيَةُ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَقِيقَةِ اَمْ عَلَى الْمَجَازِ؟

আলোচ্য আয়াতে ختم ও غشاوة শব্দদ্বয় তার মূল অর্থে ব্যবহৃত হয়নি বরং রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের বিশ্বাস মতে, আল্লাহ্ তাআলার প্রতি কোন মন্দকাজের সম্পর্ক করা যাবে না। এ আয়াতে যেহেতু কাফিরদের অন্তর ও কর্ণে মোহরাঙ্কিতকরণ ও দৃষ্টিতে আচ্ছাদন সৃষ্টির নিসবত সরাসরি আল্লাহর প্রতি করা হয়েছে যা নিঃসন্দেহে একটি মন্দ কাজ। তাই এটা তাদের মতবিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত হয়েছে। ফলে তারা এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিচলিত হয়ে নিজেদের মতবিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যশীল সম্ভাব্য মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। যা নিম্নে বর্ণনা করা হল–

১. কাফিররা যখন 'হক' তথা সত্য ধর্ম গ্রহণ থেকে বিরত থেকেছে এবং তা তাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। তাই তাদের দ্বীন বিমূখ হওয়াকে ফিতরী স্বভাবের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর ফিতরী স্বভাব (وصفِ خُلُقِى) (وصف ملزوم তথা وفِطرى) এর জন্য تَمَكُّن আবশ্যক। অতএব এখানে وصف ملزوم তথা وفطرى বলে لازم তথা تمكن واعراض উদ্দেশ্য। এটাকে كِناية বলা হয়।

২. কাফিরদের অন্তরসমূহকে নির্বোধ প্রাণীর অন্তরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। অথবা এমন অন্তরের সাথে তুলনা করা হয়েছে যার উপর মোহরাঙ্কিত করা হয়েছে।

৩. অন্তর ও কর্ণে মোহরাঙ্কিতকরণ এবং দৃষ্টি শক্তির উপর আচ্ছাদন সৃষ্টি মূলত কাফিরদের কাজ; কিন্তু এটা যেহেতু আল্লাহর সাহায্য সহযোগিতায় সৃষ্টি হয়েছে তাই مسبِب হিসেবে এটাকে আল্লাহর দিকে নিসবত করা হয়েছে।

৪. কাফিররা সদা-সর্বদা আল্লাহদ্রোহী ও পাপ কাজে লিপ্ত থাকার দরুন তাদের অন্তরে কুফর এমনভাবে বদ্ধমূল হয়েছিল যে, শক্তি প্রয়োগ ব্যতিত তাদেরকে কুফরীর পথ পরিহার করে ঈমান গ্রহণ করানোর কোন উপায় ছিলনা। আর আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বিধি-বিধান গ্রহণে স্বেচ্ছাধিকার দেয়ার কারণে তাদের উপর শক্তি প্রয়োগ করেননি। আল্লাহর শক্তি প্রয়োগ না করাকে ختم ও غشاوة দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

৫. কাফিরদের যখন ইসলাম গ্রহণের প্রতি আহ্বান করা হত তখন তারা উপহাস করে বলত–

قَالُوْا قُلُوْبُنَا فِىْ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَا اِلَيْهِ وَفِىْ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ

অর্থাৎ তারা (কাফেরা) বলে, আপনি যে বিষয়ের প্রতি আমাদেরকে দাওয়াত দেন, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে আবৃত, আমাদের কর্ণে রয়েছে ছিপি এবং আমাদের ও আপনার মাঝখানে রয়েছে অন্তরাল।

আল্লাহ তা'আলা তাদের এ ঔদ্ধত্বপূর্ণ বক্তব্যের জবাবে বিদ্রুপাত্মকভাবে তাদেরকে বলে দিয়েছেন যে, তোমাদের অন্তরে মোহরাঙ্কিত করা হয়েছে।

৬. কাফিরদের অন্তরে ও কর্ণে মোহরাঙ্কিত করণ ও দৃষ্টিতে অন্তরাল সৃষ্টি মূলত পরকালে করা হবে। কিন্তু অতীতকাল জ্ঞাপক ক্রিয়া দ্বারা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে নিশ্চিতরূপে সংঘটিত হবে একথা বুঝাবার জন্য। যেমন আল্লাহ পবিত্র কুরআনে অন্যত্র ইরশাদ করেছেন– وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا

৭. ختم দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তাদের অন্তরকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করণ যাতে ফেরেশতারা তাদেরকে চিনে নিয়ে তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে এবং তাদেরকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে।

غشاوة ও ختم কে এখানে রূপকার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। غِشَاوة ও ختم এর অর্থ হল কাফিরদের অন্তরে এমন এক অবস্থা সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে যা তাদেরকে কুফর ও পাপকর্ম ভালবাসতে, ঈমান ও সৎকর্ম পরিহার করতে অভ্যস্ত করে দিয়েছে। তাদের মধ্যে এ অবস্থা এজন্য সৃষ্টি করার কারণ হল তাদের আল্লাহদ্রোহীতা, অন্ধানুকরণ ও সঠিক বুদ্ধি বিবেচনা না করা। ফলে তাদের অন্তরের অবস্থা এমনরূপ ধারণ করেছে যে, তাতে সৎ কথা প্রবেশ করে না, তাদের কর্ণে সৎ শ্রবণ করতে অপ্রিয় লাগে। সুতরাং যেন তাদের অন্তর ও কর্ণে মোহরাঙ্কিত করে দেয়া হয়েছে। এবং তাদের দৃষ্টির উপর আবরণ ফেলে দেয়া হয়েছে। ফলে তা আল্লাহর নিদর্শনাবলী দেখতে পায় না। استعاره এর ভিত্তিতে এটাকেই ختم ও تغشية করে নামকরণ করা হয়েছে। অথবা তাদের রোগগ্রস্থ অন্তর ও অঙ্গগুলোকে এমন বস্তুর সাথে তুলনা করা হয়েছে। যার দ্বারা উপকৃত হওয়ার পথে ختم ও تغشية অন্তরাল হয়ে দাড়িয়েছে। পবিত্র কুরআনের এক স্থানে তাদের এ অবস্থাকে طبع দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে– أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ আবার অন্যত্র এটাকে اغفال বলা হয়েছে। যেমন এরশাদ হয়েছে– وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا আবার এক স্থানে এ অবস্থাকে اِقْسَاء বলা হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে– وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً।

সমুদয় مُمْكِنَات (সৃষ্টি জগত) পরোক্ষভাবে আল্লাহর কুদরতী শক্তিতে অস্তিত্বলাভকারী বিধায় বস্তুনিচয়ের সৃষ্টিকে আল্লাহর সাথে সম্বন্ধ করা হয়।

তেমনিভাবে কাফিরদের অন্তর ও কর্ণে মোহরাঙ্কন ও তাদের দৃষ্টির উপর আচ্ছাদন সৃষ্টিকে আল্লাহর প্রতি সম্বন্ধ করা হয়। অন্যদিকে এ মোহর ও আচ্ছাদন যেহেতু তাদের কৃতকর্মের ফল এবং তাদের কুফর ও পাপ যেহেতু এ মোহরাঙ্কন ও আচ্ছাদনের কারণ; তাই অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে– بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ

আরো এরশাদ হয়েছে– ذَالِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ

وَجْهُ ذِكْرِ الْغِشَاوَةِ لِلْاَبْصَارِ وَالْخَتْمِ لِلْقُلُوْبِ وَالسَّمْعِ : ٥

(أَبْصَار এর জন্য غِشَاوَة এবং قلوب ও سمع এর জন্য ختم শব্দ ব্যবহারের কারণ) ঃ

سمع তথা কর্ণের জন্য এবং قلوب তথা অন্তরে জন্য ختم শব্দ ব্যবহার করার কারণ হল– অন্তরের অনুধাবন এবং কর্ণের শ্রবণ কোন বিশেষ দিকের সাথে সম্পৃক্ত নয় বরং ডান-বাম অগ্র-পশ্চাৎ ঊর্ধ্ব-অধঃ উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম সব দিকের আওয়াজ বা ধ্বনি কর্ণ নির্বিঘ্নে শ্রবণ করতে পারে এবং অন্তর অবলীলায় অনুধাবন করতে পারে। তাই এ দু'টোর ক্ষমতা প্রতিরোধ করতে হলে এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যা সকল দিক থেকে আগত ধ্বনিকে রোধ করার ক্ষমতা রাখে। আর ختم দ্বারাই এটা সম্ভব। তাই এ দুটোর ক্ষেত্রে ختم শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে ابصار তথা দৃষ্টিশক্তি শুধুমাত্র সামনের দিকে আচ্ছাদন বা পর্দা দ্বারাই অকার্যকর করে দেয়া যায়। তাই এর জন্য غشاوه অর্থাৎ আচ্ছাদন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

اَلنُّكْتَةُ فِى اِيْرَادِ الْقُلُوْبِ وَالْاَبْصَارِ بِصِيْغَةِ الْجَمْعِ وَالسَّمْعِ بِصِيْغَةِ الْوَاحِدِ (ابصار ও قلوب কে বহুবচন আর سمع কে একবচন নেয়ার কারণ) ঃ

আলোচ্য আয়াতে قلوب ও ابصار কে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। আর سمع কে একবচন নেয়া হয়েছে। এর কয়েকটি কারণ হতে পারে। যথা–

১. جمع এর বিপরীতে جمع শব্দ ব্যবহার করাই মৌলিক নিয়ম। তবে যেখানে مفرد শব্দ ব্যবহার করে جمع উদ্দেশ্য করার ক্ষেত্রে التباس এর সম্ভাবনা থাকে না সেখানে مفرد ব্যবহার করাও জায়িয। এজন্যই سمع কে مفرد নেয়া হয়েছে।

২. অথবা سمع শব্দটি মূলত মাসদার আর মাসদারের মৌলিক নিয়ম হল, তা مفرد، تثنيه ও جمع সব কয়টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে قلب ও بصر শব্দদ্বয় হল اسم جامد। তাই এদুটোকে جمع ব্যবহার করা হয়েছে।

৩. অথবা سمع এর পরে مضاف উহ্য রয়েছে। যা جمع শব্দ। আর আয়াতাংশের মূলরূপ হল- عَلٰى حَوَاسِّ سَمْعِهِم

৪. অথবা سمع এর অনুভূত বস্তু একটিই মাত্র। আর তা হলো ধ্বনি। পক্ষান্তরে قلب ও بصر এর অনুভূত বস্তু একাধিক। তাই এ দুটোকে جمع ব্যবহার করা হয়েছে।

س (٣٨) : فَلَمَّا اَنْبَأَهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ

الف : تَرْجِمِ الْاٰيَةَ الْكَرِيْمَةَ

ب : اَلانسانُ اشرَفُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اَوِ الْمَلَائِكَةُ مِنَ الْاِنْسَانِ؟ اكتُبْ مع بيانِ وجهِ الشَّرَافَةِ -

ج : اِلَامَ عَرَضَ اللّٰهُ تَعالى بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ وكَيْفَ؟

د : اَوْضِحْ مَا اُرِيْدَ بِقولِهِ مَاتُبْدُوْنَ وَمَاكُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ

উত্তর ঃ الف : ترجمة الاية **(আয়াতের অনুবাদ) ঃ** তারপর তিনি (আদম) সমস্ত বস্তু-সমাগ্রীর নাম বলে দিলেন। তখন তিনি (আল্লাহ) বললেন, আমি কি তোমাদের (ফেরেশতাদের) বলেনি যে, আমি আসমান ও জমীনের যাবতীয় গোপন বিষয় সম্পর্কে খুব ভাল করেই অবগত রয়েছি এবং সেসব বিষয় ও জাতি যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন কর।

★ ب : الانسانُ اَشْرَفُ اَمِ الْمَلَائِكَةُ

মানবজাতি ও ফেরেশতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

মানবজাতিও ফেরেশতার মধ্যে মানব জাতিই শ্রেষ্ঠ। আর এ শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান কারণ হল ইলম বা জ্ঞান। তাছাড়া মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্বের আরো কারণ হল-

১. মানব সৃষ্টির ঊষালগ্নে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের মানবজাতির আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) এর সৃষ্টির সুসংবাদ দিয়েছেন।

২. পৃথিবীতে মানব জাতিকে আল্লাহ তা'আলা খলীফা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন।

৩. আদি পিতা আদম (আঃ) কে ফেরেশতাদের মাসজুদ বা সাজদার লক্ষ বস্তু বানিয়ে সম্মানিত করেছেন।

এসবগুলোর ফেরেশতাদের উপর মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে।

ج : التَّعْرِيضُ فِى الْآيَةِ وَكَيْفِيَّتُهُ

(আয়াতে বিশেষ কথার প্রতি ইঙ্গিত ও তার পদ্ধতি) ঃ

আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের লক্ষ্য করে বলেছেন–

اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّى اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

অর্থাৎ আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমি আসমান ও যমীনের যাবতীয় গোপন বিষয় সম্পর্কে খুব ভাল করেই অবগত আছি।

এর বাহ্যিক ব্যাখ্যা হল– আসমান ও যমীনে যা কিছু তোমাদের কাছে গোপন ও অজানা রয়েছে তা আমি খুব ভাল করেই জানি এবং তোমরা যা প্রকাশ কর অর্থাৎ তোমাদের বাহ্যিক বিষয়াদি এবং তোমাদের গোপন বিষয়াদি তোমাদের জানা-অজানা বিষয়াদি সম্পর্কে আমি ভালভাবেই জ্ঞাত।

আয়াতের এ বাহ্যার্থের আড়ালে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশ্‌তাদের মৃদু তিরস্কারের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আর তা এভাবে যে, আদম সৃষ্টির সুসংবাদ শুনে তোমরা কালবিলম্ব না করে এর বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন আরম্ভ করলে কেন? মানব জাতির সৃষ্টির রহস্য ও তাৎপর্য বর্ণনা করার পূর্বেই আপত্তি উত্থাপন করলে কেন? তোমরা কি দেখনি আদমকে বস্তু নিচয়ের নাম শিক্ষা দিয়ে জিজ্ঞাসা করা মাত্র বস্তু নিচয়ের নাম বলে দিলো। কিন্তু তোমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলে তোমরা তা বলতে পারলে না। এর দ্বারা আদম তথা মানব জাতি সৃষ্টির রহস্য ও তাৎপর্য তোমাদের সামনে প্রস্ফুটিত হয়েছে।

১: المرادُ بقوله تعالى مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ(مَا تُبْدُ

وْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ আয়াতের মর্মার্থ) ঃ

আল্লামা কাযী বায়যাবী (রহঃ) مَا تُبْدُوْنَ এবং وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ আয়াতাংশের তিনটি ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। আর তাহলো–

১. مَا تُبْدُوْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য হল– (الملائكة) اَحْوَالُهُمْ ما ظَهَر الظَّاهِرَةُ। অর্থাৎ ফেরেশতাদের বাহ্যিক অবস্থাদি।

আর وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য হল– (الملائكة) اَحْوَالُهُمْ الْبَاطِنَةُ অর্থাৎ ফেরেশতাদের গোপনীয় অবস্থাদি।

২. مَا تُبْدُوْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য হল– ফেরেশতাদের উক্তি اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا يَسْفِكُ الدِّمَاءَ অর্থাৎ আপনি কি এমন এক জাতি সৃষ্টি করবেন যারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত করবে।

আর وَمَاكُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য হল– ফেরেশতাদের মনে মনে নিজেদেরকে আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি হওয়ার অধিক উপযুক্ত ভাবা। যা তারা, গোপন রেখেছিল প্রকাশ করেনি।

৩. مَاتُبْدُوْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য হল– ফেরেশতারা যে বন্দেগী ও আনুগত্য প্রকাশ করেছে। আর وَمَاكُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য হল– ইবলীস শয়তান তার মনে যে অবাধ্যতা গোপন করে রেখেছিল।

س (٣٩) : قوله تعالى يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَمَايَخْدَعُوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ

الف : مَامَعْنَى الْخِدَاعِ لُغَةً وشرعًا؟

ب : كيف يُمْكِنُ خِداعُهُمْ بِاللّٰهِ حالَ كونه لايَخْفى عليه شيئٌ خَافِيَة؟

ج : ما المرادُ بالخِداعِ هٰهُنا حالَ كونِ الْمُفاعلةِ بيْنَ الْاِثْنَيْن؟

د : كم قِرَاءَةً فِى يَخْدَعُوْنَ اذكُرْمَعَ اِيْضَاحِ الْمَعْنٰى؟

ه : ما الْمُرَادُ بِالْاَنْفُسِ فِىْ قوله تَعَالٰى اِلَّا اَنْفُسَهُمْ؟

উত্তর ঃ الف : مَعْنَى الْخَدْعِ لُغَةً (خِدع **শব্দের আভিধানিক অর্থ**) ঃ

خَدَع শব্দের আভিধানিক অর্থ اَلْاِخْفَاء অর্থাৎ গোপন করা, এ কারণে আরবীতে خَزَانَة বা ধনভাণ্ডারকে الْمُخْدَع (بكسر الميم وضمها) বলা হয়। কেননা ভাণ্ডারে ধন-সম্পদ গোপন থাকে। এমনিভাবে ঘাড়ের গোপন শিরাদ্বয়কে اَخْدَعَان বলা হয়।

خَدَع শব্দটি خَدَعَ الضَّبُّ ও ضَبٌّ خَادِعٌ থেকে উৎকলিত। অর্থ প্রতারক, গুঁইসাপ। এটা এজন্য বলা হয় যে, শিকারী যখন গুঁইসাপ ধরতে আসে তখন সে গর্ত বা গাছের আড়ালে সামান্য বের হয়ে গর্তের পশ্চাৎদ্বার দিয়ে কিংবা লতা পাতার আড়াল দিয়ে অন্য দিকে কেটে পড়ে।

مَعنى الخَدعِ شرعًا (خدع **শব্দের পারিভাষিক অর্থ**) ঃ خَدع শব্দের পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা কাযী বায়যাবী (রহঃ) বলেন–الْخَدْعُ اَنْ تُوَهِّمَ غَيْرَكَ خِلَافَ مَا تُخْفِيْهِ مِنَ الْمَكْرُوْهِ لِتُزِلَّهُ عَمَّا هُوَ مِنْ صَدَدِهٖ

অর্থাৎ خدع বলা হয় অন্তরে কোন অহিত সংগোপন করে মুখে তার বিপরীত হিত প্রকাশ করা; যাতে مخاطب কে স্বীয় লক্ষ থেকে পদস্থলন করা যায়।

★ ب : كَيْفِيَّةُ خِدَاعِ الْمُنَافِقِيْنَ مَعَ اللّٰهِ **(মুনাফিকদের পক্ষে আল্লাহর সাথে প্রতারণার স্বরূপ)** ঃ অত্র আয়াতের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা বুঝা যায় যে, মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোকা দেয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ বিধায় তাকে ধোকা দেয়া কারো পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। অতএব আয়াতের ব্যাখ্যা হল–

১. يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ এর মধ্যে اللّٰه শব্দের পূর্বে مضاف উহ্য রয়েছে। মূল ইবারত হল– يُخَادِعُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ অর্থাৎ তারা আল্লাহর রাসূলের সাথে প্রতারণা করে।

২. অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর খলীফা হিসেবে তাকে ধোকা দেয়া বা তার সাথে প্রতারণা করা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়া ও আল্লাহর সাথে প্রতারণা করার নামান্তর। এ কারণে يخادعون الله বলা হয়েছে। যেমনিভাবে অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

وَمَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ـ وَاِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ

৩. অথবা মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে যে আচরণ করেছে অর্থাৎ কুফর গোপন করে ঈমান প্রকাশ করা এবং আল্লাহ তাদের সাথে যে আচরণ করেছেন অর্থাৎ মুনাফিকরা সর্বনিকৃষ্ট জাহান্নামী হওয়া সত্ত্বেও তাদের অবকাশ দেয়ার মানসে তাদের ওপর মুসলমানদের হুকুম আরোপ করেছেন। তাদের সম্পর্কে সবকিছু জানা সত্ত্বেও রাসূল ও মুমিনরা তাদের সাথে যে আচরণ করেছে এ সবকে প্রতারণাকারীদের কার্যকলাপের সাথে তুলনা করে يُخَادِعُوْنَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ প্রতারণাকারীরা যে আচরণ করে তারাও তাদের ধারণা মতে আল্লাহর সাথে সেরূপ আচরণ করে থাকে। যদিও আল্লাহকে ধোকা দেওয়া কখনো সম্ভব নয়।

ج : يخادعون শব্দটি বাবে مُفاعلة এর মাসদার। আর مفاعلة এর মধ্যে المشاركة بين الاثنين তথা দ্বিপক্ষীয় কাজ হয়ে থাকে। অথচ আল্লাহর তা'আলার পক্ষ থেকে ধোকা বা প্রতারণা হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা এর থেকে পূতঃ পবিত্র। এর জবাব হল–

১. يخادعون এখানে يخدعون এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা يخادعون এখানে يقول এর بيان বা তাফসীর হয়েছে। অথবা বলা যায় يخادعون দ্বারা يقول এর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বাবে مفاعلة থেকে আনা হয়েছে مبالغة এর জন্য। مفاعلة এর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ভাবে কাজ হওয়ার কারণে উভয় পক্ষ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে। তাই এতে مبالغه এর অর্থ পাওয়া যায়।

২. অথবা আয়াতের অর্থ হল– يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ يُجَازِىْ خِدَاعَهُمْ অর্থাৎ তারা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে, আর তিনি তাদের প্রতারণার প্রতিফল দিবেন। এ প্রেক্ষিত বিবেচনায় এখানে اَلْمُشَارَكَةُ مِنَ الْاِثْنَيْنِ হয়েছে। যেমন অন্যত্র اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُوْنَ এর জবাবে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন اللّٰه يَسْتَهْزِئُ بِهِم। এখানে আল্লাহ তাআলা তাদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেন অর্থাৎ তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের প্রতিদান দেন অর্থ উদ্দেশ্য।

د : اَلْقِرَأَتُ الْمُخْتَلِفَةُ فِىْ يَخْدَعُوْنَ (يَخْدَعُوْنَ শব্দের বিভিন্ন কিরাআত) ঃ

يَخْدَعُوْنَ শব্দের মোট ছয়টি কিরাআত রয়েছে। এর মধ্যে দু'টি مُتَوَاتِر সুপ্রচলিত। আর অবশিষ্ট চারটি شاذ বা অপ্রচলিত। متواتر দুটি হল– ১. নাফি', ইবনে কাসির, আবু আমির এ কারীত্রয়ের মতে يُخَادعون বাবে مفاعلة থেকে।

২. অন্যান্য কারীগণের মতে, يَخْدَعُوْنَ বাবে فتح يفتح থেকে।

شاذ তথা অপ্রচলিত কিরআত চতুষ্টয় হল–

১. يُخَدِّعُوْنَ বাবে تفعيل থেকে অর্থাৎ সীমাহীন প্রতারণা করা।

২. يَخَدَّعُوْنَ মূলতঃ يَخْتَدِعُوْنَ থেকে অর্থাৎ তারা ধোকা খায়।

৩. يُخْدَعُوْنَ বাবে فتح يفتح থেকে مجهول এর সীগা অর্থাৎ তারা প্রতারিত হয়।

৪. يُخَادِعون বাবে مفاعلة থেকে مجهول এর সীগা অর্থাৎ তারা অন্তরে প্রতারিত হয়।

د : مَامَعْنَى النَّفْسِ وَفِىْ اَىِّ مَعْنًى اُسْتُعْمِلَتْ هٰهُنَا ؟

ه : مَعْنَى النَّفْسِ (نفس শব্দের অর্থ) ঃ نفس শব্দটি একবচন, এর বহুবচন نفاس ও نفوس ـ نفس এর পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) লিখেন– النفسُ ذَاتُ الشَّئِ وَحَقِيْقَتُهُ

অর্থাৎ কোন বস্তুর জাতিসত্তা ও মূলসত্তাকে نفس বলে। نفس দ্বারা এখানে روح তথা মানবাত্মা উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা জীবিত মানুষের সত্তা ও অস্তিত্ব نفس এর মাধ্যমেই টিকে থাকে। অতএব نفس হল مسبب – আর روح হল سبب। রূপকভাবে مسبب বলে سبب উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এছাড়া نفس শব্দটি রূপকভাবে আরো অনেক অর্থের জন্য ব্যবহার করা হয়। যেমন–

১. القلب (অন্তর) কেননা অন্তর হল রূহের মহল বা আবাসস্থল বা অন্তর হল প্রাণের মাধ্যম জীবনের উৎস।

২. اَلدَّمُ (রক্ত) কেননা প্রাণের স্থীতি ও জীবনের অস্তিত্ব রক্তের মাধ্যমে টিকে থাকে।

৩. اَلمَاء (পানি) প্রাণের অস্তিত্ব ও জীবন রক্ষার জন্য পানির তীব্র প্রয়োজন বিধায় পানিকে نفس বলে।

৪. اَلرَّاى (অভিমত) যেমন বলা হয় فُلَانٌ يُوَامِرُ نَفْسَهُ অর্থাৎ সে আপন মতের সাথে পরামর্শ করে।

اَلمرادُ بِالْاَنْفُسِ (আয়াতে أَنْفُسْ দ্বারা উদ্দেশ্য) ঃ অত্র আয়াতে انفس দ্বারা কি উদ্দেশ্য তার ব্যাখ্যায় আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) বলেন–

১. أنفس দ্বারা ذَوات বা তাদের ব্যক্তিসত্তা উদ্দেশ্য।

২. انفس দ্বারা ارواح বা তাদের আত্মা উদ্দেশ্য।

৩. أنفس দ্বারা اراء বা তাদের অভিমত উদ্দেশ্য।

س (٤٠) : وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ قَالُوْا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّاتَشْعُرُوْنَ

الف : تَرْجِمِ الْاٰيَةَ الْكَرِيْمَةَ

ب : اوضحْ مَعنَى الفَسَادِ وَالصَّلَاحِ اِيْضَاحًا تَامًّا

ج : مَنِ المُرادُ بِكَلِمَةِ "هُمْ" فى قوله لَهُمْ وَاكْتُبْ اَنْوَاعَ فَسادِهِم مفصَّلا؟

د : بيِّن مَنِ الْقَائِلُ فِى "قِيْلَ"

ه : لِمَ قال اللّٰهُ تعالى هٰهُنا لَا يَشْعُرُوْنَ وفيما يَأْتِى لَا يَعْلَمُوْنَ؟

উত্তর ঃ الف : ترجمة الاية الكريمة (আয়াতে কারীমার অনুবাদ) ঃ তাদেরকে যখন বলা হয়, পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করনা; তারা বলে, আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী। খবরদার! এরাই অশান্তি সৃষ্টিকারী; কিন্তু এরা বুঝতে পারে না।

ب : معنَى اَلْفَسادِ والصَّلاحِ (فساد ও صلاح এর অর্থ) ঃ

فساد শব্দটি বাবে نصر ينصر ও ضرب يضرب এর মাসদার। অর্থ خُرُوْجُ الشَّيْئِ مِنَ الْاعْتِدَالِ কোন বস্তুর স্বাভাবিক ভারসাম্য বিগড়ে যাওয়া। অশান্তি বা বিপর্য সৃষ্টি হওয়া। আর صلاح শব্দটি বাবে نصر ينصر ও كرم يكرم এর

মাসদার। অর্থ সংশোধিত হওয়া, সুগঠিত হওয়া, শান্তিময় হওয়া। মুনাফিকদের পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির অর্থ হল– মুসলমানদের ধোকা দেওয়া, মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য সহযোগিতা করা, কাফিরদের কাছে মুসলমানদের গোপন তথ্যাবলী সরবরাহ করার মাধ্যমে পরস্পরের যুদ্ধ বিগ্রহ সৃষ্টি করা। যা পৃথিবীবাসী মানব, প্রাণীকুল ও ফল-ফসলাদি বিনষ্টের কারণ। এর দ্বারা একদিকে যেমনিভাবে পাপাচার বৃদ্ধি পায় অপর দিকে তেমনিভাবে দ্বীনের প্রতি কটাক্ষ প্রমাণিত হয়। আর দ্বীন ও শরীয়তের ব্যাপারে গড়িমসি অলসতা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং বিশ্ব প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম ব্যহত হয়।

ج : اَلْمُرَادُ بِكَلِمَةِ "هُمْ" فِى قَوْلِهِ لَهُمْ (আল্লাহর বাণী لهم এর মধ্যে هُمْ দ্বারা উদ্দেশ্য) ঃ هم যমীর দ্বারা মুনাফিকরা উদ্দেশ্য। وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ এ আয়াত দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়। এ আয়াতের من শব্দটি مفرد হলেও جمع এর অর্থ প্রদান করেছে।

انواعُ الْفَسَادِ (**অশান্তির বিভিন্ন স্বরূপ**) ঃ

১. মুসলমানদের ধোকা দিয়ে এবং কাফিরদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহযোগিতা করে তাদের যুদ্ধের জন্য প্ররোচিত করা। যার দ্বারা পৃথিবী অশান্ত হয়। এজন্য বলা হয়েছে وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে।

২. মুসলমানদের গোপন তথ্যাবলী কাফিরদের কাছে সরবরাহ করে যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করা, যার দ্বারা পৃথিবীবাসী মানব, প্রাণীকুল ও ফল-ফসলাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৩. পাপকর্ম ছড়িয়ে দিয়ে অশান্তি সৃষ্টি করা।

৪. দ্বীনের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিলতা প্রদর্শন করে দ্বীনের ক্ষতি সাধন করা। যার দ্বারা আল্লাহর আযাব অবধারিত হয়। ফলশ্রুতিতে বিশ্ববাসী ক্ষতিগ্রস্থ হয়। মুনাফিকরা এর কারণ হওয়ায় এর সম্বন্ধ তাদের সাথে করা হয়েছে।

د : اَلْقَائِلُ فِى "قِيْلَ" (قِيْلَ এর قَائِل তথা কথক) ঃ

قِيْلَ এর قَائِل বা কথক বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) তিনটি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। যথা–

১. اللّٰه। অর্থাৎ قيل এর কথক হল স্বয়ং আল্লাহ তাআলা।

২. الرَّسُوْل। অর্থাৎ قيل এর কথক হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

৩. بعضُ الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ কতিপয় মুসলমান।

وجهُ اِخْتِيَارِ لَايَشْعُرُوْن هٰهُنَاوفِيْمَا يَاْتِى لَايَعْلَمُوْن : ০ (অত্র আয়াতের لَايَشْعُرُون পরবর্তী আয়াত لايعلمون নির্বাচন করার কারণ) ঃ

অত্র আয়াতে মুনাফিক সম্প্রদায়ের পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির বিবরণ দেয়া হয়েছে। আর পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করা, শৃংখলা বিনষ্ট করা, সমাজকে অশান্ত করা এমন স্থূল বিষয় যা স্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন যে কেউ অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারে। এজন্য এখানে لَايَشْعُرُون শব্দ নির্বাচন করা হয়েছে। আর لايشعرون অর্থ তারা বুঝতে পারে না। অনুভব করতে পারে না। অর্থাৎ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করা এমন একটি সুস্পষ্ট ও স্থুল বিষয় যদি তাদের অনুভূতি শক্তি নিখুঁত হত তাহলে তারা এটা অনুভব করতে পারত। অতএব বুঝা গেল তাদের অনুভূতি শক্তি, বিবেক-বুদ্ধি সুস্থ নয়।

পক্ষান্তরে পরবর্তী আয়াতে তাদের নির্বোধ ও বুদ্ধিহীনতার কথা বলা হয়েছে। এটা এমন একটা বিষয় যা গভীর চিন্তা-ভাবনা ছাড়া যা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এ জন্য সেখানে لايعلمون শব্দ নির্বাচন করা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি নেই। কেননা জ্ঞান বুদ্ধি থাকলে তারা তাদের কুকৃতীর জন্য নিজেদেরকে নির্বোধ মনে করত।

س (٤١) : اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدٰى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِيْن ـ

الف : كم معنىً لِلْاِشْتِرَاءِ ومَاهِىَ و اىُّ مَعْنًى اُرِيْدَ هٰهُنَا؟ حرّر مفصَّلاً مُمَثَّلا

ب : شعر ـ وَلَمَّارَأَيْتُ النَّسْرَ عَزَّ ابْنَ دَايَةٍ

وَعَشَّشَ فِىْ وَكْرَيْهِ جَاشَ لَهُ صَدْرِىْ ـ

ترجِم الشِعْر ثم بَيِّن غَرْضَ الْمُصَنِّفِ العَلَّامِ لِاِيْرَادِ هٰذا الشِّعْرِ

ج : كَيفَ اُسْنِدَ الرِّبْحُ اِلَى التِّجَارَةِ مَعَ انّه لَا رَبَاحَ لَهَا ـ

উত্তর ঃ الف : المَعَانِى الْمُتَعَدِّدَةُ لِلْاِشْتِرَاءِ (اِشْتَرَاء এর অর্থসমূহ) ঃ

আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) اِشْتِرَاء এর দুটি ভাবার্থ, আভিধানিক মূল অর্থও অবশেষে দু'টি রূপক অর্থ বর্ণনা করেছেন–

اشتراء এর ভাবার্থ দু'টি হল– ১. الاختيار। নির্বাচন করা, বেছে নেয়া, ২. الاستبدال। বিনিময়ে নেয়া, পরিবর্তে নেয়া।

আর اِشْتِرَاء এর মূল অর্থ হল, بَذْلُ الثَّمَنِ لِتَحْصِيلِ ما يُطْلَبُ مِنَ الْاَعْيَانِ অর্থাৎ বস্তু-সামগ্রী লাভ করার জন্যে অর্থ ব্যয় করা।

আর الاشتراء এর রূপক অর্থ হল– ১. اَلْاَعْرَاضُ عَمَّا فِى يَدِه تَحْصِيْلاً بِه غَيْرَه سواءٌ كَانَ مِنَ الْمَعَانِى اَوِ الْاَعْيَان অর্থাৎ স্বীয় মালিকানাধীন বস্তু থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে এর বিনিময়ে স্থাবর বা অস্থাবর অন্য কোন সম্পদ অর্জন করা। যেমন– কবি বলেছেন–

اَخَذْتُ بِالْجُمَّةِ رَأْسًا اَزْعَرا ـ وَبِالثَّنَايَا الْوَاضِحَاتِ الدُّرْدُرا
وَبِالطَّوِيْلِ الْعُمْرِعُمْرًا جَيْدَرا ـ كَمَا اشْتَرَى الْمُسْلِمُ اذا تَنَصَّرا

অর্থঃ তুমি চূর্ণ কুণ্ডলের বিনিময়ে কেশবিহীন মস্তক পছন্দ করেছ এবং উজ্জল দন্তরাজীর বিনিময়ে দন্তবিহীন মাড়ি বেছে নিয়েছ। সুদীর্ঘ জীবনের বিনিময়ে সংক্ষেপ জীবন নির্বাচন করেছ যেমনিভাবে মুসলিম ব্যক্তির অর্জন হয়েছে যখন সে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে।

এখানে اِشْتَرٰى শব্দটি পূর্বোক্ত রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২. অতঃপর اِشْتَرٰى শব্দটির অর্থে আরো ব্যাপকতা আনয়ন করা হয়েছে। আর তা হল اَلرَّغْبَةُ عَنِ الشَّيْئِ طَمَعًا فِى غَيْرِه অর্থাৎ এক জিনিসের আকাংখা করে অন্য বস্তু থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া। বস্তু নিজের হাতে থাকুক বা না থাকুক।

অত্র আয়াতে اِشْتَرٰى দ্বারা পূর্বোক্ত ভাবার্থদ্বয় উদ্দেশ্য। আয়াতের অর্থ ১. তারা فِطْرَتِ سَلِيْمَه তথা সুস্থ ও পরিশুদ্ধ বিবেক-বুদ্ধিকে অসুস্থ বানিয়ে নিয়েছে। অর্থাৎ স্বভাবগত হিদায়েতকে গোমরাহীতে পরিণত করেছে। ২. তারা হিদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহীকে বেছে নিয়েছে এবং প্রিয় বানিয়ে নিয়েছে।

وَلَمَّا رَأَيْتُ النَّسْرَ عَزَّ ابْنَ دَايَةٍ وَعَشَّشَ فِى وَكْرَيْهِ جَاشَ لَهُ صَدْرِىْ

★ ب : تَرْجَمَةُ الشِّعْرِ (শে'রের তরজমা) ঃ

যখন দেখলাম শকুন কাকের উপর বিজয়ী হল এবং তার (গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন) উভয় বাসাকে শকুন দখল করে বসবাস আরম্ভ করল। এর কারণে আমার হৃদয় মন শোক সন্তপ্ত হল।

الْمُرَادُ بِاِيْرَادِ هٰذَا الشِّعْرِ **(এ শে'র উল্লেখ করার দ্বারা উদ্দেশ্য) ঃ**

আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ এর মধ্যে اِسْتِعَارَهْ تَرْشِيح এর উভয় প্রকার হয়েছে এর উদাহরণ স্বরূপ উপরোক্ত শের উল্লেখ করেছেন। اِشْتَرَوْا

اِسْتِبْدَالُ الضَّلَالَةِ بِالْهُدٰى আয়াতে মুনাফিকদের الضَّلَالَةَ بِالْهُدٰى অথবা اِخْتِيَارُ الضَّلَالَةِ عَلَى الْهُدٰى এর জন্য استعارة হিসেবে اِشْتَرَوْا শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। অতঃপর مُشَبَّه بِه এর উপযোগী ও সামঞ্জস্যশীল ربح এবং تِجَارَت শব্দ এ বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে اشترى এরপর ربح ও تجارة শব্দদ্বয় প্রয়োগ করাটা ترشيح এর অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

যেমনিভাবে অত্র শে'রের মধ্যে বার্ধক্যকে শুভ্র শকুনের সাথে এবং যৌবনকালকে কালো কাকের সাথে তুলনা করা হয়েছে। অতঃপর শকুনের সাথে تعشيش তথা বাসাবাধা শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে যা শকুনের সাথে সামস্যশীল। এতে تَرْشِيح হয়েছে এবং اِبْن دَايَه এর সাথে وَكْرَيْهِ (অর্থ উভয় বাসা) শব্দ প্রয়োগ করার মধ্যে ترشيح রয়েছে। কেননা কথিত আছে কাক শীত ও গ্রীষ্ম উভয়কালে পৃথক পৃথক বাসা বাঁধে।

কবিতার মর্মার্থ ঃ যখন দেখলাম আমার বার্ধক্য আমার যৌবনের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে এবং মাথার কেশরাজি ও দাড়ির উপর বার্ধক্যের চিহ্ন প্রস্ফুটিত হয়ে চুল সাদা হয়েছে; এতে আমার অন্তর পেরেশান হয়ে গেল।

ج : اِسْنَادُ الرِّبْحِ الى التِّجَارَةِ **(লাভকে ব্যবসার সাথে সম্বন্ধকরণ) ঃ**

طَلَبُ الرِّبْحِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ, তথা ব্যবসা বলা হয়, (তিজারত) تِجَارَة অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করাকে তিজারত বলে। আল্লামা কাযী বায়যাবী (রহঃ) প্রদত্ত তিজারতের উপরোক্ত সংজ্ঞাকে তার تَسَامُح শৈথল্যগত বিচ্যুতি আখ্যায়িত করে টিকাকার বলেন, ইমাম রাগিব ইস্পাহানীর (রহঃ) মতে, তিজারত হল– التَّصَرُّف فِى رَاسِ الْمَالِ طَلَبًا لِلرِّبْحِ অর্থাৎ মুনাফা অর্জনের লক্ষে মূলধনে হস্তক্ষেপ করা। আমরা মনে করি মর্মার্থে সমশরীকানা বিধায় আল্লামা বায়যাবীর প্রতি تَسَامُح এর নিসাবত অনুচিত। কারণ, ব্যবসা-কারবার বা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী লাভবান হয়। তিজারত বা ব্যবসার সাথে মুনাফা ও লাভের কোন সম্বন্ধ হয় না। তথাপি অত্র আয়াতে মুনাফা ও লাভকে তিজারত বা ব্যবসার সাথে রূপকার্থে সম্বন্ধ করা হয়েছে। কেননা ব্যবসা লাভ-লোকসানের কারণ হওয়ার দিক দিয়ে ব্যবসায়ীর সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। মুনাফা বা লাভের কারণ যেরূপ ব্যবসায়ী তদ্রূপ ব্যবসাও। অথবা عَلَاقَه غَيْر مُشَابِهَت এর সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা ব্যবসায়ীর সাথে ব্যবসার ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে।

س (٤٢) : يَا ايُّها النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

الف : فَسِّرِ الْآيةَ -

ب : بَيِّن وجهَ رَبْطِها بماقَبْلَها

ج : مَا هوَ الفائدةُ فِى إِسْتِعمالِ النِّداء القَرِيبِ معَ انَّهُ موضوعٌ لِنِداءِ الْبَعِيد؟

د : لِما زِيْدَ اَيُّها بَيْنَ النِّدا وَالمُنادٰى ولِمَ كَثُرَ النِّداءُ بِهٰذه الطرِيْقةِ فِى الْقُرانِ الكريم؟

ه : مَنْ هُم المرادُ بالناسِ الموجودِ وقتَ النُّزولِ فقط اَمْ هُمْ معَ مَنْ سَيُوْجَدُ؟

و : هَل هٰذا الخِطابُ والامرُ لِلعِبادة مخصوصٌ بِا للكُفّارِ فقط أمْ لِجميعِ الناسِ مؤمِنا كانَ اوْ كافرًا؟

উত্তর ঃ الف : ب : مُنَاسَبَة الأية بِماقبلها **(পূর্বের আয়াতের সাথে অত্র আয়াতের সম্পর্ক) ঃ**

পূর্ববর্তী আয়াতে মানব জাতির তিনটি দলের অবস্থা এবং তাদের পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমে মুমিন অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসীদের পরিচয়, তাদের শুভ পরিণতি, অতঃপর কাফির তথা আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসীদের সর্বনাশা কর্ম-কীর্তির অবস্থা এবং তাদের শোচনীয় পরিণামের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। অবশেষে যারা প্রকাশ্যে ঈমানের কথা প্রকাশ করে অথচ অন্তরে অবিশ্বাস পোষণ করে তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করে এক আল্লাহ্ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করার এবং বন্দেগী করার আহ্বান জানানো হয়েছে। মানবতার চরম অধঃপতন, পৌত্তলিকতা ও নাস্তিকতা থেকে আত্মরক্ষা এবং শান্তি লাভের তাগিদ করা হয়েছে এই আয়াতে।

বক্ষমান আয়াতে শ্রোতামণ্ডলীকে মনোযোগী করার জন্য إلْتِفات এর পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের বন্দেগী কর। যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার। لَعلّكُمْ تَتَّقُوْنَ বাক্যটি اعبدوا এর যমীর থেকে حال হয়েছে। যার অর্থ হল, তোমরা ইবাদত কর এমতাবস্থায় যে তোমরা মুত্তাকীদের অন্তর্গত হতে পার।

কেউ কেউ لعلكم تتقون কে خلقكم এর علت আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু কাযী আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) বলেন, এ মতটি গ্রহণযোগ্য নয়। এমতাবস্থায় অর্থ হবে যিনি তোমাদেরকে মুত্তাকী হওয়ার জন্য সৃষ্টি করেছেন। যেমনিভাবে অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে– وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ

★ ج : اَلْفَائِدَةُ فِى النِّدَاءِ بِيَا (ইয়া হরফে নেদা প্রয়োগ করার যথার্থতা) ঃ

আমরা জানি যে, يا হরফে নেদা بعيد তথা দূরবর্তী আহূতকে আহ্বান করার জন্য। কিন্তু الناس তথা মানব মণ্ডলী নিকটতম হওয়া সত্ত্বেও يا দ্বারা আহ্বান করা হল কেন? এর জবাব হল– কখনো কখনো নিকটতমকে দূরবর্তী মনে করা হয়। এর কয়েকটি কারণ রয়েছে। ১. আহূত ব্যক্তি উচ্চ মর্যাদাশীল হওয়ার কারণে। অতি নিকটে থাকলেও তাকে দূরবর্তী হরফে নেদা দ্বারা আহ্বান করা হয়।

২. আহূত ব্যক্তি বক্তার বক্তব্যের প্রতি অমনোযোগী হলে।

৩. আহূত ব্যক্তিতে বক্তব্যের মাধ্যমে উৎসাহিত করার জন্য। এখানে মানব জাতিকে আয়াতের বিধানের প্রতি গুরুত্ব প্রদান এর প্রতি যত্নশীল ও সচেতন করার জন্য يا হরফে নেদা দ্বারা আহ্বান করা হয়েছে।

د : وَجْهُ زِيَادَةِ اَيُّهَا عَلَى الْمُنَادٰى (মুনাফার উপর ايها বৃদ্ধির কারণ) ঃ

অত্র আয়াতে এবং পবিত্র কুরআনের বহু স্থানে মুনাদার পূর্বে ايها যোগ করা হয়েছে। এর কারণ হল এই যে, যদি মুনাদা معرف باللام হয় তাহলে তার শুরুতে হরফে নেদা আনা যায় না। কেননা এতে মারিফার দুইটি কারণ একত্রকরণ আবশ্যক হয় যা দোষণীয়। এজন্য পরস্পরের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টির জন্য মাঝে يها অতিরিক্ত করা হয়। তাতে معرف باللام এর উপর হরফে নেদা আনা শুদ্ধ হয়, এমতাবস্থায় اى শব্দটি منارفى এর صفت হিসাবে মুনাদার اعراب গ্রহণ করবে। আর هاالتنبيه তাকিদের জন্য বাড়ানো হয়েছে।

★ د : وَجْهُ كَثْرَةِ النِّدَاءِ بِهٰذِهِ الطَّرِيْقَةِ فِى الْقُرانِ (اى যোগে يا হরফে নেদদা ব্রবহারের কারণ) ঃ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা অধিকাংশ স্থানে يا হরফের সাথে ايها যুক্ত করে আপন বান্দাদের আহ্বান করেছেন। আহ্বানের ক্ষেত্রে এ অভিনব পদ্ধতি অবলম্বনের কারণ হল– আল্লাহর যে বিধানের প্রতি তিনি স্বীয় বান্দাদের আহ্বান করেছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও আযীমুশ্বান। যার জন্য তাকিদ আবশ্যক। যাতে বান্দা আপন হৃদয় মন দিয়ে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করে এবং উক্ত বিধানকে সর্বান্তকরণে মেনে নেয়। মানবজাতির বৃহদাংশ এর থেকে অচেতন বিধায় এর প্রতি তাকিদ দেয়া আবশ্যক ছিল। আর ياايها এর ভেতর স্বতন্ত্রভাবে বহুবিদ তাকিদ বিদ্যমান রয়েছে। তাই এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে।

ه : المِصْدَاقُ بِالنَّاسِ (الناس দ্বারা উদ্দেশ্য) ঃ

النَّاس শব্দটি اسم جمع معرف باللام হওয়ার কারণে শব্দগতভাবে কুরআন অবতরণকালীন বিদ্যমান সকল মানবকে শামিল করেছে এবং কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অনাগত সকল মানবগোষ্ঠীকে শামিল করেছে। কেননা শরীয়তে মুহাম্মদীতে মুতাওয়াতির ভাবে প্রমাণিত যে, দ্বীনি সকল বিধি-বিধান ও সম্বোধন উপরোক্ত উভয় শ্রেণীর লোকের উদ্দেশ্য করা হয়েছে এবং কিয়ামত অবধি অনাগত সকল মানবগোষ্ঠি উদ্দেশ্য।

و : المرادُ بالخطاب (সম্বোধন দ্বারা উদ্দেশ্য) ঃ কুরআনে বর্ণিত يا ايها الناس দ্বারা মুমিন কাফির নির্বিশেষে সকল মানবজাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে। এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তাহল এই যে, কাফিররা ইবাদতের অনুপযুক্ত হওয়ার কারণে তাদেরকে ইবাদতের নির্দেশ দেয়া অসম্ভব।

অনুরূপভাবে মু'মিনরা ইবাদতে মশগুল থাকার কারণে তাদেরকেও ইবাদতের আদেশ করা অবান্তর।

এর জবাব হল, এখানে ইবাদত শব্দটি مشترك তথা বহু অর্থ বিশিষ্ট। অর্থাৎ কাফিরদের ক্ষেত্রে আল্লাহর পরিচয় এবং আল্লাহর প্রভূত্বে বিশ্বাস থেকে যে ইবাদত আরম্ভ হয় তা মোটকথা কাফিরদেরকে ঈমানের হুকুম আর মু'মিনের ক্ষেত্রে ইবাদত বৃদ্ধিকরণ ও অধ্যবসায়ের সাথে ইবাদত করার হুকুম উদ্দেশ্য।

س (٤٣) : وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ

الف: بَيِّنْ إِرْتِبَاطَ الْآيَةِ بِمَا قَبْلَهَا وكيف احْتَجَّ عَلَى نُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم بهذه الاية الكريمة؟

ب : لِمَ قال نَزَّلْنَا ولَمْ يَقُل أَنْزَلْنَا ؟

ج : ما معنى السُّورة لُغَةً و اصطلاحًا وعلى ما اسْتَشْهَدَ الْمُفَسِّر العلّام بِقولِ الشَّاعر؟

وَلِرَهْطِ حِرَابٌ وقَدْ سُوْرَةٌ فِي الْمَجْدِ لَيسَ غَرابُهَا بِمُطَارٍ

د : مَا الحِكمةُ فى تقطيع القران سُوَرًا ؟

উত্তর ঃ الف : ارتباط الاية بما قبلها (আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক) ঃ

বক্ষমান আয়াতের সাথে পূর্বোক্ত আয়াতের সম্পর্ক হল– পূর্বোক্ত আয়াত اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً আয়াতটিতে তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আর অত্র আয়াতে তাওহীদের বাণী

বাহক ও উহার প্রমাণ্য গ্রন্থ পবিত্র কুরআনের ব্যাপারে সংশয়কারীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ করে রাসূল (সাঃ)-এর রিসালাতকে সুদৃঢ় করা হয়েছে। বলার অবকাশ রাখে না যে, তাওহীদ ও রিসালাত একটি অপরটির পরিপূরক। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটিকে কল্পনা করা যায় না। সুতরাং তাওহীদ ও রিসালাতের পরস্পর সম্পৃক্ততা প্রমাণিত হওয়ার মাধ্যমে অত্র আয়াতের সাথে পূর্বোক্ত আয়াতের সুসম্পর্ক সুস্পষ্ট হয়।

اِحْتِجَاجٌ عَلَى نُبُوَّةِ محمد صلى الله عليه وسم بِهٰذِه الآيةِ (অত্র আয়াত দ্বারা মুহাম্মদ (সাঃ) এর রিসালাত প্রমাণ) ঃ

আরবের কাফির মুশরিকরা বলত যে, কুরআন আল্লাহর প্রেরিত কিতাব নয়; বরং মুহাম্মদের স্বরচিত কাব্যগ্রন্থ। বক্ষমান আয়াতে তাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন। আমার প্রিয় বান্দা মুহাম্মদের প্রতি যে বাণী আমি অবতীর্ণ করেছি তা আমার প্রেরীত কি না সে সম্পর্কে যদি তোমাদের কোনরূপ সন্দেহ-সংশয় দ্বিধা-দ্বন্দ থাকে তাহলে উহার যেকোন ক্ষুদ্রতম সূরার অনুরূপ জ্ঞান গর্ভ অলংকার সমৃদ্ধ সৌন্দর্যমণ্ডিত একটি সূরা রচনা করে আন। এ কাজে সহযোগিতা করার জন্য আল্লাহ ব্যতিত সকল মানব ও জিনকে তোমাদের সাহায্যকারী হিসেবে আহ্বান কর। তারপর তোমাদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় এর ক্ষুদ্রতম একটি সূরা রচনা করে তোমাদের দাবীর সত্যতা প্রমাণ কর। উল্লেখ্য যে, কুরআনের এ চিরন্তন চ্যালেঞ্জ কেউ গ্রহণ করেনি। বরং সবাই ব্যর্থ হয়ে মাথানত করে দিয়েছে। এর দ্বারা কুরআন আল্লাহ প্রেরিত মহাসত্য গ্রন্থ একথা প্রমাণিত হয়েছে। আর কুরআনের অলৌকিকতা ও সত্যতা প্রমাণের মাধ্যমে যার উপর এ মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে তার সত্যতা সুপ্রমাণিত হয়েছে। এ ভাবেই মুহাম্মদ (সাঃ) এর নবুওয়াত ও রিসালাত প্রমাণিত হয়েছে।

★ ب : وجهُ قوله نَزَّلْنَا (نَزَّلْنَا বলার কারণ) ঃ

انزل অর্থ এক সাথে অবতীর্ণ হল। আর نزل অর্থ খণ্ড খণ্ডভাবে ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হল। পবিত্র কুরআন "লাওহে মাহফূয" থেকে সমুদয় একসাথে প্রথম আসমানে অবতীর্ণ হয়েছে সে হিসেবে কুরআনের জন্য اِنزال শব্দ প্রয়োগ করা হয়। আর মুহাম্মদ (সাঃ) এর নবুওয়াত লাভের পর থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত স্থানকাল, পরিবেশ পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজন অনুসারে সুদীর্ঘ তেইশ বছর পর্যন্ত ধীরে ধীরে খন্ড খণ্ডভাবে অবতীর্ণ হয়েছে বিধায় نزل শব্দও প্রয়োগ করা হয়। কুরআনের انزال তথা লওহে মাহফূয থেকে প্রথম আসমানে অবতরণ দ্বারা মানবজাতির জন্য কোন কল্যাণকর কিছু ছিল না, পক্ষান্তরে কুরআনের تنزيل তথা প্রথম আসমান থেকে দুনিয়াতে ধীরে ধীরে অবতরণ মানুষের জন্য কল্যাণকর ও হিতকর হয়েছে বিধায় বক্ষমান আয়াতে اَنْزَلْنَا না বলে نَزَّلْنَا বলা হয়েছে।

★ ج : معنى السُّورة لغة (**সূরা শব্দের আভিধানিক অর্থ**) ঃ

سورة শব্দের واو বর্ণটির ব্যাপারে দু'টি অভিমত রয়েছে। ১. اصلى (আসল), ২. تبديلٌ مّن سوْرة الهمزة - واو বর্ণটি যদি আসল হয় তাহলে দুটি মত রয়েছে–

ক. سورة শব্দটি سورةُ المَدِيْنه (নগর প্রাচীর) থেকে উৎকলিত। সূরা ও তার উল্লেখিত আভিধানিক অর্থের মধ্যে সম্পর্ক বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) বলেন– لِاَنَّها مُحِيْطةٌ بِطائِفةٍ مِّنَ الْقرانِ الكرِيم كَاِحَاطَةِ سُورةِ المَدينةِ على مَا فِيْها অর্থাৎ যেহেতু সূরাসমূহ কুরআনের বিভিন্ন বিষয়াবলী ও জ্ঞানকে নগর প্রাচীরের মত বেষ্টন করে রেখেছে, তাই একে সূরা করে নামকরণ করা হয়েছে।

খ. অথবা, سورة এর অর্থ رُتْبة (মর্যাদা) থেকে উৎকলিত। যেহেতু সূরাসমূহ কুরআনের মর্যাদার বাহক, তাই একে সূরা নামকরণ করা হয়েছে।

★ سورة শব্দের واو বর্ণটি যদি همزة থেকে পরিবর্তিত হয় তাহলে এর আভিধানিক অর্থ হবে القطعة من الشيى কোন বস্তুর অংশ বিশেষ। সূরাসমূহ যেহেতু পবিত্র কুরআনের অংশ বিশেষ। তাই একে সূরা নামকরণ করা হয়েছে।

معنى السورة اصطلاحا (**সূরার পারিভাষিক অর্থ**) ঃ

السورة : هِىَ طائفةٌ مّن القرانِ مستقِلّة الْمعانِى مُشْتَمِلةٌ علىٰ اٰيةٍ اقلُّها ثَلاثٌ

অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের ঐ পরিপূর্ণ মর্মবাহক ও সম্পূর্ণ সতন্ত্র অংশ যা কমপক্ষে তিন আয়াত সম্পন্ন হয় তাকে সূরা বলে।

استشهادُ المُصنِّف بقَول الشّاعِر (**কবির উক্তি দ্বারা দলিল**) ঃ

আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) সূরা শব্দটি رتبه তথা মর্যাদা অর্থে ব্যবহৃত এর প্রমাণ স্বরূপ ولِرَهْطِ حِرابٌ وقد سورة শে'রটি উল্লেখ করেছেন। অত্র শে'রের মধ্যে سورة শব্দটি মর্যাদার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শে'রের মধ্যে حراب ও قد শব্দদ্বয় দুজনের নাম। مُطار শব্দটি বাবে افعال থেকে اسم مفعول এর সীগা। শে'রের অর্থ হল– হিরাব ও কদের সম্প্রদায়ের বংশীয় কৌলিন্যে এমন উচ্চ মর্যাদা রয়েছে যেখানে কাকের উড্ডয়ন ক্ষমতা নেই।

★ د : الحكمة فى تقطيع القران (কুরআনকে সূরা ভিত্তিক বিভক্ত করার কারণ) ঃ

পবিত্র কুরআনকে সূরা ভিত্তিক বিভক্ত করার কতগুলো কারণ রয়েছে। যেমন–

১. إفرادُ لِّلأنواع অর্থাৎ একই বিষয়ের অনেকগুলো ইলমকে পৃথক পৃথক বর্ণনা করা।

২. تلاحُقُ الأشكال অর্থাৎ পরস্পর সামঞ্জস্যশীল জ্ঞান-ভাণ্ডারকে একত্রকরণ।

৩. تجاوُبُ النّظم অর্থাৎ ইবারতের ছন্দ ও উচ্চারণ ভঙ্গিতে সামঞ্জশ্য বজায় রাখা।

৪. تَنْشِيطٌ لِلْقارِى পাঠককে উৎসাহিত করণ।

৫. تَسْهِيلُ الحِفْظِ والترغيبُ فِيْه মুখস্থ করতে সুবিধা ও সাবলিলতা আনায়ন করা এবং এতে উৎসাহ প্রদান।

س (٤٤) : قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَإنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّ بُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

الف : اذكر سَبَبَ النُّزولِ لِهٰذه الاية

ب : كَمْ لُغةً فِى جِبْرِيل وما هى؟

ج : ماهو مرجعُ الضّميْرَيْنِ فِى قوله فَإنّه نَزَّلَه وكيف هوَ؟

د : كيف قِيْل على قَلْبِك وكانَ حقُّه على قَلْبِىْ؟

ه : قوله تعالى مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيل يَدُلّ على معنى الشرطِ فما جوابُه؟ اكتب مُوْضِحًا -

উত্তর ঃ الف : سببُ نزولِ الأية (আয়াতের শানে নুযূল) ঃ

অত্র আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে ইমাম বায়যাবী (রহঃ) দুটি অভিমত উল্লেখ করেছেন।

১. আয়াতটি ইয়াহুদী পণ্ডিত আব্দুল্লাহ ইবনে সূরিয়া সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

বর্ণিত আছে যে, তৎকালীন শীর্ষস্থানীয় ইয়াহুদী পণ্ডিত আব্দুল্লাহ ইবনে সূরিয়া প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে সদল বলে হাজির হয়ে প্রশ্ন করেন আপনার কাছে কোন ফেরেশতা ওহী বহন করে নিয়ে আসে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, হযরত জিব্রাঈল আমীন (আঃ)। একথা শুনে আব্দুল্লাহ ইবনে সূরিয়া বলেন, জিব্রাঈল আমাদের চিরশত্রু। বহুবার সে আমাদের সাথে শত্রুতা করেছে। তার সর্বাধিক বড় শত্রুতা হল, সে একদা আমাদের নবীকে অবহিত করল যে, পারস্য সম্রাট বুখতে নাছার বায়তুল মুকাদ্দাস ধ্বংশ করবে। তখন আমাদের তৎকালীন পূর্ব পুরুষগণ তাকে হত্যা করার জন্য একদল গুপ্তঘাতক পাঠায়। তারা তাকে নিঃস্ব অপ্রাপ্তবয়স্ক রূপে হত্যা করার জন্য

আটক করে। কিন্তু জিব্রাঈল তাকে এ কথা বলে বাচিয়ে দেয় যে, তোমাদের প্রতিপালক যদি তার হাতে তোমাদের ধ্বংসের ফয়সালা করে থাকেন, তাহলে তাকে তোমরা রোধ করতে পারবে না। পক্ষান্তরে এরূপ কোন সিদ্ধান্ত যদি না করে থাকেন, তাহলে কোন অপরাধে তোমরা তাকে হত্যা করবে? পরিণামে তার হাতে ৭০ হাজার নাসারা নিহত হয় এবং বাইতুল মুকাদ্দাস ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তাদের ঐ কথার প্রত্যুত্তরে অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়।

২. বর্ণিত আছে হযরত ওমর (রাঃ) একদা ইয়াহুদীদের পাঠশালায় গমন করেন। সেখানে তাদেরকে তিনি জিব্রাঈল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে তারা বলেন, সে আমাদের শত্রু। সে আমাদের জন্য ধ্বংস ও আযাব নিয়ে আসত, সে আমাদের গোপন তথ্য মুহাম্মদকে জানিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে মিকাঈল আমাদের বন্ধু। কেননা তিনি বৃষ্টি ও রহমত বহন করে আনেন। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহর দরবারে তাদের মর্যাদা কি? তারা বলল– জিব্রাঈল আল্লাহর ডান পার্শ্বে এবং মিকাঈল আল্লাহর বাম পার্শ্বে থাকেন। হযরত উমর (রা) বললেন, তাদের মর্যাদা যদি তোমাদের বর্ণানুযায়ী এরূপই হয়, তাহলে তাদের কারো সাথে শত্রুতা রাখা আদৌ বৈধ নয়। যে ব্যক্তি তাদের উভয়ের কোন একজনের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে সে আল্লাহর দুশমন। বর্ণিত আছে হযরত উমর (রাঃ) ফিরে আসার পূর্বেই অত্র আয়াত নিয়ে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আগমন করেন।

★ ب : اَللُّغَاتُ الْمُخْتَلِفَةُ فِى جِبْرِيْل (جبريل **শব্দের পঠন রীতিসমূহ)** ঃ جبريل শব্দে আটটি পঠনরীতি রয়েছে। যার মধ্যে চারটি কিরাআত সুপ্রসিদ্ধ। সেগুলো হল

১. سَلْسَبِيْل এর ওজনে جَبْرَئِيْل (জাবরাঈল)।

২. جَبْرِيْل (জাবরীল)।

৩. جَبْرَيْلُ (জাবরাইল)। جَحْمَرِشٌ এর ওযনে।

৪. جِبْرِيْل (জিবরীল)। قِنْدِيْل এর ওযনে।

আর অপ্রচলিত ৪টি কিরাআত হল–

৫. جَبْرَائِل (জাবরাইল)

৬. جَبْرَئِيْل (জাবরাঈল)।

৭. جَبْرَائِلُّ (জারাইল্ল) (লাম বর্ণে তাশদীদসহ)

৮. جِبْرَئِيْل (জিবরাঈল)।

★ ج : مرجعُ الضَّمِيْرَين فى قوله فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ (فانه نَزَّلَهُ **এর মধ্যকার যমীরের দু'টির** مرجع) ঃ

فانه ও نزله এর মধ্যকার যমীরের مرجع সম্পর্কে দু'টি অভিমত রয়েছে।

১. فانه যমীরের مرجع হল جبريل আর نزله এর যমীরের مرجع হল القران উল্লেখ্য যে, ضمير غائب এর مرجع পূর্বে উল্লেখ থাকা আবশ্যক হলেও

القران পূর্বে উল্লেখ হয়নি। তথাপি القران সবিশেষ মহিমা মণ্ডিত হওয়ার কারণে তা উল্লেখের প্রয়োজনীয়তা নেই। অতএব মূল বাক্য হল فَاِنَّ جِبْرِيل نَزَّل القران

২. فانه এর যমীরের مرجع হল الله আর نزله এর مرجع হল جبريل মূল ইবারত হল, فَاِنَّ اللّٰه نَزَّل جبريلَ بالقرانِ على قَلْبِكَ

★ د : الوجهُ لِقولِ اللّٰه علىٰ قَلْبِكَ (قَلْبِك বলার কারণ) ঃ

অত্র আয়াতে আল্লাহ তাআলা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলে দিয়েছেন তুমি বলে দাও। অতএব পরবর্তী কথাগুলো রাসূলের ভাষ্য হিসেবে উপস্থাপিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ কারণে এখানে নিয়মানুযায়ী على قلبك না হয়ে علىٰ قَلْبِىْ বলাই উচিত ছিল। তা সত্ত্বেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুবহু আল্লাহর বাণীই নকল করেছেন। যেন তার প্রতি নির্দেশনা হয়েছে قُلْ مَا تكَلَّمْتُ অর্থাৎ আমি যা বলেছি হুবহু তাই মানুষকে বলে দাও।

وجهُ تَخْصِيْص اْلقلبِ (কলবকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ) ঃ এখানে দু'টি কারণে কলবকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যথা–

১. কলবই মূলত ওহীর ধারক বাহক।

২. স্মরণ রাখার ও উপলব্ধি করার একমাত্র অঙ্গই হল কলব।

★ جوابٌ لِشرطِ مَنْ كانَ عَدُوًّا

من كان عدوا لجبريل আয়াতের মধ্যে যে শর্ত রয়েছে তার জওয়াব বা جزا কি হবে তা নিয়ে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে।

১. فانه نزله ই جوابُ الشَّرط বা جزاء।

২. এখানে শর্তের جزاء বা জওয়াব উহ্য রয়েছে। আর তাহলো كُفْرٌ بِمَا مَعَه مِنَ اْلكتاب অথবা فَقدْ خَلَعَ رُبْقَةَ الْاَنْصَاف এই ইবারত টুকুকে বাদ দিয়ে এর علت অর্থাৎ فانه نزله কে তার স্থলে আনা হয়েছে।

৩. কারো কারো মতে, جزاء উহ্য রয়েছে। আর তাহল যেমন– فَلْيَمُتْ غَيْظًا অথবা, فهوعَدُوٌّلِىْ وانا عدُوُّه আর فانه نزله এর سبب।